বিয়ের
রাত
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিয়ের রাত

বিয়ের রাত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা—৬

'রা—স্বা'
'বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম'

সূচি

বিয়ের রাত

আচ্ছা মশাই, আত্মবিশ্বাস জিনিসটা আসলে কীরকম বস্তু তা বলতে পারেন? বলা কঠিন। তবে যতদূর মনে হয় লোহার রডের মতো একটা শক্ত জিনিস মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঠেলে মাথা অবধি ওঠে। তাতে হয় কী, ঘাড়—গর্দান সব সোজা থাকে, মাথাটাও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে না। আমাদের পটলবাবুকে তো দেখছি, সবসময়ে যেন খাড়া হয়ে আছেন।

তাই হবে। ওই রডটা আমার নেই।

বেশিরভাগ লোকেরই থাকে না। রেয়ার জিনিস হলেই সাপ্লাই কম হয়। খুঁজে দেখেছি আমারও নেই।

দু—জনেরই দুটো দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আত্মবিশ্বাস জিনিসটা খুব কাজের জিনিস, কী বলেন?

খুব। তবে না হলেও যে চলে না তা নয়। এই ধরুন ফ্রিজ। থাকলে খুব ভালো, বাসি স্যাঁতা সব জমিয়ে রাখা যায়, তিন—চারদিন রান্না না চাপালেও চলে। চমৎকার কাজের জিনিস। কিন্তু ধরুন, যাদের নেই তাদেরও কী চলে না?

তা অবিশ্যি ঠিক।

আপনার যা যা নেই তার একটা লিস্টি তৈরি করে ফেলুন। ধরুন, আত্মবিশ্বাস নেই, সাহস নেই, বিবেক নেই, বিবেচনাশক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, মেধা নেই, জেদ নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সততা নেই, চরিত্র নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, স্মার্টনেস নেই, অনুভূতি নেই, কল্পনাশক্তি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। নেই—এর একটা লিস্ট থাকলে কী কী আছে তার একটা হদিশ বেরিয়ে আসবে। ডেবিট ক্রেডিটের মতোই। তাতে হবে কী, অল্পস্বল্প যা আছে তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়ার একটা সুলুকসন্ধান করতে সুবিধে হবে।

ঠিকই বলেছেন। তবে নেই—এর লিস্টিটা বড্ড বড়ো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বেশিরভাগ লোকেরই তাই। নেই—এর লিস্টি আমারও খুব বড়ো। এতবড়ো যে তাই দিয়ে ঘড়ির লেজ বানানো যায়। আচ্ছা, কীসের গন্ধ আসছে বলুন তো!

দিব্যি খুশবু।

ওঃ, এ গন্ধটা! দাঁড়ান বলছি! এ হল বিরিয়ানির গন্ধ। জাফরান পড়েছে, আর খোয়া ক্ষীর। আর ক্যাওড়ার জলও।

বাঃ, আপনার নাক তো খুব শার্প।

হ্যাঁ, আমি বড্ড গন্ধ পাই।

বাঃ, তা হলে ওটা আছে—র লিস্টিতে ধরবেন। তা আর কী কী আইটেম আছে আজ, জানেন?

খুব জানি। পয়লা পাতে রাধাবল্লভী, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ফিশ ফ্রাই। তারপর বিরিয়ানি, কষা মাংস। শেষ পাতে চাটনি, আইসক্রিম, সন্দেশ আর রসগোল্লা। পাঁপড়ভাজাও আছে।

নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া সবই প্রায় একরকম রয়ে যাচ্ছে। একটা অন্যটার কার্বন কপি। কী বলেন?

যে আজ্ঞে।

তো মশাই, এই বিয়েবাড়ির মেনু আপনি জানলেন কী করে? আপনি কি কন্যাপক্ষের কোনো কর্মকর্তা?

না। পাড়ায় থাকি। বীরেশবাবু একটু স্নেহ করেন।

অ। তাই তাঁর মেয়ের বিয়েতে খাটছেন বুঝি?

আজকাল আর বিয়েবাড়ির খাটনি কোথায়? সব তো ডেকোরেটর, ক্যাটারার এরাই করে দেয়। ক্যাটারারের সঙ্গে আমার একটু ভাবসাব আছে, আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম।

তাই বলুন।

একশো কুড়ি টাকা করে প্লেট।

একশো কুড়ি! সে তো সস্তা মশাই। গেল হপ্তায় সত্যেনবাবুর ছেলের বিয়ে খেয়ে এলুম, শুনলুম দুশো টাকা করে প্লেট।

দুশো! ও বাবা, দুশো টাকা তো বিরাট ব্যাপার!

আপনার আমার কাছে বিরাট, সত্যেনবাবুর কাছে তো আর নয়। সত্যেনবাবুরা নমস্য ব্যক্তি। আপনার আর আমার যেমন নেই—এর লিস্টিটা অনেক লম্বা, সত্যেনবাবুদের তেমনি আছে—র লিস্টিটা বেজায় বড়ো। তবে কিনা এমন অনেক লোক আছে যাদের কাছে সত্যেনবাবুও নস্যি।

খুব ঠিক কথা। আরও—র কোনো শেষ নেই।

এই তো বুঝেছেন। লোককে কোনো কথা বোঝাতে পারলে আমি বড়ো খুশি হই। ভারি তৃপ্তি পাই। মুশকিল কি জানেন, আজকাল বেশিরভাগ লোককেই কোনো কথাই যেন বুঝিয়ে উঠতে পারি না। তখন সন্দেহ হয় আমি হিব্রু ভাষায় কথা বলছি না তো! এটা বেশিরভাগ কোথায় হয় জানেন? বাড়িতে। নিজের বাড়ির লোকেরা, এই আমার বউ, ছেলে, মেয়ে— এদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয়ংকর ল্যাংগুয়েজ প্রবলেম হয় মশাই।

কেন, আপনার স্ত্রী কি মাদ্রাজি না জার্মান?

নৈকষ্যি বাঙালি মশাই। কোলাঘাটে বাপের বাড়ি। না না, ভাষাগত সমস্যা ঠিক ওরকম নয়। আসল কথা, তারা আমার বক্তব্য বুঝতে চায় না। কিংবা বলতে পারেন গ্রহণ করে না। আমি হয়তো খুব মোলায়েম করে বললুম, ওগো, বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করার দরকার নেই। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ কি ভালো? সঙ্গে সঙ্গে আমার বউ খেপে উঠে বলল, ঝগড়া করব না মানে? একশোবার করব। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে করেই তো দেশটার আজ এই অবস্থা! তোমার মতো মেনিমুখোদের দিয়ে সংসার চলে না — ইত্যাদি। যা বোঝার বুঝে নিন।

বুঝেছি।

তারপর ধরুন, হয়তো অফিস থেকে ফিরে এসে দেখলুম আমার ডায়েরির মধ্যে কে যেন একটা চিরুনি গুঁজে রেখেছে। চিরুনির তেলে ডায়েরির পাতায় জলছাপ। পুরুষসিংহ নই জানি, তবু হয়তো সামান্য একটু হেঁকে কথাটা বলতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে বউ ফুঁসে উঠল, আমি নাকি মেজাজ হারিয়ে চেঁচামেচি করেছি। বউয়ের সঙ্গে মেয়েও এসে গলা মেলাল। তাদের ধারণা, এরকম চেঁচামেচি নাকি নারী নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। যুগ যুগ ধরে নারীরা পুরুষদের হাতে যে কীভাবে নিরন্তর নির্যাতিতা হয়ে আসছে তা নাকি নির্যাতনকারী পুরুষেরা নির্যাতনে অভ্যস্ত বলে বুঝতেও পারে না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল, খুবই খারাপ অবস্থা তো!

খুব। আচ্ছা, এই ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যান্ড হচ্ছে, আপনি কি জানেন আলাদা নারী রাজ্য বা নারীল্যান্ড নিয়ে কোনো দাবিদাওয়া উঠেছে কিংবা আন্দোলন হচ্ছে কি না?

না তো। আমি শুনিনি।

উঠছে না কেন বলুন তো!

মনে হয় নারীল্যান্ডে চাকরবাকরের অভাব দেখা দিতে পারে বলেই দাবি উঠছে না।

বাঃ, বেশ বলেছেন মশাই। অতি ঠিক কথা।

নারীল্যান্ড হলে ফাইফরমাশ করার জন্য পুরুষ জুটবে কোত্থেকে? তাই তো কথাটা আমার মাথায় আসেনি। এটা কিন্তু আপনার আছে—র লিস্টিতে যায়। বুঝলেন?

বুঝেছি।
তা ফার্স্ট ব্যাচের ডাক কখন পড়বে বলতে পারেন?
মোটে সাতটা বাজে। আরও আধঘণ্টা বা থ্রি কোয়ার্টার ধরে রাখুন।
আমি তো সেই দমদম পার্কে ফিরব, তাই বলছিলাম। তা লগ্ন ক—টায় জানেন নাকি?
খুব জানি। রাত বারোটা বিয়াল্লিশ মিনিট।
ও বাবা!
ভয় পাবেন না, লগ্ন দেরিতে বলে ব্যাচ দেরিতে বসবে না। দমদম পার্কে ফেরার সবচেয়ে ভালো রুট হল এখান থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে গিয়ে রাসবিহারীর মোড় থেকে পাতালরেল ধরা।
সেটাই তো প্ল্যান মশাই। আর ব্যস্ত হচ্ছি সেই কারণেই। পাতাল রেল তো বোধহয় সাড়ে ন—টায় বন্ধ হয়ে যায়।
তার মধ্যেই পারবেন। এখন থেকে রাসবিহারীর মোড় তো হাঁটা পথ। বাসে পাঁচ—সাত মিনিট, ট্যাক্সিতে মিনিট তিনেক। কিংবা আরও কমও হতে পারে।
বলছিলাম কী তাড়াহুড়ো করলে খাবারের স্বাদ—সোয়াদ তেমন পাওয়া যায় না।
বিরিয়ানি গন্ধটা বেশ ভালোই ছেড়েছে মশাই।
হ্যাঁ, কারিগর খুবই ভালো।
বীরেশবাবু তা হলে বেশ খরচা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, কী বলেন?
হ্যাঁ, খরচ তো আছেই।
তা পাত্রটি কেমন পেলেন? ইঞ্জিনিয়ার না কী যেন শুনেছিলাম।
আমারও শোনা কথা। কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।
বেশ গালভরা কথা। কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাপারটা কী তা কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন? তারা কি কম্পিউটার বানায় না মেরামত করে?
আসল ব্যাপারটা কী?
আপনিও যে তিমিরে আমিও সে তিমিরে।
বীরেশবাবু বলছিলেন আমেরিকা না কোথা থেকে যেন ঘুরে এসেছে। তা আজকাল ওই এক দেশে হয়েছে। সবাই শুনি ল্যাজ তুলে সেখানে দৌড়াচ্ছে। আগে বিলেতের কদর ছিল, এখন তো সেটা বোষ্টমঘাটার মতো এলেবেলে জায়গা হয়ে গেছে।
কিছুদিন সবুর করুন, আমেরিকাও তাই হয়ে যাবে।
তাই হোক মশাই, তাই হোক। এই আমরা যারা আমেরিকা—টিকা যাইনি তাদের ভারি আত্মগ্লানি হচ্ছে। বাড়িতেও সবাই ঠেস দিয়ে কথা কয় কিনা।
বাড়ির লোকদের নিয়ে আপনার একটু প্রবলেম আছে, তাই না?
সবারই আছে মশাই, সবারই আছে। আমি পেট—পাতলা মানুষ বলে কবুল করে ফেলি, অন্যেরা চেপেচুপে রাখতে পারে। আপনার তো বয়স কম, বুঝবেন না। বলি, বিয়ে—টিয়ে করেছেন?
আজ্ঞে না।
আগে করুন, তারপর বুঝবেন। বাইরে আপনি যতবড়ো কেওকেটা মানুষই হন না কেন, বাড়ির লোকের কাছে পাপোশের বেশি সম্মান আশা করবেন না।
কিন্তু আপনি তো সেই বাড়িতেই ফিরে যাওয়ার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।
এটাই তো জীবনের ট্র্যাজেডি। কতবার সন্ন্যাসী—বিবাগী হওয়ার কথা ভেবেছি, পেরে উঠিনি। সুইসাইড করব বলে মনস্থির করেও রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে।
কেন জানেন?

কেন বলুন তো।
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বটে, মুখনাড়াও দেয়, আবার শরীর—টরীর খারাপ হলে বা বিপাকে পড়লে হামলে এসে আগলায়ও তো! সংসার এক রঙ্গ মশাই।
সেরকমই শোনা যায় বটে।
এতক্ষণ ধরে কথা কইছি কিন্তু আপনার সঙ্গে ভালো পরিচয়ও হয়নি। তা আপনি কি বীরেশবাবুর আত্মীয়—টাত্মীয় নাকি?
না, না, এই কাছেই থাকি, চেনাজানা আছে আর কী?
আমার নাম দিবাকর দত্ত, সরকারি ঠিকাদার। বীরেশবাবুর এ বাড়িটা আমিই করে দিয়েছিলাম।
আপনি সরকারি ঠিকাদার! তা হলে তো বড়োলোক মানুষ আপনি!
আরে না। ঠিকাদারদের আজকাল আর বেশি মার্জিন থাকে না। একে ওকে তাকে দক্ষিণা দিতে দিতেই সব উজাড় হয়ে যায়। পেমেন্ট পেতেও নাভিশ্বাস।
শুনতেই ভালো।
গাড়ি—টাড়ি নেই?
তা থাকবে না কেন? কিন্তু কলকাতার যা হাল হয়েছে গাড়ি নিয়ে পারতপক্ষে বেরোয় কোন আহাম্মক!
ঠিকই বলেছেন।
তা আপনার নামটি কী?
সুজিত।
বামুন না কায়েত?
কায়েত।
তা কী করা হয়—টয়?
এই টুকটাক হাতের কাজ।
চাকরি করেন না?
ওই সামান্য একটা।
বয়স তো বোধহয় সাতাশ—আঠাশ।
আঠাশ।
তা এই বয়সে আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব হচ্ছে কেন?
ব্যাপারটা হঠাৎ আজ সকালেই ধরা পড়ল কিনা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, আমার যেন আত্মবিশ্বাসটা নেই।
তার মানে কি আগে ছিল, এখন নেই?
আগে ছিল কি না ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে এখন নেই, এটা বেশ বুঝতে পারছি। কেমন একটু নার্ভাস লাগছে।
হ্যাঁ, আপনি যে বেশ নার্ভাস তা বুঝতে পারছি, নইলে আলটপকা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না যে, আত্মবিশ্বাস জিনিসটা কীরকম। কিন্তু হঠাৎ নার্ভাসই বা লাগছে কেন?
বলা মুশকিল। মাঝে মাঝে জীবনে এক—একটা দিন আসে যখন কোনো একটা সত্য উদঘাটিত হয়ে যায়।
বাঃ, বেশ বলেছেন। ওরকম আমারও হয়। এই তো বছরটাক আগে পাঞ্জাব মেল থেকে হাওড়া স্টেশনে নামছি, দরজার কাছটায় উঠন্ত কুলি আর নামন্ত যাত্রীদের মধ্যে খুব ঠেলাঠেলি। হাতের অ্যাটাচিকেসটা সামলাতে পারছি না। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো একটা বেশ মিষ্টি দেখতে ছেলে হঠাৎ ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন না, অ্যাটাচিকেসটা আমার হাতে দিন। তারপর নামুন। এসব লোকেরা বোধহয়

খানিকটা হিপনোটিজমও জানে। কে জানে কেন ছেলেটাকে আমার বেশি চেনা—চেনাও ঠেকল,তাই দিব্যি অ্যাটাচিকেসটা দিয়ে দিলাম। নেমে একগাল মাছি। কোথায় সেই ছোকরা, আর কোথায় বা অ্যাটাচি। তা সেদিন আমি বুঝলাম যতই লোক চরিয়ে খাই না কেন, আমি একটি গাড়ল।

আপনাকে কিন্তু গাড়ল বলে মনে হয় না। যদিও এ জায়গাটায় তেমন আলো নেই, তবু মনে হচ্ছে আপনি বেশ বুদ্ধিমান লোক।

কথাটা যে খুব ভুল বলেছেন তা নয়। আমি বুদ্ধিমানও বটে, আবার গাড়লও বটে। কোনো কোনো ব্যাপারে বুদ্ধিমান, কোনো কোনো ব্যাপারে গাড়ল। সব মানুষই এরকম। নিউটন বড়ো আর ছোটো বেড়ালের জন্যে কক্ষে দুটো দরজা করেছিলেন, মনে আছে তো?

হ্যাঁ, মনে আছে।

আমরা আসলে আমাদের বুদ্ধিটাকে সর্বত্র প্রয়োগ করি না। এক বিষয়ে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে বাহবা কুড়োচ্ছি, অন্য বিষয়ে আকাট। বোকার মতো কাজ করে ছিছিক্কার পাচ্ছি। এই ধরুন ঠিকাদারির কাজে আমাকে বোকা বানাতে পারে এমন লোক কমই পাবেন, আবার সেই আমিই যে কী করে বাজার থেকে বুড়ো ঢ্যাঁড়শ বা পাকা পটল নিয়ে আসছি সেটা আমার কাছেও রহস্য। কাজেই আমি বুদ্ধিমানও বটে, বোকাও বটে। কিন্তু আপনার কথাটাই শোনা হল না। আপনি যেন কেন আজ নার্ভাস বোধ করছেন।

ওই যে বললাম, আজ সকালে উঠেই আমার মনে হচ্ছে আমার আত্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই।

ঘাবড়াচ্ছেন কেন? যখন বিয়ে করবেন তখন থেকে টের পাবেন আপনার আরও অনেক কিছুই নেই। বউ এসে আপনার এমন অ্যাসেসমেন্ট করতে শুরু করবে যে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

ওরে বাবা!

ভয় পেলে চলবে কেন? এটাই তো দুনিয়ার দস্তুর।

বিয়ে না করলে কেমন হয়?

ব্যাচেলার থাকবেন? তা হলে তো আরও চিত্তির। ব্যাচেলারকে সবাই এক্সপ্লয়েট করে। আত্মীয়স্বজন থেকে বন্ধুবান্ধব কেউ ছাড়বে না। তা ছাড়া ব্যাচেলাররা একটু বায়ুগ্রস্তও হয়ে পড়ে কিনা। প্রথম ব্যাচরা বসল কি না একটু খেয়াল রাখবেন। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল কিন্তু।

না না, সাতটা সতেরো। ফার্স্ট ব্যাচ বসার আগেই আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

আপনি কি বিয়েবাড়ির ম্যানেজমেন্টে আছেন নাকি?

না, ঠিক ম্যাজেনমেন্টে আছি বলা যায় না। তবে দেখাশোনা করছি আর কী।

বিয়েতে দেনা—পাওনা কীরকম হচ্ছে জানেন?

তেমন কিছু শুনিনি।

নগদ আছে নাকি?

যতদূর জানি, না।

অবশ্য নগদের প্রশ্ন ওঠে না। শুনেছি নাকি মেয়েটি পছন্দ করে বিয়ে করছে।

লাভ ম্যারেজ নাকি মশাই?

তা ওরকমই বোধহয় কিছু।

সে কী! আপনি পাড়ার ছেলে হয়ে এসব জানেন না!

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

ঠিক ফেললাম না। বেরিয়ে গেল।

বীরেশবাবুর মেয়ে রিয়া বেশ সুন্দরী, তাই না?

আজ্ঞে।

কীরকম সুন্দরী বলে আপনার মনে হয়?
খুব।
সুজিতবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
করুন না।
বাই এনি চান্স, রিয়ার প্রতি আপনার কোনো দুর্বলতা নেই তো!
এ কথা কেন মনে হল আপনার?
আত্মবিশ্বাসের অভাবের কথা বলছিলেন তো, তার ওপর দীর্ঘশ্বাস!
দুর্বলতাই তো মানুষকে খায়। আপনি খুবই বুদ্ধিমান।
তা হলে ঠিক ধরেছি?
ঠিকই ধরেছেন।
আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলেই এগোতে পারেননি তো!
সেটাও একটা ফ্যাক্টর বটে।
ভেঙে পড়বেন না মশাই। আপনার এখনও বয়স পড়ে আছে। কত কী ঘটতে পারে। বীরেশ মিত্রের মতো বড়োলোকের মেয়েকে প্রেমের প্যাঁচে ফেলে বিয়েতে গেঁথে তুলতে পারলেও হয়তো পরে পস্তাতেন। বড়োলোকের আদুরে মেয়ের বায়নাক্কা সামলানো তো সোজা কথা নয়।
সে তো বটেই।
তা হলে খারাপটা কী হয়েছে বলুন। ভালোই তো হয়েছে।
আপনি যেভাবে ধরছেন সেভাবে ধরলে বলতে হয় ভালোই হয়েছে।
আরে মশাই, সবসময়ে জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলির কথাই তো আমাদের ভাবা উচিত, তাই না? আচ্ছা, আপনার চাকরিটা কীরকম?
সামান্যই।
সরকারি না বেসরকারি?
বেসরকারি।
ওই তো মুশকিল। বেসরকারির ফার্মগুলি বড্ড এক্সপ্লয়েড করে।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
জব সিকিউরিটিও তেমন থাকে না।
যথার্থই বলেছেন।
মাইনে—টাইনে কেমন দেয়?
মোটামুটি দেয়, আমার চলে যায়।
খাটুনি কেমন?
খুব। মোষের মতো খাটতে হয়। দৌড়ঝাঁপও আছে।
ওই তো বেসরকারি ফার্মে চাকরির মুশকিল। আপনি তো বললেন হাতের কাজ জানেন।
আজ্ঞে যৎসামান্য।
ভালো করে শিখলে হাতের কাজ জানা লোকের অবশ্য চাকরির অভাব হয় না।
তা আপনার হাতের কাজটা কী ধরনের?
এই একটু কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। তাই একটু—আধটু শিখেছি।
আজকাল তো কম্পিউটারের যুগ। লেগে থাকুন, হবে।
লেগেই তো আছি।
কোন কোম্পানিতে আছেন?

ইনফো টেকনো।

ইনফো টেকনো? না! নামটা শুনেছি বলে মনে হয় না।

শোনার মতো নয়। মোটে দু—বছর হল খুলেছে।

এবার একটু অ্যালার্ট হবেন মশাই। সাড়ে সাতটা বাজে কিন্তু।

হ্যাঁ, ওটা আমার খেয়াল আছে। এখন আপনি ধীরে ধীরে রওনা হতে পারেন, তবে গিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াতে হবে। পাঁচ মিনিট পর ডাকবে।

তা হলে উঠি?

হ্যাঁ, আসুন।

আপনার পুরো নামটা কী যেন!

সুজিত বসু।

সুজিত বসু! নামটা চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো!

চেনা লাগবার কথা তো নয়। আমি বিখ্যাত লোক নই।

তা হলেও কেমন যেন চেনা ঠেকছে। আচ্ছা ইয়ে বীরেশবাবুর জামাইয়ের নামটা কী বলুন তো!

সুজিত বসু!

তাই তো সেইজন্যই চেনা ঠেকছিল। আপনার নামও তা হলে সুজিত বসু! তা কী করে হয়?

আর একটা একটা দীর্ঘশ্বাস।

হয়। হয়ে যায়।

তার মানে কি আপনি বলতে চান রিয়ার সঙ্গে একজন সুজিত বসুর বিয়ে হচ্ছে যিনি আপনি নন?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস।

সেরকম হলেই বোধহয় খুশি হওয়া যেত। কিন্তু লোকটা আমিই।

অ্যাঁ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওষুধ

উকিলবাবু এখনও আসেননি। মক্কেলরা বসে বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড়ো অফিসার, বড়ো ডাক্তার, বড়ো উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হবে। যে যত বড়ো সে তত ঘোরাবে।

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উলটোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল তেষ্টা পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয় ভয় আর লজ্জা লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড়ো দোকান নয়। ছোটো—মোটো, গরিবগুর্বোর দোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলাপাতি কালাপাতি চমনবাহার মোহিনী জর্দা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান, গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামি কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশি বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে। বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে রাখা বোতল অনেক বেছেগুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে— এরকম ঠান্ডা হলে চলবে?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে, হুঁ।

লেজেনচুসের গন্ধওয়ালা ঠান্ডা, মিষ্টি ঝাঁঝালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘঁৎঘঁৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে খেতে চেয়ে আছে উলটোদিকের বাড়িটার দিকে। না উকিলবাবু এখনও আসেননি।

কতকগুলি ব্যাপার আছে যা কেবল এই উকিল, ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা—মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে— কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায়? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড়োজোর। আর চাও তো, বেশ ভালো মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয় বার বিয়েতে বসতে খুব ভেবে—চিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম—সরম, ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে—না—যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিয়ে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিন কুড়ি আগে জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে রেখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু চিরুনি দিয়ে। বাতাসে উড়ে উড়ে ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কবজা লাগাচ্ছিল। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝল এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজি যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলে দুর্গাপদ কটমট করে তাকাল মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানো—টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না। কোনোদিন হতও না।

বলি ব্যাপারটা কি, শুনছিস? হুংকার দিল দুর্গাপদ।

লক্ষ্মী সূক্ষ্ম চিরুনিতে উঠে আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে, দেখলে তো, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

দুর্গাপদ বুঝল তিরস্কারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল— স্বামী—স্ত্রী ঝগড়া হয় সে তো দিন—রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন?

তেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলী মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

জামাই!

তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফর্সা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড়ো বড়ো চোখে রক্ত হিম—করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারি ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরেজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠান্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল ডিভোর্স করবে নাকি?

তাই তো লিখেছে।

করলেই হল। আইন নেই?

ডির্ভোসের কথা তো আইনেই আছে।

তোমার মাথা। ডিভোর্স হল বেআইনি ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করছে জানতে পারলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা যা শিখে এসেছে তার উপর আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল, জেল দাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিশে যেতে।

লক্ষ্মীর মা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, আমি যাব পুলিশের কাছে? তবে তুমি পুরুষ মানুষ আছো কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মা—র সঙ্গে তর্ক—বিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনী শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ওই লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুর্গাপদর কাছে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে মেয়ের গলাগলি ভাব, গুজগুজ, ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ একা পুরুষ। কীই—বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলল— জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানি। সবকটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা! দেশে আইন নেই। কোর্ট—কাছারি নেই? পুলিশ—জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কি উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গ্রাহককেও ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই তার টাকা অঢেল। সেই সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনিয়ায় নেই। একজন দুঁদে এক উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কিনা দুর্গাপদ জানে না। প্রথমদিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিট দশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পঁচিশটা টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনো ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিবঢিব, মুখ শুকনো গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদি শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢিঢি ফেলে দেবে দু—দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ। গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল, মা গো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাব বুঝিয়ে—সুঝিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিনশো টাকা করে হাতখরচ পাঠাব তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, এলে চুলে বসে ছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ—বুক ঢাকা পড়ল। বলল, মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছ? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাব।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারি মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল, পুরুষ মানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনিমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন, ওর সম্মান নেই?

এ বাড়িতে বাকি জীবন বসে বসে খাবে। মেয়ে কি ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে 'ও দাদা দাম দিয়ে গেলেন না' শুনে লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল, উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত—পা ধোবেন, জল—টল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা, রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল, জনা আষ্টেকের পর।

তাহলে আরও দেড়ঘণ্টা ধরে নিন।

বড়ো উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

আসানও হবে। উনি হারা—মামলায় জিতিয়ে দেন। কত খুনিকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল, কিন্তু আমারটা কিছু হল না?

আপনার মুশকিলটা কী?

সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরও জনা ত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। শোনা গেল, উকিলবাবু এখনও চেম্বারে আসেননি। জল খাচ্ছেন বোধহয়। গুটি গুটি আরও মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাজা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘন ঘন তারপর ডাক এল। ব্যস্ত উকিলবাবু মক্কেলদের এক—দুইবার দেখে মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরোনো পরিচয় এবং বখেরার কথা বুঝিয়ে বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন, ভাঙন রুখতে চাইছেন তো? কিন্তু কী দিয়ে রুখবেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে কাকে ভালোবাসে বা বাসে না, কার বিয়ে ভাঙা ভালো নয় বা কার ভালো এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি খামোকা।

ফের পঁচিশ টাকা গুনে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

দুই

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকমসকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারি আহ্লাদি চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে খেতে ভ্যাক ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে, ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জি দে। এ সময়কার ঠান্ডা ভালো না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎসংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানও গেয়ে ফেলল সে— না মারো না মারো পিচকারি...

ঘেরা উঠোনের যে ধারটায় দেওয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু—দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এক—একখানা পাতা ডবল সাইজের কুলোকেও হারা মানায়। কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে ফের ল্যাজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝাবারও চেষ্টা করল ভ্যাক ভ্যাক করে।

নবীন গান থামিয়ে বলে, কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে লেগে থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল, আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের হয়ে এসেছে। আজকাল বড়ো আলতু—ফালতু কথা বলে। মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বেলে বলে, আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাঙ তুলে ফেলল। বলল, ডিভোর্সের মামলা বড়ো সোজা নয় হে।

নবীন ভ্রূ কুঁচকে বলল, ও পক্ষ কোনো জবাব দিয়েছে?

জবাব এত টপ করে দেবে? এত সোজা নাকি। যা সব আর্গুমেন্ট দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মুসাবিদা করতে দুঁদে উকিলের কালঘাম ছুটে যাবে।

তবে এও ঠিক কথা ডিভোর্স জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে, শক্তটাই বা কী? রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাঁকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে না কি আজ?

খরচা আবার কী? নবীন অবাক হয়ে বলে, এখনও মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

আছে, আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কী আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড়—প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে মাঝে এসে খবর দিচ্ছি এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু। মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজারদর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফিজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল, ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় দুটো টাকা দিয়ে আসব'খন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, সোজা নয়।

তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহারা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে, মাসোহারাই যদি দেবো তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে, সেই নিয়েই তো ভাবছি। ওরা কী কী পয়েন্ট দেবে, আর আমাদেরই বা কী কী পয়েন্ট সেসব গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার উপর খুব অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কী? মা—খুড়ি একটু ফিচফিচ করত, তা অমন সব মা—খুড়িই করে। ভারি বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উলটে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যেসব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেইসব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

মারধর করা হয়নি তো?

কস্মিনকালেও না। বরং ও—ই উলটে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু—একটা সটকান মেরেছি হয়তো। তাকে মারধর বলে না।

চরিত্রদোষ ছিল কি? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

ছিল কি আর না? তবে সেসব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে উঠতে বলে, কোন পয়েন্ট টিকবে কোনটা না টিকবে বলা শক্ত। ভাবতে হবে। তুমি বরং কাল চারটে টাকাই দিয়ে যেয়ো।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়েছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারি সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভালো বলে মনে হল না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল—ভ্রান্তিগুলি মনে হয়ে খুব আফশোস হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটা স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালত তো বড়োজোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশি কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারও সঙ্গে ভেগেছে। পরে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই তার লোহা—পেটানো হাত—পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়। উপরে টিনের চালওলা পাকা ঘরের চুন—বালি গত বর্ষার স্যাঁতসেঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা বেশিরভাগ বই—ই ডামি। ওপরে মলাট, ভিতরটা ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গতকালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অঙ্ক কষাচ্ছে। চারটে টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

তিন

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা উচিত কি না ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল— সব ভালো তো?

নবীন বে—খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে, মন্দ কী?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে, এদিকে একটু বিষয়—কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।
নবীনও ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে, ওদিকে সব ভালো?
দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে, ভালো আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছ। আমি অতশত ইংরেজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স—টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।
নবীন বিনীতভাবেই বলল, তাই লেখার কথা। ঠিকমতো লিখেছে কি না কে জানে? আইনের ইংরেজির অনেক ঘোঁরপ্যাঁচ।
দুর্গাপদ বলে— শুধু ইংরেজি কী, উকিলের মুখের কথাও ভালো বোঝা যায় না। দু—বারে কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতে চাই।
নবীন গম্ভীর হয়ে বলে, আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।
কারও কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বে—আইনি। পুলিশ খবর পেলে জেলে দেবে।
নবীন হাসল।
দুর্গাপদ করুণ নয়নে চেয়ে বলল, হাসছ বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কীভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিল তা যদি জানতে।
লোহা—পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনিমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল, স্ট্রং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে হয়।
এ কথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল, বেশি বলো না বাবাজীবন! তুমি নিজে পেরেছ? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!
এ কথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চার

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ায় সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভালো লাগে না উদাস লাগে, এই যে দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারি আলাদা মনে হয়, এই যে সিনেমা দেখেও মন ভালো হতে চায় না— এই তার রোগ। ভেতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল— ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে।
সিনেমা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।
লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনো কাজের জন্য কখনো কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।
উঠোনে ঢুকতেই নেড়ি কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে তেড়ে এসে লেজ নেড়ে কুঁইকুঁই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।
প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারা বাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।
লক্ষই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড়ো বড়ো শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বসে উঠল, উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে—না—বলতেই চুলের গোছায় বিভীষণ এক হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল। গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দু—নম্বর বোমার মতো। মেঝেয় পড়তে—না—পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে— কার পরোয়া করি? কোন উকিলের ইয়েতে তেল মাখাতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেরেছে দুর্গাপদ দাস?

বলতে—না—বলতেই আর একটা তত জোরে নয় থাপ্পড় পড়ল গালে।

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়োটি হল কেউ মারেনি তাকে।

এই প্রথম। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ! মনের ম্যাদামারা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত। আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ংকর নিবিড় সম্পর্ক যে।

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে মনে কী যে আনন্দে ভেসে যাচ্ছে সে!

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে! এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জ্বলজ্বলে চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার ছিল লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা ফোঁড়ার যন্ত্রণার মতো ব্যথাটা আজ যেন কেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পরে দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল, এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাপকে। মার খেয়ে মুখ—চোখ কিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ করল লক্ষ্মীর চোখ দু—খানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ—চোখ।

লক্ষ্মী বলল, বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন?

নবীনও সায় দিল, রাতটা হয়েছে, যাওয়ার দরকারটা কী?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লান মুখে বলে, ও বাবা, তোর মা কুরুক্ষেত্র করবে তা হলে। চিনিস তো!

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

মশা

রক্ত খেয়ে মশাটা টুপটুপে হয়ে আছে। ধামা পেটটা নিয়ে মশারির দেওয়ালে বসে আছে ওই। এই বেলা টিপে দিলে ফচাক করে খানিক কাঁচা রক্ত ছিটকে গলে যাবে শালা।

নফরচন্দ্র জীবনে মশা মেরেছে অনেক, আর মানুষ মেরেছে একটা। মানুষটার কথা এখন আর মনে পড়ে না। অল্প বয়স ছিল তখন। সময়ের তফাতে ভুল পড়ে গেছে। তবে মশাদের কথা যদি কেউ শুনতে চায়, তবে ঢের কথা শোনাতে পারে নফরচন্দ্র। একটা জীবন মশা মেরেই তো গেল। তার বউ চারু পর্যন্ত মরবার আগে তার কোনো গুণের কথা না—বলুক এটা জোর গলায় বলে গেছে— পারোও বাপু তুমি মশা মারতে।

তা পারে নফরচন্দ্র। যত মশা তত মারার আনন্দ।

লোমের সরু সরু হাত—পাওয়ালা মশাটা কী পরিমাণ রক্ত টেনেছে দেখ! পেটটা একটা ধানের মতো বড়ো দেখাচ্ছে। ওই হাত—পায়ে আর ফিনফিনে পাখনায় এতবড়ো পেটটা নিয়ে ওড়াউড়ি করবে কেমন করে? বড়ো তাজ্জব লাগে নফরচন্দ্রের। শালারা নিজেদের শরীরের চেয়ে ঢের বেশি ওজনের রক্ত খায়। আখেরের খাওয়া। দু—হাতের পাতা দু—দিকে চড়ের মতো তুলে নফরচন্দ্র আস্তে করে মশাটার দিকে এগোয়। ভরাপেটে মশার চালাকি খাটে না। টলতে টলতে একটু—আধটু নড়েচড়ে ঠিকই, কিন্তু বেশি দূরের দৌড় নয়। নফর জানে।

ঘরের আলোটা কিছু কমজোরি। নাকি বয়সে চোখের দৃষ্টিতেই ভাঁটা পড়েছে? কিছু একটা হবে। চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু কীসব ভেসে বেড়ায় আজকাল নোংরার মতো। সেই বিন্দুগুলিকেও প্রথম প্রথম মশা বলে ভুল করত সে।

দু—হাতে ফটাস করে তালি বাজাল। কিন্তু রক্ত ছিটকালো না। মশাটা সটকেছে। নফরচন্দ্র নিজের হাতের দিকে চায়। আঙুলের জোড়ে জোড়ে গিঁট পড়ার মতো ভাব। বুড়ো চামড়ায় ফুঁচি পড়েছে। বিনা কারণে আঙুলগুলি ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। এসবই কি হওয়ার কথা ছিল?

বিছানায় হাঁটু গেড়ে বসে নফর ময়লা মশারির চারদিকে তাকিয়ে রক্তচোষাকে খোঁজে। আছে খুব কাছেপিঠেই। বেশি ওড়াউড়ি করার মতো ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি বসবে কোথাও। কিন্তু চড়টা ফসকাল— সেটাই ভাবনার কথা। এতকাল মশা মারতে কদাচিৎ ফসকেছে নফর।

বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে খানিক আগে। নফর টের পেয়েছে, তার ছেলে গণেশ আজ খেয়ে উঠে আঁচাতে অনেক সময় নিল। একবার যেন বউয়ের কাছে খড়কেও চেয়েছিল। কিন্তু খড়কে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার মতো খাওয়া—দাওয়া তো ছিল না আজ! নফরকে সন্ধের মুখে গণেশের বউ মুলো দিয়ে রান্না মটরের ডাল, বাসি বাঁধাকপির ঘণ্ট, আর ট্যাংরার চচ্চড়ি খাইয়ে দিয়েছে। সে খাওয়ায় খড়কে লাগে না। নফরের আজকাল সন্দেহ হয়, তাকে ফাঁকি দিয়ে গণেশ আর গণেশের বউ গোপনে দু—চারটে বাড়তি পদ খায়। নফরচন্দ্র খেয়ে আসার পর বেশ খানিক বাদে একটা মাংস রান্নার বাস খুব মাত করেছিল পাড়া। নফর ভেবেছিল রায়েদের বাড়ি রান্না হচ্ছে। তা নয় তবে।

গণেশের বউ চন্দ্রিমা বেশ মোটাসোটা আহ্লাদি চেহারার মেয়ে। রকমসকম খানিকটা পোষা বেড়ালের মতো। দাঁত—নখ লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে ন্যাকা ন্যাকা ভাব করে বটে, তবে দরকারের সময় লুকোনো অস্ত্র বের করে আনে।

তা মোটা গিন্নি খায় ভালো। সারাদিনই খাচ্ছে। কচর—মচর খানিক চানাচুর চিবোলো, টাউ টাউ করে বাটিভর তেঁতুল—পান্তা মারল, দুধের সরটা আঙুলে আলতো তুলে মুখে ফেলে দিল, এক কোষ আচার

চাটল হয়তো, তার ওপর হোটেল—রেস্টুরেন্টে গিয়ে গণেশের ট্যাঁক ফাঁক করা তো আছেই। আজকাল নফরকে ফাঁকি দিয়ে বাড়তি পদ খাওয়া শুরু হয়েছে।

নফরচন্দ্র মশাটা আর খুঁজে পেল না। ভরাভরতি পেট নিয়ে শালা যাবে আর কোথায়! কিন্তু নফরের তেমন ইচ্ছেও করল না বেশি খুঁজতে। সেই কোন সন্ধেবেলা চাট্টি লেইভাত খেয়েছিল, এখন খিদের চোটে পেটের মধ্যে হাঁড়ি—কলসি ভাঙছে। রায়বাড়ির মুরগি রাত—বিরোতে বেলা ভুল করে ডেকে ওঠে। আজও ডাকছে ওই।

নফরচন্দ্রের ঘুম আসে না। এলেই আজকাল একটা ফালতু লোক এসে বড়ো ঝামেলা করে। সেই কবে কোন ছোকরা বয়সে রাগের মাথায় কী করে ফেলেছিল তারই জের টানতে মেলা ঝামেলা বাধায় এসে লোকটা।

নফরের তেমন দোষ ছিল না। তখন দেশের গাঁ কালীগঞ্জে থাকত। আকালের বছর। চারদিকে চোর—ছ্যাঁচড়ার বড়ো উৎপাত। লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো এক মা ছিল নফরের, রোগাভোগা খিদে—পাওয়া মানুষ দোরগোড়ায় এলে প্রায় সময়েই পাত পেতে খাওয়াত। এক দুপুরে তেমনি পেট টান করে খেয়ে একটা মাঝবয়েসি লোক যাওয়ার সময় একটা কাঁসার বাটি আর ধুতি মেরে চলে গেল। ঘটনার হপ্তাখানেক বাদে কালীগঞ্জের খাল ধরে নৌকা বেয়ে নফর যখন মাছ ধরতে বড়ো গাঙের দিকে যাচ্ছিল তখনই শ্মশানের ঘাটে লোকটাকে বসে থাকতে দেখে। পাশে পুটুলি। চোরটাকে দেখে নফর বেদিশা হয়ে নৌকো ভিড়িয়ে লগির একখানা ঘা লাগিয়েছিল জোরে। লোকটা হাত তুলল না, চেঁচাল না, ঘা খেয়ে যেন বড়ো ঘুম পেয়েছে এমন ভাব করে শুয়ে পড়ল। কেউ সাক্ষী ছিল না। নফর নৌকোয় কেটে পড়ল তৎক্ষণাৎ। পরদিন হাটে—বাজারে কিছু কথাবার্তা শুনল লোকের মুখে। শ্মশানের ঘাটে একটা লোক মরে পড়ে আছে। তা, কে আর একটা মরা নিয়ে মাথা ঘামায়। তখন কত মরছে চারদিকে!

ভেবে দেখল, খুনের জন্যে তো মারতে যায়নি নফর। চোরের সাজা দিতে গিয়েছিল। কত মাথা ফাটাফাটি করেও লোকে বেঁচে থাকে। কিন্তু সেই কমজোরি লোকটা যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা তা কে জানত! নফরের মন—মেজাজ কয়েকদিন বিগড়ে রইল ঠিকই, কিন্তু নিজেকে তেমন দোষ দিতে পারল না।

বহুকাল হয়ে গেছে। চল্লিশ—পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার বৃত্তান্ত। লোকটাকে ভালো মনেও নেই তার। মাথাটা ন্যাড়া ছিল, সেটা বেশ মনে পড়ে। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা ছিল মনে হয়। খালি গা ছিল, পরনে একটা হাফুচ ময়লা কাপড়। একদম ফালতু লোক। দুনিয়াতে ওরকম দু—চারটে লোক না থাকলে কেউ টেরও পাবে না। পায়ওনি। লোকটার জন্য থানা—পুলিশ হয়নি, কান্নাকাটি হয়নি।

কিন্তু মুশকিল হল তখন মাঝে মাঝে লোকটা এই নফরচন্দ্রকে ঘুম থেকে তুলে বলে, ন্যাড়া মাথা বলেই বড্ড লেগেছিল হে।

নফর বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে পাগড়ি পরে থাকলেই পারতে।

লোকটা বলে, হুঁ, তখন জামা জোটে না তো পাগড়ি। তা তুমি লগি চালাবে জানলে পাগড়িই পরতাম। ন্যাড়া মাথাটায় বড্ড লেগেছিল হে।

ন্যাড়া হয়েছিলে কেন মরতে?

সে আর এক কেচ্ছা? মজিলপুরে এক মুদির দোকান থেকে এক থাবা বাতাসা চুরি করেছিলাম বলে তারা মাথা কামিয়ে দিলে, ঘোলের বড্ড দাম বলে ঘোল ঢালেনি কিন্তু কোমরে দড়ি—বেঁধে গাঁয়ে ঘুরিয়েছিল।

নফরচন্দ্র বলে, তাহলে তোমারই দোষ বলো।

তা ছাড়া আর কার? আমার মাথায় খুব ঝুপসি চুল ছিল তখন। মাথাটা একটা বোঝার মতো দেখাত। তার উপর লগির ঘা পড়লে বোধহয় তেমন লাগত না। ন্যাড়া মাথা বলে লেগেছিল। না খেয়ে খেয়ে তখন শরীরটা তো মরেই আসছিল। ব্যথাটা সইল না।

আমার তবে দোষ কী বলো!

দূর ছাই, তোমার দোষ কে দিচ্ছে? এতকাল পরে সে সব তুচ্ছ কথা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আসি বলে ভাবো নাকি? তুমি না মারলেও মরণ আমার লেখাই ছিল। আমি তা বুঝতে পেরে কাজ এগিয়ে রাখতে শ্মশানের ধারে গিয়ে বসে থাকতাম।

তাহলে আমাকে দোষী করছ না তো! ঠিক করে বলো বাপু ন্যায্য কথা।

আরে না। তবে বলি বাপু, তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা হয়। সেই যে মেরেছিলে তারও তো একটা দেনা আছে।

দেনা! বলে আঁতকে উঠে নফর। বলে, এর মধ্যে আবার দেনা—পাওনার কথা ওঠে কোত্থেকে?

ওঠে। যখনই আমাকে মারলে তুমি তখনই তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হল তো।

সে আবার কীরকম?

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে, হয়। সে এমন সম্পর্ক যে এক জন্মে আর কাটান—ছাড়ান নেই। সেই সম্পর্কের জোরেই তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা হয়।

পাওনা হলেই বা দিই কোত্থেকে। সংসারের অবস্থা তো দেখছ। ওই গণেশটা আমার একমাত্র অন্ধের নড়ি। কোথায় যেন যন্ত্র চালায়। আয় ভালোই, কিন্তু বুড়ো বাপকে দেয় কি? সব ওই মোটা গিন্নির শরীরের আহ্লাদে খরচ হচ্ছে। তার ওপর মাগি আবার বাঁজা। একটা নাতকুড় হলেও আমার একটা সুখ ছিল। সেও হল না। সংসারের সব আদর মোটা গিন্নি নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে।

লোকটা বলে, সে আমি শুনব কেন বলো! আমার পাওনা আমাকে মিটিয়ে দেবে, তবে অন্যসব কথা।

বলে লোকটা চলে যায়।

জেগে গিয়ে নফরচন্দ্র মশার পুন—ন—ন শুনতে পেয়ে উঠে বসে। কোথা দিয়ে যে মশারির মধ্যে ঢোকে শালারা। মশা মারবার জন্য বাতি জ্বালতে গিয়ে নফরের ভুল ভাঙে। ও হরি! এ যে বেহান হয়ে গেল! কাক ডাকতে লেগেছে।

ছেলের সঙ্গে এই ভোররাতেই একবার চোখের দেখা হয়। গণেশ বারান্দায় ঘুরে ঘুরে দাঁতন করে এ সময়টায়। চোখাচোখি হলেও কোনো কথা হয় না।

কথার আছেটা কী? গণেশ তার সব কথা বরাবর মাকে বলে এসেছে। এখন বউকে বলে বোধহয়। বাপের সঙ্গে কোনোদিনই তেমন বাক্যালাপ করে না। আজও ভোররাতে বারান্দায় দেখা হল। কলঘর থেকে এসে নফর বলল, আমার মশারিটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে। একটা কিনে দিবি?

দেবো'খন। এ মাসটা জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নাও।

গণেশ ছেলে খারাপ না। বউটা খচ্চর।

নাকি বউটাও খারাপ না, সে নিজেই খচ্চর! কোনটা যে কী তা বলা মুশকিল।

গণেশের মা চারু বরাবর বলে এসেছে, নফরচন্দ্রের মতো এমন শয়তান নাকি দুটো হয় না। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ভেবে দেখবার মতো কথা। আহ্লাদি বউ যখন উঠে হালুয়ার কড়াই বসিয়েছে তখন গণেশের স্নান সারা। ভাজা সুজিতে জল পড়ল ছ্যাঁকাৎ করে। রায়বাড়ির মুরগি ডাকছে। চড়াই পাখির ডানার শব্দ কানের পাশ দিয়ে সড়াৎ করে চলে যায়। গণেশ রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে খেতে চাইল। মোটা গিন্নি বলল, দিচ্ছি।

নফরকেও দেবে। তবে সে একটুখানি। বাসি রুটি গণেশ ছ—খানা খায়, মোটা গিন্নি ক—খানা তা নফর জানে না। তবে তার ভাগ্যে দু—খানা। চাইলে বলে, আর তো নেই!

ডাক্তারেরও নাকি বারণ আছে! কিন্তু নফর তার শরীরের গতিক কিছু বোঝে না। বেশ আছে। তবে কাল রাতে একটা পেটমোটা মশা তার হাত ফসকে পালিয়েছে, সেটা ভাববার কথা।

বউ মরে বড়ো জ্বালাতন হয়েছে। চারু মুখ করত বটে কিন্তু সে কাছে থাকতে নফরের হাতে মশা ফসকাত না। আর ন্যাড়ামাথা সেই পাওনাদারটাও কাছে ঘেঁসেনি কোনোদিন।

সূর্যটা তার ন্যাড়ামাথা নিয়ে ভুস করে উঠে পড়ল ওই। গণেশ বেরিয়ে গেলে মোটা গিন্নি আবার গিয়ে বিছানা নেবে। ঝি আসে অনেক বেলায়। বড়ো ফাঁকা লাগে নফরের। গণেশের যদি একটা ছানা হত!

মশারি চালি করে বিছানা গুটিয়ে বসে থাকে নফর। দুটো রুটি গরম হালুয়ার সঙ্গে পেটের মধ্যে বেড়াতে গেছে। গণেশ কাজে বেরোল। মোটা গিন্নি একটা মস্ত হাই তুলে বিছানা নিল পাশের ঘরে।

পুবের জানালা দিয়ে একটা বেঁটে দেওয়াল দেখা যায়। দেওয়ালের উপর তারকাঁটার তিনটে লাইন। তার ফাঁকে একটা ন্যাড়ামাথার মধ্যে সূয্যি ঠাকুর।

পাখি ডাকে।

চারু খুব জপ করত এসময়। জপের মালা রেলগাড়ির চাকার মতো বনবন করে ঘুরে যেত। সংসারের কাজকর্ম শুরু করার আগে বরাদ্দ জপ এগিয়ে রাখত যতটা পারে। নফরের সে—সবও নেই। খামোকা বসে অংবং জপের চেয়ে অন্য কথা ভাবলে কাজ হয়।

একসময় চাষবাস করত, পরের দিকে একটা দোকানে আধাআধি বখরায় ব্যবসা করত। সে খোঁড়া ব্যবসাতে রোজ দু—পাঁচ টাকা আয় হত। অধৈর্য হয়ে একদিন দোকানের কিছু মাল সরিয়ে কেটে পড়ল। আবার হয়তো অন্য কারবারে হাত দিল একদিন। জীবনটা ফেরেব্বাজিতে গেছে। গণেশ কম বয়সে যেই চাকরিতে ঢুকল অমনি নফরচন্দ্র হাত ধুয়ে ঘরে থিতু হল। আর কাজ—কারবারে যায়নি। গেলে আজ দুটো পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারত। তার বদলে নফরের অন্যসব ব্যাপারে মাথা খুলতে লাগল বেশি। চমৎকার মশা মারত, বাগান করত, কয়লা ভাঙত, পান সাজত, বসে থাকলে কত বাতিক হয় মানুষের।

মোটা গিন্নি ঘুমোলে নফর চুপি চুপি উঠে রান্নাঘরে আসে। ঝি এখনও আসেনি। গতরাতের এঁটোকাঁটা পড়ে আছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে নফর দেখে মাংসের হাড়টাড় পড়ে আছে ডাঁই হয়ে। কম গেলেনি দু—জনে। হাড়গোড়ের পরিমাণ দেখলে তাজ্জব মানতে হয়। একটা লুচির টুকরোও দেখা যাচ্ছে। তবে কাল রাতে লুচিও ভেজেছিল।

শ্বাস ফেলে নফর ঘরে আসে, ঘর পেরিয়ে একদম সদরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। উদোম পৃথিবী চারদিকে ছড়ানো। একবার ইচ্ছে হয়, যায় চলে যেদিকে দু—চোখ যায়। লুচি—মাংসের ব্যাপারটা আজ বড়ো দাগা দিয়েছে তাকে। কিছুদূর খামোখা ঘোরাঘুরি করে ফিরে আসে নফর। বিবাগী হয়ে যেতে এ বয়সে বড়ো ভয় করে। কাল রাতে একটা মশা ফসকে গেল। ন্যাড়া মাথার লোকটা রোজ আসছে আজকাল।

ঘরে ফিরে এসে নফর মোটা গিন্নির বকুনি খেল একচোট। আহ্লাদি বউ বলল, কী আক্কেল আপনার বলুন তো, সদর দরজা হাটখোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়েছেন, কে—না—কে ঢুকে যে সব ফর্সা করে নিয়ে যেত। এক ডাঁই কাঁসার বাসন পড়ে আছে, আরও কত দামি জিনিস। এই তো সেদিন চুরি গেল এককাঁড়ি।

বড়ো দুঃখ হল নফরের। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেই বুঝি ভালো ছিল।

চারু মরে যাওয়ার পরপরই নফর একটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিল। খড়কাটা কলের মালিক হরেকৃষ্ণ পালের একটা হাবাগোবা বোন আছে। তার বয়স অনেক। হাঁ করে চেয়ে থাকে, মুখ থেকে অবিরল নাল ঝরে। ওরিয়েন্ট সেলুনের নরহরি নফরের চুল ছাঁটতে ছাঁটতে একদিন বলেছিল, নফরবাবু, শ—পাঁচেক টাকা জোগাড় করতে পারেন তো বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারি।

হাবাগোবা যাই হোক একটা বউ তো হত। টাকাটাই বখেরা বাধালে। তা—ও চেষ্টা করেছিল।

ঘরের কিছু জিনিসপত্র হাতছিপ্পু করে বাজারে বিক্রি করে কিছু পয়সা পেল। মোটা গিন্নির সোনার জিনিস হাতাতে পারলে হত। কিন্তু সে আর হয়নি, ঘরের জিনিস কিছু খোয়া যাওয়াতে চন্দ্রিমা এমন হই—হুল্লোড় বাধালে যে নফর আর কিছু সরাতে সাহস করল না। তার ওপর কানাঘুষোয় তার বিয়ের ব্যাপারটাও গণেশের কানে এসে পৌঁছেছিল। কী লজ্জা! আজকাল পাড়ার ছেলেরা তাকে রাস্তায় দেখলে উলু দেয়।

তবে সেই চুরি করে বিক্রির কিছু টাকা এখনও নফরের তোশকের তলায় লুকোনো আছে।

সবসুদ্ধ গোটা ত্রিশ। মাঝে মাঝে লুকিয়ে টাকাগুলি ছুঁয়ে আরাম পায় নফর।

পৃথিবীতে মানুষ আপন না টাকা আপন তা এখনও সে স্থির করতে পারে না।

আজও সন্ধে পার করেই মোটা গিন্নি তাকে বসিয়ে দিল। এটা আদর নয়, এ হচ্ছে সমাধান হওয়া। নফর খেয়ে বিছানা নিলেই ভালোমন্দ রাঁধবে, খাবে দু—জনে।

নফর কিছু বলল না। সেই ভাত আজ আর মুখে রুচছিল না তেমন। প্রাণটা লুচি—লুচি করে, মাংস—মাংস করে। তবু ভাতের দল কোঁৎ কোঁৎ করে চালান দিয়ে ঘরে এসে জাগতে বসে নফর। আজ জেগে থেকে কাণ্ডটা দেখবে।

দেখল। পাড়া মাত করে আজ সর্ষে—ইলিশ রান্না হচ্ছে। গণেশ একটা চ্যাঙারি হাতে ঘরে ফিরল আজ। পেটের ভিতরটায় খিদের সেঁতলান দিয়ে মুখে জল এসে গেল নফরের। একটু রাত করে ওরা বসেছে। ভারি হাসিঠাট্টা হচ্ছে দু—জনে। নফরের মশারির মধ্যে পন পন করে মশা ঢুকছে।

ওরা শুতে চলে গেল। নফর শুয়ে জেগে রইল একা। মশা কামড়াচ্ছে।

কামড়াক। ন্যাড়ামাথার লোকটাও মশারির মধ্যে সেঁধিয়ে এসে বলে, এলাম বুঝলে! দেনা—পাওনার কথাটা মিটিয়ে নিই।

তোশকের যে ধারে টাকাটা আছে সে ধারটায় একটু চেপে শুয়ে নফর বলে, রোজ তোমার এক কথা।

বড়ো অনাদর করেছিলে যে। মেরে ফেললে।

সে অত ধরলে হয় না।

ধরছে কে? ধরলে তোমার ফাঁসি হয়।

তবে?

বলছি কী, যে জায়গায় মেরেছিল সে জায়গায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। এখনও জায়গা ব্যথা করে বড়ো।

সত্যি?

মাইরি। সে শরীরের ব্যথা নয়, অনাদরের ব্যথা। দেবে নাকি একটু হাত বুলিয়ে?

নফরের চোখে জল আসে। উঠে বসে বলে, দেখি।

মাথাটা এগিয়ে লোকটা দেখিয়ে দেয়, এইখানে।

তা লেগেছিল। তবে তোমার আর দোষ কী?

দাঁড়াও, হাত বুলিয়ে দিই। বলে নফর বোলাতে থাকে ফোলা জায়গাটায়। নাঃ, এভাবে মারা ঠিক হয়নি।

আঃ। ব্যথাটা সেরে যাচ্ছে হে নফর। লোকটা বলে।

নফর তার কানে কানে বলল, লুকোনো ত্রিশটা টাকা আছে আমার। কাল চলো দু—জনে দোকানে বসে খুব লুচি—মাংস খাই। খাবে?

খুব খাব। লোকটা বলে।

শুনে নফরচন্দ্র অনেকদিন বাদে পাশ ফিরে আজ নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

সুখ—দুঃখ

লোকটা সারাদিন তার খেতে কাজ করে। একা একা সে মাটির সঙ্গে কত ভালোবাসার কথা বলে! আল তুলে জল বেঁধে রাখার সময়ে সে ঠিক যেন এক পিপাসার্তকে জলদানের তৃপ্তি পায়। সে ভালোবাসে গাছগুলিকে। যারা ফল দেয়, ছায়া দেয়, দূরের মেঘকে টেনে আনে। সে প্রতিটি গাছের সুখদুঃখকে বোধ করার চেষ্টা করে। সে ভালোবাসে তার গৃহপালিতগুলিকেও। সে বোঝে, প্রতি—প্রত্যেকের টান—ভালোবাসার ওপর সংসার বেঁচে আছে।

পাপপুণ্যময় দিনশেষে সে তার নির্জন নিকোনো দাওয়াটিতে বসে। গুড়গুড় করে তামাক খায়। অন্ধকারে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশে দেবতার চোখের মতো উজ্জ্বল তারা ফুটে ওঠে। সে সেই হিম, নিথর ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে বিশাল ছায়াপথ, ওই পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে। কখনো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় উঠোনে খেলা করে তার তিনটি শিশু ছেলেমেয়ে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সে কখনো সেই নিথর আকাশকে কখনো—বা সেই নিষ্পাপ তিন শিশুকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বলে, আমি তোমাদের কাছে কোনো লাভ—লোকসান চাই না। তোমরা আমাকে অনাবিল আনন্দ দিয়ো।

সারারাতই প্রায় সে জেগে থাকে। গোলাঘর থেকে গোরুর দাপানো শব্দ পেলে উঠে গিয়ে মশা কিংবা ডাঁশ তাড়ায়। টেমি হাতে চলে আসে হাঁসের ঘরে। দেখে, তাদের ডিম স্বচ্ছন্দে প্রসব হয়েছে কিনা। ঝড়ের রাতে সে উঠে চলে যায় বাগানের গাছগুলির কাছে। বাঁশ—কাঠের ঠেকনো দিয়ে রাখে বড়ো গাছগুলিতে।

মাঝে মাঝে অন্ধকার নিশুত রাতে বারান্দায় বসে যে যখন তামাক খায়, তখন তার বউ আর ছেলেমেয়েরা ঘরে ঘুমোয়, ঘুমোয় তার গাছপালা, তার গৃহপালিতরা, লোকটা তখন একা জেগে দেখে, দূরের মাঠ ভেঙে ধোঁয়াটে লণ্ঠন হাতে অস্পষ্ট কারা যেন চলে যাচ্ছে, কানে আসে ক্ষীণ হরিধ্বনি। কখনো—বা দেখে, ভিন গাঁয়ের দিকে মশাল হাতে চলেছে একদল লোক তাদের হাতে বন্দুক, সড়কি, খাঁড়া, মুখে ভুসোকালি মাখা। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকে। তার আর ঘুম আসে না।

গ্রামের ধারে রুপোলি নদীটির পাশে শিবরাত্রি কী রথযাত্রার মেলা বসে। কত দূর থেকে রঙে ছোপানো জামাকাপড় পরে আসে অচেনা মানুষেরা। রঙিন ছেলেমেয়েরা মুখোশ পরে ঘোরে, বাজিকর খেলা দেখায়। পায়ে পায়ে রাঙা ধুলোর মেঘ ওড়ে। ছেলের হাত ধরে লোকটি মেলায় আসে। ছেলেকে ডেকে বলে, মানুষের মুখ দেখ বাবা, মানুষের মুখ দেখ। এর বড়ো নেশা। হাটুরেরা ঘোরেফেরে, দরদাম করে। লোকটা কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে অচেনা হাটুরেদের দেখে আর দেখে। কখনো—বা ছেলেকে বলে— অচেনা মানুষকে একটু পর—পর লাগে বটে, কিন্তু আপন করে নেওয়া যায়। কাজটা শক্ত না।

সে জানে দেশের আইন, জমি এবং ফসলের মাপ, অঙ্কের হিসাব, লোকটা জানে চিকিৎসাবিদ্যা। সে জানে, কোন উদ্ভিদের কী গুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল,কোন বীজ থেকে কী গাছ। তাই এ গাঁ সে গাঁ থেকে নানাজন আসে তার কাছে। আইন জেনে যায়। জমির মাপ জেনে যায়, আসে চিঠি লেখাতে কিংবা হিসেব মিলিয়ে নিতে। লোক আসে রোগের ওষুধ জানতে। সে কেবল মানুষকে দেখে আর দেখে। সে জানে, পৃথিবীর কোনোকিছুই একটি ঠিক আর একটির মতো নয়। আছে বর্ণভেদ। আছে বৈশিষ্ট্যের তফাত। এক গাছের দুটি পাতাও নয় একরকমের। সে মানুষে মানুষে সেই ভেদ দেখতে পায়। দেখে বৈশিষ্ট্য। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য তার আলাদা বিধান, আলাদা ব্যবহার, আলাদা ওষুধ। এক—একটি মানুষের অর্থ এক—একটি আলাদা জগৎ। প্রতিটি মানুষেরই আছে অস্তিত্বের বিকিরণ। মানুষ দেখতে দেখতে লোকটার এমন অবস্থা হয় যে, সে মানুষের এই বিকিরণটি অনুভব করে। সেই বিকিরণ অনেকটা আলোর মতো। বিভিন্ন

মানুষের আলোর রং আলাদা। বড়ো সরল লোক সে। সে ভাবে তার মতো আর সবাইও মানুষের বিকিরণ দেখতে পায়। তাই সে কখনো হয়তো কোনো লোককে দেখে চেঁচিয়ে বলে, এঃ হেঃ তোমার আলোটা যে লাল গো— বড্ড লাল। ও যে রাগের রং।

শুনে লোকে হাসে, বলে পাগল।

লোকটা নানারকমের আলো দেখেছে জীবনে। কখনো পাঠশালা থেকে ফেরার পথে— যখন বর্ষার ভারী মেঘ নীচু হয়ে ঘন ছায়া ফেলেছে চরাচরে— ঝুমকো হয়ে এসেছে আলো— তখন মহাবীরথানের বটগাছ পেরোবার সময়ে লোকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখেছে, তার সামনে এক আলোর গাছ। আলোর ঝালর তার পাতায় পাতায়, কাণ্ডে, ডালে। তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখছে হঠাৎ যেন পালটে গেছে পৃথিবীর রূপ। বাতাসে মাটিতে শূন্যে সর্বত্রই আলোময় কণা। খেলা করছে চরাচর জুড়ে আলোর কণিকাগুলি।

সে দেখল নানা রঙের আলো ছাড়া আর কিছু নেই। সেই কণাগুলিই খেলার ছলে তৈরি করছে গাছপালা, মাটি, মেঘ। তারাই ঘুরছে, ফিরছে, তৈরি করছে সবকিছু, আবার ভেঙে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে অন্য চেহারায়। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে ভয় পেয়ে চোখ বুজল। টের পেল তার দেহ জুড়ে সেই কণাগুলিরই খেলা চলছে। মাঝে—মাঝেই সে সেই কণাগুলিকে দেখতে পেত, ভাবত— তবে কি সৃষ্টির সত্য চেহারাটা এই যে, তা আলোময় এবং কণিকাময়? কখনো কখনো সে দেখেছে, সেই কণাগুলির চলাফেরা ছন্দময় যেন এই মহাবিশ্বের কোনো অশ্রুত সংগীতের সঙ্গে তারা সুরে বাঁধা।

তাদের দোলা এবং চলা সেই ছন্দটিকে প্রকাশ করছে।

কোনো লোকই তার এসব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। সেসব বিচিত্র আলোর বর্ণনা দিত মায়ের কাছে, বন্ধুর কাছে। তারা বলেছে পাগল।

সংসারী মানুষের আছে সুখবোধ। গৃহস্থ সুখ পায় পুত্রমুখ দেখে, নিজের সঞ্চয় দেখে। যতকিছু সে অধিকার করে পৃথিবীতে তত তার সুখ। লোকটার তেমন সুখ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তার অদ্ভুত এক আনন্দ আসে। একা একা সেই অকারণ আনন্দের প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে সে চিৎকার করে ছেলে—বউকে ডাকে, ডাকে চেনা লোকদের সেই আনন্দে সবাইকে শামিল করতে। বস্তুত কেউই তার সেই আনন্দকে বুঝতে পারে না। লোকটা অবাক হয়ে ভাবে, তবে বুঝি আমি পাগলই! আমার একার জন্যই বুঝি কিছু দৃশ্য আছে, কিছু শব্দ আছে, আছে অপার্থিব আনন্দ!

মাঝে মাঝে খেতের কাজ করতে করতে, পোয়াল নাড়া বাঁধতে বাঁধতে, গোয়াল পরিষ্কার করতে করতে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবে— আরে! আমি লোকটা কে। আমি এখানে কেন? এ তো আমার খেত নয়? এ তো নয় আমার বাড়িঘর। আরে! আমি যেন কোথায় ছিলাম— কোথায় ছিলাম! সে যে এক গভীর নীল স্নিগ্ধ জগৎ। সেখানে এক অদ্ভুত আলো ছিল। ছিল এক বিচিত্র সুন্দর শব্দ! সেই আমার জগৎ থেকে কে আমাকে এখানে আনল? কেন আনল এই মৃত্যুশীলতার মধ্যে, হঠাৎ সে চমকে উঠে বোধ করে— যে পথ দিয়ে আমি এসেছিলাম সেই পথের দু—ধারে ছিল অনেক তারা নক্ষত্র। সেই বীথিপথটি অনন্ত থেকে চলে গেছে অনন্তে। তার শুরু নেই শেষও নেই। সেই পথে চলতে চলতে কেন আমি থেমে গেলাম। নেমে এলাম এইখানে? এই কথা ভেবে লোকটা চারদিকে চেয়ে এক সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত অপার্থিবতাকে বোধ করে। কোনোকিছুকেই সে আর চিনতে পারে না।

সংসারী মানুষদের কাছে খেতখামার পশুপাখি গাছপালা ছেলে—বউ। এইসবের সঙ্গে তারা কেমন মেখেঝুখে থাকে। তারা নিজের জিনিস চেনে, চেনে পরের জিনিস। তারা সেসব জিনিসে নিজেদের চিহ্ন দিয়ে রাখে। অবিকল তাদের মতোই এই লোকটারও আছে সব। কিন্তু তাতে তার চিহ্ন দেওয়া নেই। বউ রাগ করে— তোমার বাড়ি তো বাড়ি নয়, এ হচ্ছে হাট। সারাদিন এখানে লোক আসে যায়। তোমার দিন কাটে দাওয়ায় বসে। কখনো—বা বলে— তুমি অন্যের খেত থেকে পাখি—পাখালি তাড়াও, ছাগল—গোরু

তাড়াও, অন্যের অসুখের দাও ওষুধ, অন্যের দুঃখে গলে পড়ো। আমাদের ওপর তোমার মন নেই। অথচ আমরাই তোমার আপনজন, আর এ সমস্ত তোমার নিজের জিনিস।

লোকটা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না। কেমন গুলিয়ে যায়। মাঝে—মাঝে সে যে নিজেকেই অনুভব করতে পারে না ঠিকমতো, তবে নিজের বলে কী অনুভব করবে?

এ কথা সত্য যে মানুষটি পৃথিবীকে ভালোবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে। গৃহস্থের এরকম হতে নেই। গৃহস্থকে এরকম হতে নেই। গৃহস্থকে আরও শক্ত হতে হয়, হতে হয় হিসেবি সঞ্চয়ী, তার চাই আত্মপর ভেদজ্ঞান। তার বউ বলে— আরও পাঁচজনকে দেখ। দেখ, তারা নিজেদের ঘরে বাস করে। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আছো পরের ঘরে।

লোকটার বউ বলে এ কথা। লোকটার বুড়ি মা—ও বলে। বেঁচে থাকতে লোকটার বাবাও বলত, এ সংসারে তুমি দুঃখ পাবে বলেই জন্মেছ।

লোকটা অন্যরকম বোঝে। সে যখন দাওয়ায় বসে দূরের গাঢ় ধূসর পাহাড়টিকে দেখে, যখন দেখে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশ কিংবা নিষ্পাপ শিশুর মুখ, তখন যে অনাবিল আনন্দকে সে টের পায়, সে আনন্দ তো তার নিজের। সে আনন্দের কারণ হোক না তার নিজের শিশু কিংবা দূরের পাহাড় কিংবা আকাশ — না কিনা সংসারের বাইরে— তার সৌন্দর্য। তবে তো আনন্দই নিজের, সেই আনন্দই আপন করে তোলে এই বিশ্বসংসারকে। যে জানে সে জানে, পর বলে কিছু নেই।

জলে ডুবে মারা গেছে একটি শিশু। বাপ তার মৃত শিশুকে শরীর ঢেকে কোলে নিয়ে চলেছে। লোকটা থেমে চেয়ে থাকে। দেখে শিশুটির মুখখানা ঢাকা, তবে পা দু—টি কেবল ঝুলে আছে। সেই শিশুটিকে কোনোদিনই দেখেনি লোকটা। আজও দেখল না। কেবল সেই চির অপরিচিত শিশুটির দু—খানা পা দেখে রাখল। বুকখানা ব্যথিয়ে উঠল তার। হু—হু করে কান্না এল। অচেনা বাপটির মুখ দেখে ফেটে গেল বুক। বড়ো অবাক হল সে। ভাবতে বসল, কেন এরকম হবে। যাকে কোনোদিন দেখিনি, যে আমার চেনা ছিল না, তার জন্য কান্না কেন। তাহলে কি যাদের পর করে রেখেছি তারা আমার যথার্থ পর নয়? ওই যে একমুহূর্তের একটু দুঃখ তা কি কাঁটার মতো নির্ভুল বলে দেয় না যে, ওই অপরিচিত শিশুটিও ছিল আমারই জন। যেমন দূরের দেশে আকাল এলে, মড়ক লাগলে মানুষের প্রাণ ছটফট করে। ওই একটু দুঃখ কি কয়েক পলকের জন্য দূর ও নিকট, আপন ও পরের ভেদরেখা মুছে দেয় না? চাবুকের মতো চকিতে আঘাত করে না মানুষের স্বার্থপরতাকে?

গাঁয়ের বুড়ো মাতব্বরা শুনে বলে, তুমি বাপু আহাম্মক। অচেনা একটা জলে ডোবা শিশুকে দেখে তোমার যে দুঃখ তা তো আসলে তোমার নিজের ছেলের কথা ভেবেই। ওই যে অচেনা বাপটির মুখে তুমি শোক দেখলে, ওই বাপের জায়গায় তুমি দেখেছ নিজেকেই। মানুষ কি পরের জন্য দুঃখ পায়। দুঃখ পায় নিজের যদি ওই অবস্থা হয়— এই ভেবে। দূরের দেশের আকাল কী মড়কের কথা শুনে লোকে যে অস্থির হয়, তা তার নিজের দেশের কথা মনে করেই। পরের জন্য যে দুঃখ, তা আসলে নিজেরই প্রক্ষোভ।

লোকটা উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতে যায়। মাঝপথে কী যেন মনে পড়ে। অমনি ফিরে এসে মাতব্বরদের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটাকে বলে, খুড়োমশাই, পূর্ণিমা কী অমাবস্যার জোরে আপনার হাঁটুতে বাতের ব্যথাটা বাড়ে, তা কি সত্যি?

বাড়ে তো।

তাহলে তো বলতেই হয় দূরের চাঁদের সঙ্গে আপনার শরীরের একটা সম্পর্ক আছে! বাইরে থেকে তো তা বোঝা যায় না।

আকাশে ঘনিয়ে আসে বর্ষার গাঢ় মেঘ। ঘন মেঘের ছায়া পড়ে চারধারে। বর্ষার ব্যাঙ ডাকে। বৃষ্টি নামে। লোকটা তখন তার দরজার চৌকাঠে বসে সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে। কোন দূর থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আসে, গাঢ় ভালোবাসায় মাখে মাটিকে, ভিজিয়ে দেয় গাছপালা! বৃষ্টির শব্দে যেন কোন ভালোবাসার কথা বলা

হতে থাকে। সে ভাষা বোঝে না লোকটা কিন্তু টের পায়। ওই যে বর্ষার ব্যাঙ ডাকে, গাছপালার শব্দ হয়, সে প্রাণ দিয়ে তা শোনে। তার মনে হয় ওই ব্যাঙের ডাক মেঘকে টেনে আনে, গাছপালা তাকে আকর্ষণ করে, মাটিতে টেনে নামায় মেঘ থেকে জল— এরকম টান—ভালোবাসার ওপরেই চলেছে সংসার! লোকটা সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে নিথর হয়ে তার চৌকাঠে বসে থাকে তা বসেই থাকে। তার চোখের পলক পড়ে না। এমনিই বসে থেকে সে শীতের কুয়াশা দেখে, দেখে বৈশাখের ঝড়।

মাঝে মাঝে বিছানায় শুয়ে নিশুতিরাতে তার ঘুম ভাঙে। বুকচাপা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে সে তবু তার হঠাৎ মনে হয় সে ঠিক ঘরে নেই। নিশিরাতের পরি তাকে উড়িয়ে এনেছে ঘরের বাইরে। শুইয়ে দিয়ে গেছে অবারিত মাঠের মাঝখানে। ঘরের দেওয়াল নেই, দরজা নেই, আগল নেই। টের পায়, ম্লানমুখ চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নার মায়াবী রূপ ধরেছে চরাচর। কুকুর কাঁদে। বাতাসে ভাসে পায়রার পালক। পায়রার ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে বেড়ালটা নিঃশব্দ থাবায় হেঁটে উঠেছে ঘরের চালে। তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা কাঁদছে, চাঁদ ও শূন্যতার দিকে চেয়ে— তার দু—টি ছানা নিয়ে গেছে শেয়ালে। বেড়ালটা সেই কান্না শুনে আকাশের দিকে তাকায়। দেখে, বিপুল বিস্তার। ম্লান জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় পার্থিব পালকগুলি ঝেড়ে উড়ে যায় একটি পায়রা। নিশুতিরাতের মায়াবী আলোয় সে পৃথিবীর সব সীমা পার হয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে বেড়ালটা সেই দৃশ্য দেখে। কুকুরটা কাঁদে, আর কাঁদে। চাঁদ দেখে, দেখে শূন্যতা। কায়াহীন সেই দূরগামী পায়রাটির দিকে একবার থাবা তোলে বেড়ালটা— দূরতর পায়রাটির জন্য সে একবার লোভ বোধ করে। তারপর কুকুরের কান্না শুনে থাবাটি তুলে রেখেই সে বসে থাকে।

লোকটা ঘুমোয় না। প্রতিটি দুঃখীর দুঃখকেই তার বহন করতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে প্রতিটি পাপীকে। তার বাবা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল— এই সংসারে দুঃখ পাবে বলেই তুমি জন্মেছ। সেই অভিশাপকে হঠাৎ তার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। সে উঠে চলে আসে। রুপালি নদীটির ধারে অবারিত মাঠটিতে! দেখে, আকাশের মহাসমুদ্র সাঁতরে ধীরে গতিতে চলেছে গ্রহপুঞ্জ, অথৈ সময়কে পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাদের জ্যোতি। লোকটির পায়ে পায়ে ক্ষণস্থায়ী ঘাসের ডগাগুলি থেকে গড়িয়ে পড়ে শিশিরের কণা। ঘরের চালে তখনও স্তব্ধ বিমর্ষতায় থাবা তুলে বসে থাকে বেড়ালটি। কুকুরটি তার দুটি হৃত সন্তানের জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে কাঁদে। লোকটির পায়ে পায়ে শিশির ঝরতে থাকে। কেবল শিশির ঝরে যায়।

কেমন নির্বিকার বয়ে যায় রুপালি নদীটি। সেই নদীটির আছে উচ্ছ্বাস, আছে আনন্দ বেদনা তবু কেমন উদাসীনতার গৈরিক রং তার সর্বাঙ্গে লোকটা দেখে, আর ভাবে। দুঃখও একরকমের ভাব, সুখও একরকমের ভাব। জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, সুখকেও। সুখদুঃখ কোনোটাই যেন ব্যাপ্ত না হয়, সব উৎপাত চুকে যাক। এই দয়া হোক তার প্রতি চিত্ত যেন উদাস থাকে। দয়া হোক তার প্রতি— এই দয়া হোক। সুখে দুঃখে তার থাক অপ্রতিহত আনন্দ, তার থাক বয়ে—যাওয়া। রুপালি নদীটি যেমন নিয়ে যায় মানুষের আবর্জনা ক্লেদ শ্রান্তি, বহন করে মানুষের বাণিজ্যের ভার! তেমনই সে বোধ করে, দুঃখ পাবে বলে নয়, সে সংসারে জন্মেছে সকলের দুঃখকে বহন করবে বলে। রুপালি নদীটির মতো নির্বিকার বয়ে যাবে।

বিনীত, সুন্দর একখানা অহংশূন্য মন নিয়ে সে চেয়ে থাকে। তখন তার চারপাশে খেলা করে আণবিক আলোর কণিকাগুলি। এক নিস্তব্ধ সংগীতের দোলাচল তাদের চলাফেরায়। তার কাছে উড়ে আসে এক নীলাভ জগতের স্মৃতি, উড়ে আসে আলো, আসে সুন্দর সব শব্দ— যা এই সংসারের নয়। এক অপরূপতাকে ঘিরে ধরে। তখন একে একে নিভে যায় জাগতিক হাত, পা, চোখ এবং মন। নিভে যায় চেনা মানুষের মুখ। তখন পাখির ডিমের মতো ভোর নীল আকাশের নীচে ঘাসের ওপর সে বসে হাঁটু গেড়ে। অনুভব করে, সে আর সে নয়। এখন ভোর, আকাশের তলায়, রুপালি নদীটির পাশে, অবারিত মাঠের ঘাসের উপর পড়ে আছে তার বীজ। সেই বীজটিতে একটিমাত্র বোধ সংলগ্ন হয়ে আছে— আমি। যে প্রাণপণে পৃথিবীর ঘাস মাটি আঁকড়ে ধরে। যেন বা এক দূত এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর দরজায়, হাত বাড়িয়ে

ভিক্ষা চাইছে তাকে। সে বিড়বিড় করে বলে, আর কিছুক্ষণ— আর কিছুক্ষণ আমাকে সংলগ্ন থাকতে দাও এ সংসারের সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাব।

গ্রামের এক প্রান্তে থাকে এক সাধক। বুড়োসুড়ো মানুষ। সাধন—ভজন আর ভিক্ষেসিক্ষে করে তার দিন কাটে। লোকটা তার কাছে যায়, তার দাওয়ায় বসে, জিজ্ঞেস করে, আপনি কি কখনো দেখেছেন আলোর গাছ? কিংবা ছন্দোবদ্ধ আলোর কণিকাগুলি? দেখেছেন মানুষ আলো বিকিরণ করে? কখনো কোনো নীলাভ জগতের স্মৃতি আপনার মনে আসে না? আপনি শোনেননি সেই শব্দ যা মানুষকে ভিক্ষা করে ফেরে?

বুড়োসুড়ো মানুষটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানায়— না। অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত মুখে তামাক খায়। তারপর একসময়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলে, আমি ওসব কিছুই দেখিনি বাবা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি দেখলেও বা দেখতে পারো। হয়তো সত্যিই আছে ওসব। আমিও শুনেছি সৃষ্টির মূলে আছে এক শব্দ।

লোকটার আর চাষবাস করতে ইচ্ছে করে না, যেমন ইচ্ছে করে না গোরুর দুধ দোয়াতে, ইচ্ছে করে না নিজের জন্য উপার্জন করতে। তা বলে সে বসেও থাকে না। লোয়াজিমা সংগ্রহ করে মানুষের জন্য। সে দেখে মানুষের জ্যোতি। বৈশিষ্ট্যমাফিক তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। সে মানুষকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে। দান করে দক্ষতা এবং ধর্ম। সে যা জানে সবই শেখায় তাদের, বর্ণভেদ অনুসারে। কেউ নেয় তার চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ নেয় অঙ্কশাস্ত্র, কেউ শেখে চাষবাস।

বউ গঞ্জনা দেয়, তোমার সংসার যে ভেসে গেল।

লোকটা হাসে, তাই কখনো যায়!

বউ বলে, তোমার যে বৃত্তি—পেশা নেই, উপার্জন নেই!

লোকটা বলে, তা কেন! আমার সব আছে। যেখানেই আমি বীজ বপন করেছি সেখানেই দেখেছি বৃক্ষের উৎপত্তি। একথা ঠিক যে নিজের জন্য আমার কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু মানুষে যদি বুঝতে পারে যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষেই প্রয়োজন, তবে তারাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার লোয়াজিমা তারাই এনে দেবে আমাকে। সংসারের মরকোচটা এরকমই হওয়া উচিত। টান—ভালোবাসার ওপর সংসার চলুক। আমি কেন স্বার্থ খুঁজে বেড়াব? লোকের ভালোবাসা জিগিয়ে দিই, তারা আমার সংসার কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

কিন্তু বউ তা মানতে চায় না। ঝগড়া করে। ছেলেরা বড়ো হয়েছে, তারা বাপকে সাবধান হতে বলে। কিন্তু ততদিনে লোকটা হয়ে গেছে মানুষ—মাতাল জগৎ—মাতাল। তার নিকটজনেরা তাকে বলে— অপদার্থ, বাউণ্ডুলে। তারা মনে করে এই লোকটাই তাদের দুঃখের কারণ। তারা লোকটার হাজার দোষ দেখতে পায়, দেখে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।

কিন্তু যারা দূর থেকে আসে, তারা তার কাছে এসে এক আশ্চর্য সুগন্ধ পায়। তারা টের পায়, এক স্নিগ্ধ আলোর ছটা তাকে ঘিরে আছে। বলে, আহা গো কী সুন্দর গন্ধ এখানে! তুমি যে মানুষের গায়ের আলোর কথা বল, সে আলো যে তোমারও রয়েছে! বড়ো সুন্দর আলোটি— হাঁসের পালকের মতো সাদা— এর মধ্যে কোনো হিংসা নেই, দ্বেষ নেই। এই আলোতে দু—দণ্ড বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা এসে বলে, তুমি যে আমাকে ওষুধের গাছ চিনিয়েছিলে, চিনিয়েছিলে রোগ নির্ণয় করতে, দেখ,সেই পেশায় আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি। একটা সময়ে আমি পড়ে থাকতুম বাবুদের বাড়ির আস্তাবলে, গোরু—ঘোড়ার সেবা করতুম, কিন্তু সে কাজে আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারত না যে আসলে ও—কাজ আমার নয়। আমার মধ্যে যে বৈদ্য হওয়ার গুণ আছে তা তুমিই বুঝেছিলে। এই দেখ, তোমার জন্য জামাকাপড়, তোমার বউয়ের জন্য শাড়ি—গয়না,তোমার ছেলেপুলেদের জন্য খেলনা আর খাবার।

এভাবে লোকটার সামনে অযাচিত উপহার জমে ওঠে।

যে লোকটা ছিল এ গাঁয়ের বিখ্যাত চোর, সে এসে একদিন সলজ্জ হাসিমুখে প্রণাম করে দাঁড়াল, বলল — আমাকে মনে আছে তো তোমার? আমি ছিলাম এদিকের দশখানা গাঁয়ের বিখ্যাত চোর। রোজ আমি রাতে চুরি করতে বেরোতুম, আর তুমি তোমার দাওয়া থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বলতে— ওরে আয়, চুরি করতে যাবি তো তার আগে একটু তামাক খেয়ে যা। দুটো সুখদুঃখের গল্প করি। তা আমি বুদ্ধিটা মন্দ নয় দেখে এসে বসতাম। তামাক খেতে খেতে পাঁচটা কথা এসে পড়ত। কথায় কথায় যেত ভোর হয়ে। আমি কপাল চাপড়ে চাপড়ে দুঃখ করে বলতাম, ওই যাঃ, গেল আমার একরাতের রোজগার। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতে, আজ রাতে সকাল—সকাল বেরোস। আবার পরের রাতেও তুমি ডাক দিতে। আবার রাত পুইয়ে যেত। আমি মনে মনে ভাবতাম, এই লোকটাই খাবে আমাকে। উপোস করিয়ে মারবে। তাই আমি তোমার দাওয়ার সামনেকার রাস্তাটা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলাম একদিন। কী করে টের পেয়ে মাঝপথে তুমি ছিলে ঘাপটি মেরে। ধরলে আবার, কথায় কথায় দিলে রাত পুইয়ে। রোজ এমন হতে থাকলে আমি একদিন অন্য উপায় না দেখে ধরলাম ঠেসে তোমার পা, বললাম— ঠাকুর, ব্রাহ্মণ হয়ে কেন তুমি আমার অন্ন মারছ! এ যে আমার বৃত্তি। এ না করলে যে ভাতে মরণ! তুমি হেসে বললে, আচ্ছা, আজ বাড়ি যা। তুই আর চুরির জানিস কী? আমি তোকে চুরির ভালো কায়দা—কৌশল শিখিয়ে দেব। আজ আমি যাব তোর সঙ্গে। শুনে ভারি ফুর্তি হল মনে। জানতাম, তোমার জানা আছে বিবিধ বিদ্যা। তুমি জানো রসায়ন, জানো গণিত, জানো বলবিদ্যা, জানো পদার্থের গুণ, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি হব চোরের রাজা। সেই রাতে বেরোলাম তোমার সঙ্গে। গল্পে গল্পে পথ হাঁটছি, যাব ভিনগাঁয়ে, ধনী মহাজনের দোকান লুটে আনব দু—জনে। মনে বড়ো ফুর্তি। হঠাৎ মাঝপথে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁরে, তোর ঘরে না সুন্দরী বউ আছে। আমি বললাম, তা আছে তো! তুমি বললে, আরে, তুই না একবার বলেছিলি, তোর পাশের বাড়িতে একটা বদ লোকের বাস, সে লোকটা তোর বউয়ের দিকে নজর দেয়! আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যি! তখন তুমি বললে, তা এই রাতে যদি সে লোকটা তোর ঘরে আসে! তুই তো রাতবিরেতে ফিরিস, তোর বউ ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। সে লোকটা হয়তো তোর গলা নকল করে ডাকবে, আর তোর বউ উঠে দরজা খুলে দেবে। যদি তাই হয়! রাতবিরেতে এক সুন্দরী বউকে রেখে বেরিয়েছিস— পাশেই ঘোঘের বাসা— কাজটা কি ঠিক হয়েছে? এমনি বিছের কামড়ের মতো মন ছটফট করে উঠল। বললাম, তাই তো! বলে সিঁদকাঠি ফেলে দৌড় লাগালাম ঘরের দিকে। তারপর থেকে সেই বিষ—যন্ত্রণায় আর ঘর থেকে বেরোতে পারি না। রাত হলেই ঘরের বাইরে মন টানে। বাইরে বেরোই তো ঘরের কথা ভেবে ফাঁপর হয়ে পড়ি। সে এমন দোটানায় পড়লাম যে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, রোগ হয়ে হাড় বেরিয়ে গেল। তখন আবার গিয়ে তোমার পায়ে পড়লাম— একী সর্বনাশ করলে আমার! আমার যে বৃত্তি ঘুচে গেল। অথচ চুরি ছাড়া আর যে আমি কিছুই শিখিনি! এখন কী করে আমার দিন চলবে? তুমি গম্ভীর হয়ে ভাবলে, ভেবে বললে, তোর যন্ত্রপাতিগুলি আন তো। এনে দেখালাম। তুমি সেসব দেখে—টেখে বললে, তুই তো তালাচাবির কলকবজা ভালো চিনিস। জানিস এদের মরকোচ। দেখ তো ভালো তালা বানাতে পারিস কি না— যে তালা চোর খুলতে পারে না। এইসব যন্ত্রপাতি তোর সবই কাজে লাগবে তাতে। তোমার সেই কথামতো মনের দুঃখে অগত্যা তালা তৈরি করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সেসব তালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এখন শহরে আমার ফলাও কারবার। পাঁচজন আমাকে ভদ্রলোক বলে সম্মান করে।

সেই চোর এই কথা বলে লোকটার সামনে তার পোঁটলা খুলে দেয়, বলে, তোমার জন্য এনেছি ভালো তামাক, হুঁকো, একজোড়া শহুরে চটিজুতো, ফলমূল—

এভাবে মানুষেরা আসে। নিজেদের গল্প বলে। তাদের সংগৃহীত উপহার দিয়ে যায়। তারা জানে, এ লোকটা বেঁচে থাকলে তারাও বাঁচবে, বাঁচবে আরও হাজারটা লোক! তাই লোকেরা এসে তাকে ঘিরে বসে,

নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে যায়, দেয় পরিধেয়, কখনো—বা শৌখিন জিনিস, রাত জেগে তাকে পাহারা দেয়।

তবু কেউই তাকে সঠিক বুঝতে পারে না। বলে— আরে! আহাম্মকটাকে দেখছি বিগ্রহ বানিয়েছে সবাই! প্রণামীর ঠেলায় আহাম্মকটা যে হয়ে গেল ধনী। কেউ বলে, ঘোড়েল লোকটাকে দেখ, আহাম্মকদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে!

এরকম বিবিধ কথা হয় লোকটার সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই জিজ্ঞাসা— 'বাপু, তুমি আসলে কে? আসলে কে? তুমি সত্যিকার কেমন?'

লোকটা উত্তর দিতে পারে না। আলো যেমন বলতে পারে না— আমি আলো, বাতাস যেমন বলতে পারে না— আমি বাতাস; সেইরকম সেও বলতে পারে না সে কী বা কে। কিন্তু মানুষের প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে একরকম অনুভব করে। বুঝতে পারে যোজন যোজন বিস্তৃত তার অস্তিত্ব। সে কেবল পৃথিবীকে ভালোবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে।

চৈতন্যময় আলোর আণবিক কণিকাগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে। তার ভিতর থেকে স্পন্দমান সৃষ্টির মূল শব্দটি উঠে আসতে থাকে। লোকটা ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশের দিকে চায়, চেয়ে থাকে দূরের পাহাড়টির দিকে। হঠাৎ অনুভব করে, তারই অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে আকাশ, বাতাস, নক্ষত্রপুঞ্জ, আলো এবং অন্ধকার। ওই যে দূরের পাহাড়টি, রুপালি নদীটি, ওই যে অবারিত মাঠ, অচেনা যেসব মানুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে, এই যেসব গাছপালা, পশুপাখি এই সবই জন্ম নিচ্ছে তার অস্তিত্ব থেকে, লয় পাচ্ছে তারই ভিতরে। সে তার এই অনন্ত অস্তিত্বের কথা লোককে বলতে পারে না। সে রাত জেগে দাওয়ায় বসে গুড়গুড় করে তামাক খায়, আর ভাবে, আর অনুভব করে। অনাবিল এক আনন্দের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সে সেই আনন্দের ভাগ কাউকেই দিতে পারে না। সে ঘোরেফেরে তার গাছপালাগুলির কাছে, বলে বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে পশুপাখি, গৃহপালিতদের বলে, বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে তার ছোটো ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলে, বেঁচে থাকো। বেড়ো ওঠো। তার দেহ থেকে সৌরভ এবং আলোর মতো ওই কথা সমস্ত বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে যায়— বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো।

তারপর একদিন পড়ে থাকে তার সংসার, তার সঞ্চিত সম্পদ। সে একা একা চলে আসে পাহাড়ে। একটা গুহা খুঁজে বের করে। গুহায় ঢুকে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় ভারী পাথরে। তারপর সেই নিস্তব্ধতায় বসে সে মানুষের জন্য কয়েকটি সৎ চিন্তা করে মরে যায়।

লোকটা মরে যায়, তার সেই চিন্তাগুলি কিন্তু মরে না। তারা ধীরে ধীরে তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঘুরে ঘুরে গুহা থেকে বেরোবার মুখ খোঁজে। তারপর তারা পাহাড় ভেদ করে, পার হয় নদী, প্রান্তর, পার হয়ে যায় সমুদ্র। অদৃশ্য কয়েকটি অলীক পাখির মতো মানুষের কাছে চলে আসে। ঘুরে ঘুরে বলে— তমসার পাড়ে আছেন এক আলোকময় অনামি পুরুষ। আমরা তার কাছ থেকে এসেছি, তোমরা আমাদের গ্রহণ করো।

কিন্তু, নিজের সুখদুঃখে কাতর মানুষ সেই ডাক শুনতেই পায় না।

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হনুর হাড়দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গাল বসা, চোখের নীচে গাঢ় কালি, আর তিনি মাঝে—মাঝে শুকনো মুখে ঢোক গিলছেন— কণ্ঠাস্থিটা ঘনঘন ওঠা—নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাঁকে খুব যত্ন করতাম। বিট—গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস, দুবেলা একটু একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝেমধ্যে এক—আধটা ডিমের হাফবয়েল তাঁকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার একমাস পরেও তার চেহারা ভালো হল না, বরং আরও দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ংকর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তার ভালো ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— তোমার কী হয়েছে বলো তো!

তিনি বিব্রত মুখে বললেন— অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমার এখনও সারেনি। ভেতরে ভেতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলি কটকট করে, জিভ তেতো—তেতো লাগে। তুমি আমার গা—টা ভালো করে দেখ তো!

গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা। সে কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উলটে বললেন— কী যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধহয় একটু একসারসাইজ করা দরকার। সকাল—বিকেল একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে,আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তাঁর সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়ই এসে আমাকে বলত— বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে। আমি বলি, চলো বাবা লেক পর্যন্ত যাই, বাচ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে,কিন্তু বাবা রেললাইন পারই হয় না। কেবল ঢুল—ঢুল চোখ করে বলে, তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময়ে আমাকে খুঁজে নিস।

আমাদের স্নানঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নি এসে চুপি চুপি বললেন, ও দিদি আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন, তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন, এইমাত্র বললেন, দেখ তো, অজিতবাবু তো কখনো এত দেরি করে না!

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, ওগো, কী হল।

তিনি বললেন, কেন?

এত দেরি করছ, কেন?

তিনি খুব আস্তে, যেন আপনমনে বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। তারপর হুড়মুড় করে জল ঢেলে কাক—স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? উনি বিরসমুখে বললেন, গা—টা এমন শিরশির করছিল যে জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চার ধারে উঠে বসেছিলাম।

বসেছিলে কেন?

ঠিক বসেছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠান্ডাটা সয়ে যায় কিনা। বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে একসময়ে বললেন, আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা, জলে ভেজা অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা ভরতি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে— কেমন যেন লাগে!

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন, ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আমার সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন— বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেব।

নিয়ে?

কোথাও বেড়াতে যাব। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার স্ট্রোক—ফোক কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারি! অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

জেগেছিলে! তবে সাড়া দাওনি কেন?

কী জানো! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারও ডাকে সাড়াই দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমনকী মাঝে—মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার তা বুঝতে অনেক সময় লাগে। কেউ কিছু বললে চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে, পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায় কাপড়ে উড়ে পড়ে— আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না।

শুনে, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক করে উঠল। বললাম, তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।

দুর! উনি হাসলেন। বললেন, আমার সত্যিই তেমন কোনো অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে একই জায়গায় থাকলে, একই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দেখ, আমরা প্রায় চার—পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যান্ডেল। আর কোথাও না। চলো, কাছাকাছি কোনো সুন্দর জায়গা থেকে মাসখানেক একটু ঘুরে আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাব যেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি।

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে। কেরানি। আর কিছুদিন বাদেই তিনি সাবর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে— অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভালো লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেনই। তখন সংসারের একটু ভালো ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারে

অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম— এখন এক—দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন, কীসের পড়াশুনো?

ওই যে এস—এ—এস না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল! ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন, তুমি আমার কথা ভাবো, না কি আমার চাকরি—বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আর একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি!

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম— বাঃ, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার এ ছাড়া আমার আর কী ভাবনা আছে বলো?

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ—মুখ লাল করে বললেন, আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম, এক নও?

উনি ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন, না। মোটেই না। সেটা বোঝে না বলেই তুমি সবসময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখ, আলাদা মানুষটাকে দেখ না।

হেসে বললাম, তাই বুঝি।

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাই। আমি যে কেরানি তা তোমার পছন্দ না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল এইরকম কেরানিই থাকব, তাতে তুমি সুখ পাও আর না পাও।

থাকো, না, আমি কেরানিকেই ভালোবেসেছি, তাই বাসব।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশি হলেন না। রাগ করে জানালার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে—মাঝে কাঁপছে ঠোঁট, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমনভাবে বসে আছেন যে রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয় বাচ্চা একটা রোগে—ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানালার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার। আজকালকার ছেলেমেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়ে— এতজনের চোখের সামনে ভরসন্ধেয় কী করে আমি ওঁর রাগ ভাঙাই! তবু পায়ের কাছটিতে মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে বললাম, লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে, চলো কিছুদিন ঘুরে আসি।

পরীক্ষা না হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি—বছর হয়।

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, তবু দেখ, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনোদিন আমি পরীক্ষা দেব না।

দিয়ো না। কে বলছে দিতে! আমাদের অভাব কীসের! বেশ চলে যাবে। এবার ওঠো তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশিক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই উনি কোথাও তেমন আদর—যত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা—বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড়ো হয়েছে। বি—এসসি পরীক্ষা দিয়েই ওকে সে বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্যবোধ করতে থাকেন। তখন ওঁর বয়স তিরিশ। ওঁর রুমমেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে? উনি খুব লজ্জা—টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন, চোখদুটি বেশ তো! তারপরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম

এসে লেক গার্ডেনসের পাশে গরিবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দু—জন, তখন উনি আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে— এই যে আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কি তুমি আর আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকি। তুমি আজ জানালায় দাঁড়াওনি...কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম কেউ কি টের পেয়েছিল! কী ঘুম বাব্বা!

ওঁর অভিমান দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত নয়। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগ সেই অনাদরে বড়ো হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষি নেই— আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়! এই ব্যাপারটা যেন একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালোমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপি চুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তার এই ভঙ্গির মধ্যে কোনো কাম—ইচ্ছা নেই। এ যেমন বাপি আমার বুকে মাথা গোঁজে অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে ওঁকে দু—হাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের আ—ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটি শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে আস্তে বললেন, তোমাকে মাঝে—মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবাটা কি পাপ?

কী জানি! আমি এর কী উত্তর দেব? আমি বিশ্বসংসারের রীতিনীতি জানি না। কার সঙ্গে কীরকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায় তা কী করে বুঝব! যখন ফুলশয্যার রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়— শিহরনেও নয়, বরং মনে হয়েছিল — বাঁচলাম! এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভেতরে সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়— আমাদের কখনো সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখে চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব কাউকে বোলো না। চলো জানালার ধারে গিয়ে বসি।

উঠলাম। ছোট্ট জানালার চৌখুপিতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দু—জন। বললাম, বলো। উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন, তোমার মনে আছে, বছর দুই আগে একবার কাঠের আলমারিটা কেনার সময়ে সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম?

ওমা, মনে নেই! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি।

আমার স্বামী একটা শ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম এ মাসে প্রিমিয়াম ডিউ—ফিউ নেই, তা ছাড়া রেডিয়োর শেষ ইনস্টলমেন্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ ভদ্রলোক, তা ছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওরই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে— বড়োলোক বলা যায় ওকে। সেই কারণেই বোধহয় ও কখনো টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তা ছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবে—টেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ—টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়িতে পৌঁছোলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল যার কাচের ওপর লাল ক্রশ আর ইংরেজিতে লেখা— ডক্টর। কিছু না ভেবে উপরে উঠে যাচ্ছি। সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথসকোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির উপরে দরজার মুখেই সত্যর বউ নীরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফর্সা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুক্ষ চুল, ময়লা শাড়ি,

সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ফুঁপিয়ে উঠল— ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু। শুনে বুকের ভেতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যচরণ পুবদিকে মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। মাথার কাছে ছোটো টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি—টিশি রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান—ট্যান। কিন্তু এগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দু—জন বিধবা দু—ধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়ো মতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দু—জন অল্পবয়সি ছেলে নীচু স্বরে কথা বলছে। দু—একটা বাচ্চাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কিনা জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম— যাকে— কী বলব— যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তবু আমি চোখবুজেও ওই ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে ওই ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাকগে, আমি ওই গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম নীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়তো এখুনি মরবে না, আরও একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠে গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখনও সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি—ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কে? বললাম, আমিরে, আমি অজিত। বলল, ওঃ অজিত! কবে এলি? বুঝলাম একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম, এইমাত্র। কেমন আছিস? বলল, এই একরকম, কেটে যাচ্ছে। আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো ওষুধ—টসুধের গন্ধে আমার কীরকম গা গুলায়! তাই একসময় ওর কাছে নীচু হয়ে বসলাম, তোর টাকাটা দিতে এসেছি। ও খুব অবাক হয়ে বলল, কত টাকা! বললাম, পঞ্চাশ। ও ঠোঁট ওলটাল, দুর, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশি চেয়েছিলাম! আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, তুই তো আমার কাছে চাসনি! আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম— তোর মনে নেই? ও বেশ চমকে উঠে বলল, না, ধারের কথা নয়। কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশি। জিজ্ঞেস করলাম, কী চেয়েছিলি? ও খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল, বলল, কী যেন— ঠিক মনে পড়ছে না— ওই যে— সব মানুষই যা চায়— আহা, কী যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে। বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের ঢাকার নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ— পেচ্ছাপ করার সময়টায়, ও বিকৃত মুখে ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করল শুয়ে শুয়ে। তারপর আবার আস্তে আস্তে একটু গা—ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, তোর কাছেই চেয়েছিলাম না কি— কার কাছে যে— মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম— বুঝলি— কোনো ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে চেয়েছিলাম, আবার ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম— কিন্তু শালা মাইরি দিল না...। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী চেয়েছিলি! ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল, ওই যে— কী ব্যাপারটা যেন— নীরাকে জিজ্ঞেস করত তো, ওর মনে থাকতে পারে— আচ্ছা দাঁড়া —একশো থেকে উলটোভাবে গুনে দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে। বলে ও খানিকক্ষণ গুনে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল— না সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না। আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম— তুই তো সবই পেয়েছিস! ও অবাক হয়ে বলল, কী পেয়েছি— অ্যাঁ— কী? আমি মৃদু গলায় বললাম— তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভালো চাকরি, নীরার মতো ভালো বউ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিঙে কনভেন্ট

পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইন্সিয়োরেন্স— তোর আবার কী চাই? ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলি একটুও চিকমিক করল না, ও বলল— এসব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশি আর একটা কী যেন— বুঝলি— কিন্তু সেটার তেমন কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ওই চাওয়াটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম—কী যেন একটা— আমি ভেবেছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস! কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশ টাকা— তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিলি— কিন্তু কী ব্যাপারটা বল তো, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস সবাই চায়!

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাবসাব লক্ষ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন— অনু, সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম— তুমি খুব বকেছিলে— আর পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর— মনে আছে? আমি মাথা নাড়লাম।

সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় তার মনে পড়েনি। কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ পর্যন্ত কেবলই ভাবছি কী সেটা যা সত্যচরণ চেয়েছিল! সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে বলতে আমার স্বামী দু—হাতে আমার মুখ তুলে নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল সত্যচরণ যা চাইছে সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না ও কী চাইছে। কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি।

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী গো সেটা?

আমার স্বামী শ্বাস ফেলে বললেন, মানুষের মধ্যে সবসময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকাপয়সা নয় আমার বোধ বুদ্ধি লজ্জা অপমান জীবন মৃত্যু— সবকিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব। রোজগার করতে করতে, সংসার করতে করতে মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো সত্যচরণের মতো মরার সময়ে মানুষ দেখে সে দিতে চায়নি, কিন্তু নিয়তি কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে— এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভালো ছিল।

অনুভব

সামনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই হৃদয়ের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কাজ করল। কাগজটা মুখ থেকে সরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে নীচের মাঝারি চওড়া রাস্তার দিকে চেয়ে সে দেখল তার ছেলে মনীশ, নাতি অঞ্জন আর পুত্রবধূ শিমুল আসছে। দৃশ্যটি এই শরতের মেঘভাঙা উজ্জ্বল সোনালি রোদে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। মনীশের পরনে গাঢ় বাদামি রঙের চৌখুপিওলা ঝকঝকে পাতলুন, গায়ে হালকা গোলাপি জলছাপওলা হাওয়াই শার্ট। লম্বাটে গড়নের, ফর্সা ও মোটামুটি স্বাস্থ্যবান মনীশকে বেশ তাজা ও খুশি দেখাচ্ছে। রাতে নিশ্চয়ই খুব ভালো ঘুমিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি এবং হাতে কিছু বাড়তি টাকা আছে। নাতির পরনে নীল চৌখুপি এবং ডোনাল্ড ডাকওলা বাবাসুট, শিমুলের শ্যামলা ছিপছিপে শরীরে আঁট হয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে একটা বিশুদ্ধ দক্ষিণী রেশমের কাঁচা হলুদ রঙের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি।

দৃশ্যটা চমৎকার। মনীশের হাতে সন্দেশের বাক্স। শিমুলের কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলছে। আজ রবিবার, ওরা সারাদিন থাকবে, সন্ধের পর ব্যান্ডেল রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে। মনীশ বাবাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে চেনা দিল। হৃদয়ও হাত তোলে। তারপর নিস্পৃহ হয়ে আবার ইজিচেয়ারে পিছনে হেলে বসে খবরের কাগজের দিকে তাকায়।

কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে না হৃদয়। সে বসে তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা ইনস্টিংক্ট—এর কথা ভাবতে থাকে। এই যে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ইশারা জেগে উঠল আর হৃদয় দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় তাকিয়ে দেখল সপরিবারে তার ছেলে আসছে, এ ব্যাপারটা তাকে বেশ খুশি করে। এমন নয় যে ছেলেকে দেখে তার আনন্দ হয়েছে। বরং এই এ রবিবারের আগন্তুক মনীশকে সে খুব একটা পছন্দ করে না। ওর বউ শিমুলকে আরও নয়। মনীশের বয়স এখন বছর পঁচিশেক হবে, হৃদয়ের ধারণা শিমুলের বয়স মনীশের চেয়ে অন্তত বছর দুই—তিন বেশি। নাতি অঞ্জনকে এমনিতে খারাপ লাগে না হৃদয়ের, তবে তার বাপ—মা তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত এবং সতর্ক যে হৃদয় তার সম্পর্কে খুব আগ্রহ বোধ করে না আজকাল। একটু ক্যাডবেরি কী সন্দেশ হাতে দিলেও অঞ্জনের বাপ—মা সমস্বরে 'ওয়ার্মস ওয়ার্মস' বলে আঁতকে ওঠে। আরে বাবা কৃমি কোন বাচ্চার নেই? তা বলে কি বাচ্চারা মিষ্টি খাচ্ছে না? অন্য কেউ স্নান করালে নাকি ছেলের ঠান্ডা লাগে বলে শিমুলের ধারণা। এ বাড়িতে এসেই ছেলের জন্য শিমুল ফি রবিবার হাফ বয়েল্ড ডিম আর সবজির স্টু বানানোর বায়না ধরবে। অত যত্নের ছেলেকে ছুঁতে একটু ভয় করে হৃদয়ের। আর ভয় করলে ভালোবাসা বা স্নেহটা কিছুতেই আসতে চায় না।

কিন্তু হৃদয় তার ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে দেখে খুশি হোক বা না হোক, এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সে নিজের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দেখে কিছু তৃপ্তি পেয়েছে। বলতে কী, এই ইনস্টিংক্ট যে তার আছে এ বিষয়ে বরাবর সে নিঃসন্দেহ ছিল। সেবার জামসেদপুর যাওয়ার সময় তার কামরায় টি টি একটা বিনা টিকিটের ছোকরাকে ধরেছিল। ছোকরা বারবার তার এ পকেট ও পকেট খুঁজে রাজ্যের কাগজপত্র, নোটবই, রুমাল খুঁজে খুঁজে হয়রান। বলছে— টিকিটটা ছিল তো! পকেটেই রেখেছিলুম! কেউ বিশ্বাস করছিল না অবশ্য। টি টি তাকে বাগনানে নামিয়ে জি আর পি—তে দিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। ছোকরা তখন হৃদয়ের দিকে চেয়ে সাদা মুখে বলেছিল— দাদা, ঝাড়গ্রামে স্টেশনের কাছেই আমার দোকান, আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন, আমি ঝাড়গ্রামে নেমে ছুটে গিয়ে টাকা এনে দিয়ে দেব আপনাকে। হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট তখনই বলেছিল যে, এ ছোকরা মিথ্যে বলছে না। চোখে—মুখে সরল সত্যবাদিতার ছাপ ছিল তার। টিকিটও হয়তো কেটেছিল। কিন্তু ইনস্টিংক্টকে উপেক্ষা করেছিল হৃদয়। ভেবেছিল, যদি আহাম্মকের মতো ঠকে যাই? পরে

অবশ্য ছোকরা সেই কামরাতেই খুঁজে পেতে তার ঝাড়গ্রামের চেনা লোক বের করে ভাড়া মিটিয়ে দেয় এবং হৃদয়ের কাছে এসে একগাল সরল হাসি হেসে বলে, দাদা, পেয়ে গেছি। শুনে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের। সে তো জানত, মুখ দেখেই তার সূক্ষ্ম অনুভূতিবলে টের পেয়েছিল, ছোকরা মিছে কথা বলছিল না। তার সেটুকু উপকার সেদিন করতে পারলে আজ এই সুন্দর সকালের সোনালি রোদটুকুকে আর একটু বেশি উজ্জ্বল লাগত না কি তার কাছে?

ওরা দোতলায় উঠে এসেছে টের পাচ্ছিল হৃদয়। তার বউ কাজল দরজা খুলে নানারকম অভ্যর্থনা ও আনন্দের শব্দ করছে। করবেই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মনীশই যা একটু—আধটু আসে। আর সবাই দূরে। মেজো ছেলে অনীশ আমেরিকায়, ছোটো ক্ষৌণীশ তার মেজদার পাঠানো টাকায় দেরাদুনে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে। একমাত্র মেয়ে অর্পিতা বোম্বাইয়ে স্বামীর ঘর করে। এ বাসায় কাজল আর হৃদয়, হৃদয় আর কাজল। শুনতে বেশ। কিন্তু আসলে যৌবনের সেই প্রথমকাল থেকেই কোনোদিন কাজলের সঙ্গে বনল না হৃদয়ের। ফুলশয্যার রাতেই কাজল প্রথম আলাপের সময় বলেছিল, আমি কিন্তু গানের ক্ষতি করতে পারব না তাতে সংসার ভেসে যায় যাক। তখনই হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট বলেছিল, একথাটা এই রাতে না বললেও পারত কাজল। বিয়েটা হয়তো সুখের হবে না।

হয়ওনি। কাজল গান ছাড়েনি। এখনও রেডিয়োতে মাঝে—মাঝে গায়, দু—একটা গানের স্কুলে মাস্টারি করে। প্রাইভেটে শেখানো তো আছেই। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তার কথা শুনে যেমন মনে হয়েছিল এ মেয়ে বোধহয় লতা মঙ্গেশকর হবে, তেমনটা কিছুই হয়নি। বরং অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে জীবনে কিছু জটও পাকিয়েছে কাজল। তাকে বিভিন্ন ফাংশনে চান্স দিতে পারে বলে কিছু প্রভাবশালী লোকের খপ্পরে পড়ে নিজেকে নষ্ট করেছে। হৃদয় কানাঘুষো শুনেছে, কাজল নিজের পবিত্রতা বজায় রাখে না। এখানেও সেই ইনস্টিংক্ট। ছোটো ছেলে ক্ষৌণীশকে কোনোদিনই নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারে না হৃদয়।

মনীশ বারান্দায় এসে পাশের টুলের উপর হৃদয়ের অভ্যস্ত ব্র্যান্ডের এক প্যাকেট সিগারেট আর এক বাক্স ভোটা দেশলাই রেখে বলে, কেমন আছো বাবা।

হৃদয় আজকাল কথা বলতে ভালোবাসে। কিন্তু কথায় ভেসে যেতে ভারি ভয় হয়। তার সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁকে সাবধান করে দেয়, কথা বোলো না, বেশি কথা বললেই ওরা বিরক্ত হবে। ভাববে তুমি বুড়ো হয়েছ। তোমার ব্যক্তিত্ব নেই।

হৃদয় সতর্ক হয়। এত বেশি সতর্ক হয় যে মুখই খোলে না। ঘাড় নেড়ে জানায় ভালো। অনীশ আমেরিকা থেকে তার ডাক্তার দাদার জন্য খুবই আধুনিক ধরনের একটা ব্লাড প্রেশারের যন্ত্র পাঠিয়েছে। সেটা প্রতিবারই সঙ্গে আনে মনীশ। আজও এনেছে। টুলের উপর রেখে হাত বাড়িয়ে বলল, হাতটা দাও প্রেশারটা দেখি।

হৃদয় মাথা নাড়ে, না। খামোখা দেখ। হৃদয়ের প্রেশারের কোনো গণ্ডগোল নেই। তেমন কিছু বয়সও তো হয়নি তার। মোটে সাতচল্লিশ। একুশ বছর বয়সে সে বিয়ে করেছিল মায়ের বায়নায়। বাইশ বছর বয়সে মনীশ হয়। এখনও হৃদয়ের চেহারা ছিপছিপে, পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশের বেশি দেখায় না। চুল এখনও বেশ কুচকুচে কালো, চলাফেরা যুবকের মতো চটপটে। বয়সের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। তবে যে মনীশ প্রায়ই তার প্রেশার দেখে এটা একরকম তোষামোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাপকে সে কোনোদিনই রোজগারের পয়সা দেয় না।

মনীশ চাপাচাপি করল না, তবে কৌতূহলভরে মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমার মেজাজটা আজ খারাপ নাকি?

বারান্দার ওদিকটায় নাতি কোলে করে কাজল এসে দাঁড়াল। 'ওই দেখ, ওই দেখ' বলে রাস্তায় আঙুল দিয়ে কী একটু দেখিয়ে ফিরে চাইল হৃদয়ের দিকে। বেশ কোমল গলায় বলল, দেখাও না প্রেশারটা। দেখাতে দোষ কী?

হৃদয় তার প্লাস পাওয়ারের চশমাটা খুলে কোলের ওপর রেখে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠান্ডা গলায় বলে, কেন দেখাব?

এই স্বর চেনে কাজল। ভ্রূ কুঁচকে স্বামীর দিকে চায়। তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে, থাক থাক, দেখাতে হবে না।

মনীশ খুব চালাকের মতো বলে— বাবা, ডোন্ট মাইন্ড। জাস্ট চেক আপ করতে চেয়েছিলাম। জাস্ট চেক আপ, তা ছাড়া কিছু নয়।

কাজল ধমকে দেয়, থাক তোকে দেখতে হবে না। যে চায় না তারটা দেখবি কেন?

হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট বলল, আজকের দিনটা ভালো যাবে না। হয় দুপুরে, নয়তো রাত্রে একটা তুমুল ঝগড়া লাগবে কাজলের সঙ্গে। লাগবেই।

কাজল নাতিকে নিয়ে এবং মনীশ তার যন্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। হৃদয় বসে থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলায়। জনতা গভর্নমেন্ট হয়তো বেশিদিন টিকবে না। ইন্দিরাও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা ফিরে পাবে বলে মনে হয় না। তাহলে নাইনটিন এইট্টিতে ভারতবর্ষ শাসন করবে কে? ভূতে?

যে যুবতী মেয়েটি তাদের রান্না করে সে এসে টুলের উপর এক কাপ চা রাখল। মেয়েটির দিকে কোনোদিনই খুব ভালো করে তাকায় না হৃদয়। তাকাতে ভরসা হয় না। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ কী সাতাশ হবে। স্বামী নেয় না বলে কসবায় বাপের বাড়িতে থেকে কাজ করে খায়। এ বাড়িতে দু—বেলা রাঁধে, সারাদিন নানা কাজ করে, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যায়। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। রাঁধে অবশ্য খুবই ভালো। ইংলিশ ডিনার থেকে মাদ্রাজি ইডলি—দোসা সবরকম খাবার করতে পারে। কিন্তু সেটা কোনো যোগ্যতা নয়। আসল যোগ্যতা হল, ওর বয়স। চমৎকার বয়স। চেহারাখানা রোগাটে হলেও খাঁজকাটা শরীরের একটা লাবণ্য আছে। মুখখানা মোটামুটি। আগে উলোঝুলো ঝি—র মতো আসত। এখন সাজে। পরিপাটি করে বাঁধা চুল, চুলে লাল—নীল ফিতে, কপালে টিপ। হৃদয়ের সামনে আসার আগে মুখখানা যে আঁচল দিয়ে ভালো করে মুছে আসে তা হৃদয় ইনস্টিংক্ট দিয়ে টের পায়।

গভীর শ্বাস ছেড়ে হৃদয় বলে, হুঁ।

আজও পেল। খবরের কাগজের ডানদিকের পাতায় কোনাচে একটা খুনের খবরে চোখ রেখেও হৃদয় বুঝতে পারে ললিতা তার দিকে খুব নিবিড় চোখে চেয়ে আছে। একটু চাপা গলায়, যেন গোপন কথা বলার মতো করে বলল, আপনার চা।

লক্ষ করেছে হৃদয়, বয়সে যথেষ্ট ছোটো হলেও ললিতা তার বউকে বউদি আর তাকে দাদা বলেই ডাকে। আবার মনীশ আর তার বউকে বলে বড়দা আর বড়োবউদি! কাজল বলে—বলেও তাকে আর হৃদয়কে মাসি—মেসোরগোছের কিছু ডাকাতে পারেনি ললিতাকে দিয়ে। এ সবই একরকম ভালো লাগে হৃদয়ের। একটা গোপন অবৈধ তীব্র অনুভূতি। ললিতা তাকে মেসো বলে ডাকলে হয়তো এই অনুভূতিটা হত না তার।

কাজল গানের স্কুল বা টিউশনিতে যায়। ছুটির দিনে ফাঁকা বাড়িতে কতদিন একাই থাকে হৃদয় আর ললিতা। কোনোদিন হৃদয় সচেষ্ট হয়নি। ললিতাও না। তবে দু—জনকে ঘিরে একটা তীব্র অনুভূতির বৃত্ত যে বরাবর তৈরি হয়েছে এটা ইনস্টিংক্ট দিয়ে কতবার টের পেয়েছে হৃদয়। কিন্তু বাইরে ভালোমানুষ এবং ভেতরে এক শয়তান হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে আর কীই বা করতে পারে?

হৃদয়ের আর কিছুই বলার ছিল না। ললিতা চলে গেল। কিন্তু হৃদয়ের কেমন যেন মনে হয়, ললিতা আর তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু হৃদয়ের যে বলার মতো কথা নেই। জীবনে অন্তত একবার খারাপ হওয়ার বড়ো ইচ্ছে তার। কিন্তু কিছুতেই একটা মানসিক ব্যারিকেড ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

এই ব্যারিকেড অনায়াসে ভেঙেছে কাজল। যতই বুঝতে পেরেছে যে, স্বাভাবিক পথে গানের জগতে সে ওপরে উঠতে পারবে না, ততই সে অলিগলি রন্ধ্রপথের সন্ধানে নিজেকে সস্তা করেছে। হৃদয়ের সঙ্গে

সম্পর্কটা বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বিষিয়ে যায়। তাই হৃদয় একসঙ্গে থেকেও কাজলকে বিশেষ নজরে রাখেনি। কিন্তু টের পেয়েছে ঠিকই। তার ইনস্টিংক্ট কম্পাসের কাঁটার মতো নির্দেশ করে দিয়েছে। অনেক বছর আগে সন্ধেয় হৃদয় এমনি বারান্দায় বসে ঝুঁকে রাস্তা দেখছিল। তার দু—পাশে কিশোর মনীশ আর কিশোরী অর্পিতা। হঠাৎ রাস্তার ভিড়ের মধ্যে সে কাজলকে ফিরতে দেখল। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই সন্ধে পার করে কাজল বাসায় ফেরে। তবু সেদিন নতমুখী, অন্যমনা কাজলের হেঁটে আসার ভঙ্গির মধ্যে কী দেখে তার ইনস্টিংক্ট নিঃশব্দে উঠল— অস্পৃশ্য! অস্পৃশ্য! তখন মনীশ আর অর্পিতা ভারি খুশির গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল— মা! কাজল ওপরের দিকে তাকায়নি। খুব অন্যমনস্ক ছিল।

সেই রাত্রেই শোওয়ার ঘরে হৃদয়ের জেরার কাছে প্রায় ধরা পড়ে কাজল। কিন্তু স্বীকার করল না কিছু, উলটে কত ঝগড়া করল। কিন্তু তাতে হৃদয়ের অনুভূতি বদলে গেল না।

এতদিন বাদে এই সুন্দর শরতের ভোরে সেইসব পুরোনো কথা মনটা ভারি এলোমেলো করে দিল। বাতাসে কোল থেকে উড়ে গড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজের আগলা পাতা। গত তিন—চার বছর ধরে একটানা কাজলের সঙ্গে তার সম্পর্কহীনতা চলছে।

হৃদয় উঠল। কারও সঙ্গে কথা বলল না, পায়জামার ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে, মানিব্যাগটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বেরোবার মুখে শুনতে পেল তিনটে শোওয়ার ঘরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো সেই পূর্ব—দক্ষিণ কোণের ঘরে মনীশ আর কাজল কথা বলছে। অঞ্জনকে ভেতরে ডাইনিং স্পেসে খাওয়াতে বসিয়েছে শিমুল। শিমুলকে ভালো করে চেনেও না সে। একদিন মনীশ ওকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল প্রণাম করাতে। সেই প্রথম দেখা। সামাজিক মতে একটু বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল পরে। তারপর থেকে ওরা আলাদা। শিমুল শ্বশুরকে দেখে নড়ল না, একটু ভদ্রতার হাসি হেসে বলল, ভালো তো?

হৃদয় ভ্রূ কোঁচকায়। এরা কারা, কোত্থেকে এল তা যেন ঠাহর পায় না। এত অনাত্মীয় এরা যে কথার জবাব পর্যন্ত দিতে ইচ্ছে করে না তার। দিলও না হৃদয়। ভেতরের বারান্দায় এসে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানোর সময় একবার অভ্যাসবশে রান্নাঘরের দিকে একঝলক তাকাল সে। ললিতা প্রেশার কুকারের স্টিম ছাড়ছে। ধোঁয়াটে বাষ্পের মধ্যে আবছা দেখায় তাকে। তবু দু—খানা চোখের কৌতূহলভরা দৃষ্টি স্পর্শ করে হৃদয়কে। কাউকে কিছু বলে আসেনি হৃদয়। কিন্তু কে জানে কেন ললিতার দিকে চেয়ে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি।

ললিতা তাড়াতাড়ি প্রেশার কুকার রেখে উঠে আসে। মুখ ঘেমো ভাব, চুল কিছু এলোমেলো, অকপটে চেয়ে থেকে বলল, ফিরতে কি দেরি হবে?

হতে পারে।

ললিতা কিছু বলল না। কিন্তু সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, যতক্ষণ হৃদয় না চোখের আড়ালে গেল।

পুরোনো আড্ডা সবই ভেঙে গেছে। বাইরের পৃথিবীটা এখন আর আগেকার মতো নেই। বড্ড পর হয়ে গেছে সব। এখন হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল তার দোতলার ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দাটুকু। এ গ্রেড ফার্মে সবচেয়ে উঁচু থাকের কেরানি হিসেবে তাকে অফিসে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়। সেটুকু সময় বাদ দিয়ে বাকি দিনটুকু সে বসে থাকে বারান্দায়। বেশ লাগে। অনেক মাইনে পায় হৃদয়। ওভারটাইম নিয়ে হাজার দুই আড়াই কী কখনো তারও বেশি। পুজোর মাসে দেদার বোনাস পেয়েছে। সবটা তার খরচ হয় না। কাজলেরও আয় খারাপ নয়। দু—জনের বনিবনা নেই বলে কাজল তার কাছে বড়ো একটা বায়না বা আবদার করে না। তাই হাতে বেশ টাকা থাকে হৃদয়ের। কিন্তু সেই টাকা খরচ করার পথ পায় না সে। কী করবে? মদ খেতে রুচি হয় না। জামা—কাপড়ের শখ নেই। জিনিস কেনার নেশা নেই। কী করবে তবে?

বুক পকেটে মানিব্যাকটা টাকার চাপে ফুলে হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে। ভারী লাগছে। ব্যাগে কত টাকা আছে তার হিসেব নেই হৃদয়ের। কয়েক শো হবে। হাজারখানেকের কাছাকাছিও হতে পারে।

চওড়া গলি পার হয়ে কালীঘাটের উলটোদিকে রসা রোডে এসে দাঁড়ায় হৃদয়। লক্ষ লক্ষ লোক ছুটি আর রোদে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে তা ভেবে পাওয়া শক্ত। মোটামুটি সকলেরই কোনো—না—কোনো গন্তব্য রয়েছে যা হৃদয়ের নেই। চারদিকে এত অচেনা মানুষের মধ্যে আজকাল বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে সে। কেন যেন তার ইনস্টিংক্ট তাকে সবসময়ে সাবধান করে দেয়, চারদিক সম্পর্কে সজাগ থেকো। এরা বেশিরভাগই খুনে, বদমাশ, চোর, পকেটমার, দাঙ্গাবাজ, ঝগড়াটে। তোমাকে একটু বেচাল দেখলেই পকেট ফাঁক করবে, ঝগড়া বাধাবে, অপমান করবে, মেরে বসবে বা মেরেই ফেলবে।

ফাঁকা অলস গতির ট্যাক্সি ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে কিছু না ভেবেই হাত তোলে হৃদয় এবং উঠে পড়ে। আজকাল তার বাইরে সম্পর্কে ভীতি জন্মেছে আগে যা ছিল না। সে সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে নিজের সামনের বারান্দায়। যদি তার কোনো গন্তব্য থাকে তবে তা ওই ভাড়াটে বাড়ির বারান্দাটুকুই। বাদবাকি শহর, দেশ বা রাষ্ট্র তার কাছে এক দূরের অচেনা রাজ্য। ট্যাক্সি চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছে, পিছু হেলে বসে হৃদয় নিস্তেজ চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। তার সুখদুঃখের বোধ ডুবে গেছে একবারে। কী সুখ কী দুঃখ বলতে পারে না। এত অনাত্মীয় হয়ে গেছে তার আত্মীয়স্বজন যে তার ভয় হয়, এদের মধ্যে কেউ মরে গেলে সে তেমন কোনো শোক করবে না। ভেবে মাঝে—মাঝে সে একটু অবাক হয়। নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করে, যদি এখন মনীশ বা অনীশের কিছু হয় তবে তোমার রিঅ্যাকশন কেমন হবে? যদি কাজলের কিছু হয়, তাহলে? ইনস্টিংক্ট তাকে বলে, কিছু হলে তোমাকে বাপু জোর করে থিয়েটারি কান্না কাঁদতে হবে।

কামুর আউটসাইডার বইখানা পড়েছে হৃদয়, অ্যালিয়েশনের কথাও তার অজানা নয়। সে কি ওইসবেরই শিকার। হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে— না হে, তা নয়। আসলে তোমার সন্ন্যাসী হওয়ারই কথা ছিল যে! তা হতে পারোনি বলে তোমার মনটা তোমাকে ফেলে জঙ্গলে চলে গেল এখন তুমি আর তোমার মন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

মানিব্যাগটা বুকে বড্ড চাপ দিচ্ছে। দম চেপে ধরছে। অস্ফুট একটু শব্দ করে হৃদয়। ট্যাক্সিওয়ালা বাঙালি ছোকরাটি একবার ফিরে যায়। বলে, কিছু বলছেন?

হৃদয় মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, সে কিছু বলছে, বহুদিন আমাকে বড়ো অনাদর করেছ তোমরা। ঠিকমতো লক্ষ করোনি আমার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র বা ফুসফুস ঠিকঠাক কাজ করেছে কিনা। জানতে চাওনি কতখানি রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আমার হৃদয়।

হৃদয় মানিব্যাগটাকে পকেটসুদ্ধ খামচে ধরে বুক থেকে আলগা করে রাখে। তারপর ট্যাক্সির মুখ ঘোরাতে বলে। কোথাও যাওয়ার নেই শুধু ওই নিয়তি—নির্দিষ্ট বারান্দাটা ছাড়া।

বাড়ি ফিরে আসতে আসতে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল হৃদয়ের। কেন এই বাড়ি ছাড়া তার আর কোনো গন্তব্য থাকবে না? কেন আর কোথাও তার যাওয়ার নেই? কেন এত কম মানুষকে চেনে সে?

মানিব্যাগটা আলগা করে ধরে রেখেও বুকের বাঁ ধারে অস্বস্তিটা গেল না। দমচাপা একটা ভাব। রসা রোডে নিজের গলির মোড়ে ট্যাক্সিটা ঠিক যেখানে ধরেছিল সেখানেই আবার ছেড়ে দিল সে। কী অর্থহীন এই যাওয়া আর ফিরে আসা!

বেলার রোদ খাড়া হয়ে পড়ছে। জ্বলে যাচ্ছে শরীর, ঝলসে যাচ্ছে চোখ। হৃদয় ধীর পায়ে হেঁটে গলিতে ঢুকল। আস্তে আস্তে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। ওপরে খুব হইচই শোনা যাচ্ছে। এবার পুজোয় কাজলের একটা আধুনিক গানের একসটেন্ডেড প্লে রেকর্ড বেরিয়েছে। স্টিরিয়োতে সেই রেকর্ডটা বাজছে এখন। বহুবার শোনা হৃদয়ের। কেউ বাড়িতে এলেই বাজানো হয়। জঘন্য গান। প্রায় অশ্লীল দেহ ইঙ্গিতে ভরা ভালোবাসার কথা আর তার সঙ্গে ঝিনচাক মিউজিক।

দোতলার বারান্দায় উঠতে খুবই কষ্ট হল হৃদয়ের। মানিব্যাগটা বের করে ঝুল পকেটে রেখেছে, তাও বাঁদিকের বুকের চাপটা যায়নি। এখন সেই চাপ—ভাবের সঙ্গে সামান্য পিন ফোটানোর ব্যথাও। সিঁড়ির

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিচ্ছিল হৃদয়। বুঝতে পারছে তার মুখ সাদা, গায়ে কলকল করে ঘাম নামছে।

ললিতা ডাইনিং হলের পর্দা সরিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখে থমকে দাঁড়ায়। দু—পা এগিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে?

হৃদয় কখনো এ মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারে না। মনে পাপ। চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব অভিমানের গলায় বলে, কিছু না!

এ অভিমানের দাম দেয় কে? হৃদয় হাঁফ ধরা বুক হাতে চেয়ে ঘরের দিকে এগোয়। বুঝতে পারে, শব্দগুলি আবছা হয়ে আসছে চোখে, বুকে ফুরিয়ে আসছে বাতাস। স্ট্রোক কী?

ভাবতেই মনটা অদ্ভুত ফুরফুরে হয়ে গেল আনন্দে। দীর্ঘকাল সামনের বারান্দায় বসে সে কি এই স্ট্রোকেরই অপেক্ষা করেনি? ইনস্টিংক্ট বলত— আসবে হে আসবে একদিন। সে এসে সব যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে।

কার কথা বলত তার ইনস্টিংক্ট তা তখন বুঝতে পারত না সে। আজ মনে হল, এই অদ্ভুত অসুখের কথাই বলত।

হৃদয় ভেবেছিল, খুব নাটকীয়ভাবে সে ঘরের দরজায় লাট খেয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না। হাত—পা কাঁপছিল থরথর করে, বুকে অসম্ভব ধড়ধড়ানি আর হুলের ব্যথা, গায়ে ফোয়ারার মতো ঘাম। তবু পড়ল না। চেতনা রয়েছে এখনও, খাড়া থাকতে পারছে। পর্দাটা সরিয়ে ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে ঢুকল সে।

দরজার মুখে ললিতা এসে পিছন থেকে দুটো কাঁধ ধরে বলে, শরীরটা তো আপনার ভালো নেই। বউদিকে ডাকব?

বিরক্তির গলায় হৃদয় বলে, না, কাউকে ডাকতে হবে না।

ললিতা বোকা নয়। সব জানে স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই মৃদু স্বরে বলে, আচ্ছা চলুন আমি বারান্দায় পৌঁছে দিই আপনাকে।

খুব যত্নে ইজিচেয়ারে তাকে স্থাপন করে ললিতা। টুল থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে সেটা সামনে রেখে পা দুটো টান করে দেয় টুলের উপর। মৃদুস্বরে বলে, চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন।

মুখে বড়ো ঘাম জমেছিল হৃদয়ের। ললিতা কিছু খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ির আঁচলে যত্নে ঘামটুকু মুছে দিল। বলল, পাখা আনছি। চোখ বুজে ঘুমোন তো।

আলো মুছে যাচ্ছিল, ক্লান্তিতে এক অতল খাদে গড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। তবু চোখ খুলে চেয়ে থাকে হৃদয়। হাঁ করে চেয়ে থাকে ললিতার দিকে। একটুও কাম বোধ করে না সে। সব ভুলে হঠাৎ 'মা' বলে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে।

ঝিনচাক মিউজিকের সঙ্গে কটু সুরের গান বেজে যাচ্ছে স্টিরিয়োতে, সঙ্গে বাচ্চা—বুড়োর গলায় হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ। কিন্তু এই সামনের বারান্দায় এই শরৎকালের উজ্জ্বল দুপুরে ভারি পুরোনো দিনের এক আলো এসে পড়ল। হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট বলল, মরবে না এ যাত্রায়।

রাজার গল্প

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাজা তাঁর মুকুট এবং সিংহাসন ত্যাগ করবেন। সেদিন প্রজাবর্গের সামনেই তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করবেন হলকর্ষণ করে। তাঁর রাজকীয় মহিমার অবসান হবে। রাজাহীন রাজ্যে তিনি প্রজাসাধারণের সঙ্গে সমভূমিতে নেমে আসবেন। সেদিন সেনাপতি, নগরকোটাল এবং পৌরপ্রধানেরাও নিয়োজিত হবেন তাঁদের পুরাতন বৃত্তিতে। পৈতৃক কামারশালায় ফিরে যাবেন সেনাপতি, নগরকোটাল যাবে, তাঁর বিপণিতে, চিকিৎসাবিদ্যায় ফিরে যাবেন পৌরপ্রধান। কারাগার বহুকাল বন্দিশূন্য, কারাধ্যক্ষ প্রত্যাবর্তন করবেন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রে। সমাজ রাষ্ট্রশূন্য হবে। শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সংক্রান্তির আগের রাত্রিতে রাজা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে পাঠালেন সেনাপতিকে। সহাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন, সেনাপতি, আপনার প্রয়োজন কি এ রাজ্যের পক্ষে সত্যিই ফুরিয়েছে?

সেনাপতি অনায়াসে উত্তর দিলেন, মহারাজ, এ রাজ্যের জন্য সেনাপতির প্রয়োজন নেই। আমরা আর রাজ্য জয় করি না, রাজ্য রক্ষারও কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্ররা একে একে সকলেই আমাদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আদর্শের দ্বারাই আমরা প্রকৃত রাজ্য জয় করেছি। তাঁরা মিত্র ভাবাপন্ন হয়েছেন, সমাজতন্ত্রের মূল্য উপলব্ধি করেছেন। শীঘ্রই মানুষের মন থেকে নিজরাজ্য এবং পররাজ্যের ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হবে। ফলে আক্রমণের কোনোই আশঙ্কা নেই। হ্যাঁ মহারাজ, আমার সেনাপতিত্বের প্রয়োজন এ রাজ্যের পক্ষে ফুরিয়েছে। আমি খুব আনন্দিত মনে কামারশালায় ফিরে যাব। সেই কামারশালায় আমি ছেলেবয়সে হাপর ঠেলতাম, আমার বাবা লোহা গলাতেন। সেই স্মৃতি আমাকে এখনও সুখবোধে আচ্ছন্ন করে। আমি এখন সেই কামারশালাকে উন্নত করেছি। নূতন যন্ত্রলাঙ্গলের নানা অংশ সেখানে তৈরি হবে— সেইভাবেই আমি নূতন করে কাজে লাগব।

তাঁকে বিদায় দিয়ে রাজা ডাকলেন নগরকোটালকে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কোটাল নির্দ্বিধায় বললেন, মহারাজ, বহুকাল হয় আমি কোটালত্ব ভুলে গেছি। রাজ্য সুশাসিত হয় তখনই, যখন প্রতিটি মানুষ তার নিজের বিবেক দ্বারা শাসিত হয়। এখন এ রাজ্যে একজন সালঙ্কারা সুন্দরী অষ্টাদশী কন্যা একাকিনী দিনে ও রাতে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তাঁর আভরণ ও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, গৃহস্থরা দ্বার উন্মোচিত রেখে শয়ন করতে পারেন, ঘরে কেউ প্রবেশ করবে না। মহারাজ, আমাকে আর এ রাজ্যের প্রয়োজন নেই। আমার ঠাকুরদার মুদিখানায় আমি ফিরে যাব। যদিও সে দোকান এখন রাষ্ট্রায়ত্ত। সব দোকানই তাই। তবে সেখানে আমার ছেলেবেলার স্মৃতি আছে। সেই দোকানটিকে এখনও আমি ভালোবাসি।

এরপর পৌরপ্রধান। প্রশ্নের উত্তরে বললেন, মানুষের কর্তব্যবোধ জেগেছে। এ নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সব নাগরিকই বহন করছেন। আমার আর প্রয়োজন কী? প্রধানের প্রয়োজন তখনই যখন অধস্তনরা নাবালকের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়। চিকিৎসক হিসেবে একসময়ে আমি দেখেছি যে রুগি আরোগ্য লাভ করলে তাকে চিকিৎসামুক্ত করতে হয়। এখন পৌরকার্যও চিকিৎসামুক্ত হোক। নাগরিকরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সংক্রামক ব্যাধি কিছু নেই, নদীর জল জীবাণুমুক্ত, মানুষের জন্মহার নিয়ন্ত্রিত, বৃদ্ধ ছাড়া আর কোনো বয়সেই কোনো মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয় না। মহারাজ, আমার পুরোনো বৃত্তি যদিও আর খুব একটা কাজে লাগবে না, তবু সেই বৃত্তিতেই আমাকে ফিরে যেতে দিন।

এলেন কারাধ্যক্ষ। বললেন, প্রজারা আর নিয়ম ভাঙে না। বড়ো অপরাধ দূরের কথা, তারা পরস্পরকে কথাচ্ছলে অপমানও করে না আর। প্রত্যেকেই বিনয়ী এবং ভদ্র, কর্তব্যে সজাগ। ফলে প্রধান এবং তাঁর সহকারী বিচারকেরা কেবল আইনতত্ত্ব গবেষণা করে সময় কাটান, প্রয়োগের সুযোগ ঘটে না। মানুষ নিজের

মহামূল্যবান জীবনকে উপলব্ধি করেছে, ফলে নরহত্যা ঘটে না। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই অনায়াসে পাচ্ছে, ফলে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ। পূর্ব অভিজ্ঞতাবলে প্রতিটি মানুষই জানে যে তার কর্তব্যে অবহেলা অন্যের সাতিশয় অসুবিধার কারণ ঘটাতে পারে, ফলে বিনা উৎকোচে সমস্ত কার্য যথাসময়ে সিদ্ধ হয়। ফলে কারাগার জনশূন্য। এত জনশূন্য যে প্রহরীরা সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বিষণ্ণ থাকে। মহারাজ, আপনি আমাকে বিদায় দিন, কারাভবনকে অন্য কোনো ভবনে রূপান্তরিত করুন, প্রহরীদেরও ভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োগ করুন।

এভাবে একে একে সব রাজ—কর্মচারীকেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা। বুঝতে পারলেন, বাস্তবিকই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি এবার একে একে কিছু কিছু প্রজাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। প্রথমেই এলেন রাজ্যের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি, যার বয়স একশো ষাট বছর, যিনি এখনও সরলকাণ্ড বিশিষ্ট গাছের মতো দাঁড়ান, যিনি নিয়োজিত আছেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে, বিশ্রাম জানেন না। রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নামমাত্র অভিবাদন করলেন রাজাকে, সমান আসনে বসলেন। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বিনীত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। এ রাজ্যের পূর্ব অবস্থাও জানেন। এখন বলুন এ রাজ্যে রাজা বা রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রয়োজন আছে কিনা।

বৃদ্ধ ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন, মহারাজ, আপনি নিজে এ রাজ্যের সাধারণ প্রজা ছিলেন। আপনার পিতা ছিলেন আমার প্রতিবেশী। এ রাজ্যের অরাজক অবস্থায় আপনি রাজদণ্ডের ভয় না রেখে দুর্বল ভীরু পীড়িত জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করে বিপুল এক মনুষ্যশক্তির জন্ম দিয়েছিলেন। শক্তিমাত্রই নিরপেক্ষ— শুভ বা অশুভ যেকোনো কাজেই তাকে লাগানো যায়। আপনি সেই শক্তিকে মঙ্গলাভিমুখী করেছিলেন। ফলে আমরা এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম হতে দেখেছি। এ রাজ্যে যখন প্রথম খাদ্য ও শস্য বিনামূল্য হয়ে গেল তখন এটাকে সত্য বলে মনে হয়নি। সেদিন আমি নগরের বিভিন্ন আহারগৃহে গিয়ে আহার করেছি। যদৃচ্ছা যা প্রাণে চায় তাই খেয়েছি এবং বেরোনোর সময় কেউ দাম চাইছে না দেখে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছি, নিজেকে চোরের মতো মনে হয়েছে। আমার মতো বহু মানুষই সেদিন এরকম করেছে, তারা দেখেছে সত্যিই সব বিনামূল্যে, তবু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই বিনামূল্যে খাদ্য পাওয়ার ব্যাপারটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না ভেবে কয়েকদিন আমি খুব খেয়েছিলাম! ফলে আমার পেট খারাপ হয়। আমার নাতি আমার এই কাণ্ড দেখে খুব হেসেছিল। তারপর মহারাজ, একসময়ে এই রাজ্যে পরিধেয় বস্ত্র, তৈজস, আসবাব সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে গেল। আমি বিস্তর দোকানে ঘুরে হাজার জিনিস নিয়ে এসে বাসা ভরতি করলাম। কিন্তু কেউ সেগুলি কেড়ে নিতে এল না। জিনিসগুলি আমারই রয়ে গেল। ক্রমে বুঝতে পারলাম আমি খামোখা এত জিনিস সংগ্রহ করেছি। আমরা আগে দুর্দিনের জন্য সুদিনের সঞ্চয় রাখতাম। কিন্তু এখন দুর্দিন নিঃশেষিত হয়েছে, ফলে এই সঞ্চয় ঘরকে অরণ্যে পর্যবসিত করছে। আমি তাই সব জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর আগের মতোই অপ্রচুর জিনিসের ঘরগৃহস্থালীতে সুখী বোধ করতে লাগলাম আবার আগের মতো। আমি মিতাহারী। মহারাজ, যখন সেদিন আমার কানে এল যে আপনি সিংহাসন ত্যাগ করে সাধারণ জীবন গ্রহণ করবেন সেদিনও আমার মনে শঙ্কা এসেছিল যে, রাজা না থাকলে আবার অরাজকতা দেখা দেবে হয়তো, আবার পাপ আসবে। কিন্তু মহারাজ, একটু ভেবে দেখলাম, ঠিক যেভাবে আপনি আমার পূর্বসিদ্ধান্তগুলিতে সাফল্যলাভ করেছেন, ঠিক সেভাবে এতেও আপনি সফল হবেন। না মহারাজ, সম্ভবত এ রাজ্যে আর রাজার প্রয়োজন নেই।

আর একজন প্রজা এসে পূর্ববৎ অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করলেন এবং বললেন, মহারাজ, আপনার শাসনবিধির তুলনা নেই। খাদ্য, পানীয়, বসতগৃহ, চিকিৎসা, যানবাহন ইত্যাদির জন্য আমাদের কোনো ব্যয় নেই। এ রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আমি যেকোনো যানে ভ্রমণ করতে পারি, যেকোনো চিকিৎসককে ডেকে চিকিৎসা করাতে পারি। তার জন্য আমাকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। মহারাজ, আমার পিতামহের দানশীলতার খ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যদি আপনার রাজ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ

করতেন তবে অবশ্যই খ্যাতিলোপের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতেন। কারণ, তাঁর দান গ্রহণ করার মতো একজনও দুঃখী বা অভাবী লোক এখানে নেই। মহারাজ, আমরা এখন আর মানুষের দয়াধর্মকে মহৎ গুণ বলে অভিহিত করি না, কারণ দয়াগ্রহণ মনুষ্যত্বের অবমাননাস্বরূপ। মহারাজ, আমরা আমাদের যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সজাগ। কাজেই রাজকীয় শাসনও দয়াধর্মের মতোই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী প্রজা এক মধ্যবয়স্ক চিত্রকর। তিনি বললেন, মহারাজ, আমার পিতা ছিলেন যোদ্ধা। তিনি একসময়ে এ রাজ্যের হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছেন। তিনি মহাবীর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গায়ে নানা অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওই চিহ্নগুলিকে তিনি পদকের মতো ভালোবাসতেন। এই যুদ্ধপ্রিয় লোকটি নরহত্যার অপ্রয়োজনীয়তাকে কখনো বুঝতে চাইতেন না। যুদ্ধ না থাকলে মানুষ হীন ও নির্বীর্য হয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। ছেলেবেলায় তাই আমি যুদ্ধবাজ মনোভাবাপন্ন ছিলাম। আমি প্রথমে ফড়িং, পাখি, তারপর কুকুর, বেড়াল, বাঁদর এইসব হত্যা করতে শুরু করি। বাবার মতো হওয়ার জন্য শীঘ্রই আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বালককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করব এরকম অভিলাষও আমার ছিল। ঠিক সেই সময়েই আমি আপনার বিপ্লবে অংশীদার হই যুদ্ধের আশায়। এবং কালক্রমে আপনার আদর্শকে বুঝতে পারি এবং আমার হৃদয় শান্ত হয়, যুদ্ধস্পৃহা জ্বরের মতো সেরে যায়। নিরীহ পশুপাখি হত্যা করে যে পাপ আমি করেছিলাম এখন তার স্খালন করি এই হাতে তাদেরই ছবি এঁকে। মহারাজ, এ সমাজব্যবস্থায় হয়তো যুদ্ধের এবং বীরত্বের প্রয়োজন ছিল, তখন তা ফুরিয়েছে মহারাজ, হয়তো সেরকম রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে ঈশ্বরও আমাদের কিংবদন্তিমাত্র।

সংক্রান্তির দিন সকালে রাজা স্নান করলেন, পুরোহিতকে বললেন, কেউ যখন রাজা হয় তখন তার অভিষেকের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রাজা যদি যেকেউ একজন হতে চায় তখন কি তার কোনো অভিষেক আছে?

পুরোহিত মাথা নাড়লেন। না, মহারাজ।

প্রাকারের পাশে সুসজ্জিত বেদীতে সাজানো সিংহাসন। রাজা সেখানে এসে বসলেন। হাতে তুলে নিলেন রাজদণ্ড, মাথায় পরলেন মুকুট। শেষবারের মতো। সামনের আম্রকাননে হাজার হাজার কৌতূহলী প্রজা সমবেত। একপাশে শূন্য একটু জমিতে চাষার পোশাক এবং বলদযুক্ত একখানা হাল রয়েছে। রাজা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসন, মুকুট ও দণ্ড ত্যাগ করে হলকর্ষণ করবেন। রাজাকে আজ বেশ আনন্দিত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

রাজা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় গতকাল রাত্রে যাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করে বললেন যে, তাঁর শাসনের প্রয়োজন সত্যিই ফুরিয়েছে। এবার সমাজ হবে রাষ্ট্রহীন। মনুষ্যত্বই হবে প্রকৃত শাসক।

রাজা মুকুট খুললেন, রাজপোশাক উন্মোচন করলেন, সিংহাসন ত্যাগ করে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পদক্ষেপে নামতে লাগলেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, মহারাজ, কাল রাত্রিতে আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল...

সবাই চকিত হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। সেনাপতি কোমরবন্ধ তলোয়ারসুদ্ধ খুলে রাখতে যাচ্ছিলেন। এই কথা শুনে কোমরবন্ধ আবার আঁটলেন। কারাধ্যক্ষ চকিত হয়ে হাতে ধরা ইস্তফাপত্রটি লুকিয়ে ফেললেন।

আর একটি কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল, মহারাজ, আজকের অনুষ্ঠানে সম্মুখবর্তী এই আসনটি পাওয়ার জন্য আমাকে বিশ মুদ্রা উৎকোচ দিতে হয়েছে...

আর একটি কণ্ঠও আর্তনাদ করল, মহারাজ, কিন্তু তার অভিযোগ গোলমালে, পালটা চিৎকারে শোনা গেল না। তিনি শুনলেন বহু কণ্ঠের আর্তনাদ উঠতে লাগল মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ...

মাঝসিঁড়িতে থেমে দাঁড়ালেন রাজা। বিস্মিত, ব্যথিত। ভ্রূকুটি করলেন। তারপর হতাশ ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের উদবেলিত জনসাধারণের দিকে।

তারপর ধীর ক্লান্ত পায়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগলেন পরিত্যক্ত সিংহাসনের দিকে।

খেলা

খুব ভোরে ইনডোর সুইমিং পুলের ধারে তিনি এসে দাঁড়ালেন, মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্য নয়, একটু চিন্তিত বোধ হয়, প্যান্টের দু—পকেটে হাত, কাঁধটা একটু উঁচুতে তোলা, দু—পা পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি করা, গায়ে সাদাকালো একটা ব্যানলনের গেঞ্জি নিথর জলে তাঁর ছায়া পড়েছে। একটু ঝুঁকলেই নিজের ছায়া তিনি দেখতে পাবেন। কিন্তু গত বিশ—বাইশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর হাজারও পত্রপত্রিকায়, পোস্টারে, চলচ্চত্রে বা টেলিভিশনে নিজের এত ছবি দেখছেন যে নিজের ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখতে তার আর ইচ্ছেই হয় না। সারাটা জীবন তাঁকে তাড়া করছে হাজারও ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, হাজারও সাক্ষাৎকার, লক্ষ লক্ষ লোকের জয়ধ্বনি, স্তুতি ও ভালোবাসা।

এ হোটেলটা কতদূর ভালো তা বলতে পারেন না। এই শহরটাই বা কীরকম তাও তাঁর জানা নেই। গতকাল গভীর রাতে তিনি এই শহরে নেমেছেন বিমান থেকে। বিমানবন্দরে অত রাতেও অগুন্তি লোক অপেক্ষা করছিল। গভীর জয়ধ্বনি সমুদ্র গর্জনের মতো রোল তুলল তিনি বিমান থেকে বেরোতে—না—বেরোতেই। তিনি মানুষ দেখে দেখে ক্লান্ত— একথা বলা যায় না। তবে মানুষ কি তাকে দেখে দেখে ক্লান্ত হয় না কখনো? জয়ধ্বনি তাঁর আজকাল একইরকম লাগে, যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় তাঁকে স্বাগত জানায়। তবু ধ্বনি কিন্তু প্রায় এক।

শহরটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেখার ইচ্ছেও ছিল না। লাক্সারি বাসে তাঁর টিমসহ যখন তাকে তোলা হয় তখনও সাংবাদিকরা কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করছে। তার দেহরক্ষী কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়নি বটে, তবু ওর মধ্যেই এক—আধজন যেন কী কৌশলে ঢুকে পড়েছিল। তাদেরই একজন পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে চুরি করে তাঁকে দুটো—চারটে কথা বলতে অনুরোধ করে। তাঁর বড়ো মুশকিল, তিনি কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। দেহরক্ষী তেড়ে এসেছিল, তিনি করতলের মুদ্রায় তাকে নিরস্ত করে ছদ্মবেশী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আর কী জানার থাকতে পারে লোকের? এ ভেবে তিনি আজকাল অবাক হন। তাঁর নিজের আত্মজীবনী ছাড়াও কয়েক ডজন বই লেখা হয়েছে তাঁর ওপর। প্রতিটি বই পৃথিবীর সব প্রধান ভাষায় লাখ লাখ বিকিয়েছে। তাঁর সব ক্রীড়াকৌশল দেখানো হয়েছে বারংবার সিনেমায়, টিভিতে, স্থিরচিত্রে। তবে মানুষ আর কী জানতে চায়। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সের এ জীবনে তাঁর আর কোনো গুপ্ত সংবাদ থাকবে যা লোকে জানে না? তিনি যখন যা বলেন তা তৎক্ষণাৎ টেপ করা হয়, নয়তো তুলে নেওয়া হয় শর্টহ্যান্ডে, তিনি যখন যা বলেন তাই প্রচারিত হয়ে যায় সাধারণ্যে।

আজ এই খুব ভোরে তিনি কিছু অনিশ্চিত একা। একা হওয়ার অভ্যাস তাঁর নেই—ই প্রায়। অবশ্য একা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা তিনি কখনোই হতে পারেন না। তাঁর দেহরক্ষী ছায়ার মতো পিছু নেয়। তার দু—পকেটে দুটো রিভলবার, মজবুত ও সতর্ক ওই প্রহরীটি তার কর্তব্য পালন করার জন্য কারও অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। তাঁরও নয়। কারণ এই রক্ষীকে নিয়োগ করেছে একটি বিমা কোম্পানি— যে কোম্পানিতে তিনি কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিমাবদ্ধ রয়েছেন।

কোনোদিনই ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে নিজেকে তিনি কখনো মুক্ত মানুষ বলে অনুভব করতে পারেন না। তিনি যা বলেন, যা করেন তা সবসময়েই গোচরে বা অগোচরে মানুষ লক্ষ করে। তাই যতক্ষণ জেগে থাকেন তিনি ততক্ষণ তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজের মতো থাকা তাঁর আর হয়ে ওঠে না।

আজ এই ভোরে ইনডোর সুইমিং পুলের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর জীবনের নানা বেড়াজালের কথা ভাবছিলেন। কিংবা তাও নয়। তাঁর হয়তো ইচ্ছে করছিল, একা একটু রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে। একা ঘুরে ঘুরে এ শহরটা একটু দেখে আসতে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। কাল রাত থেকে হোটেলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ চাপ বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। ওরা একবার তাকে দেখতে চায়। বেরোলেই ওই অতি উৎসাহীরা ঘিরে ধরবে, ছোঁবে, ছাপবে, তারপর আদরের উন্মাদনায় শ্বাস রোধ করে ফেলবে তাঁকে।

তিনি জানেন, তার কোনো শত্রু নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তাই যে কতবড়ো শত্রু তা তিনি আজ বুঝে গেছেন।

কাল রাতে তার ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমহীনতায় কোনো রাগ নেই, উদবেগ নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। তবু তার ঘুম সহজে আসে না।

নিঃশব্দে স্ত্রীর ঘুম না ভাঙিয়ে তিনি উঠেছেন, কফি খেয়েছেন একা, বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। তিনি যেদিকে আছেন হোটেলের সেদিকটা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কোনো অনভিপ্রেত লোকজন আসতে পারে না এদিকে। নিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিন্ত।

তত ভোরে সুইমিং পুলের ধারে কেউই নেই। কিন্তু কে জানে, কোনো গুপ্ত জানালা থেকে, কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে, কোনো দূর অলিন্দ বা কক্ষ থেকে এই বিশাল হোটেলের কেউ—না—কেউ তাকে দূরবিন দিয়ে দেখছে না, বা টেলি লেনসে ফোটো তুলছে না? আসলে ওই সন্দেহটাই নিশ্চিত সত্য। কেউ—না—কেউ সবসময়েই তাকে দেখছে। এ পৃথিবীর কোটি কোটি লোক তার অচেনা, কিন্তু তাকে চেনে পৃথিবীর প্রায় সবাই। এইটেই সবচেয়ে জটিল ঘটনা।

সুইমিং পুলটা দু—বার প্রদক্ষিণ করলেন তিনি। তারপর ভোরের প্রথম জাগ্রত মানুষটির দেখা মিলল।

লোকটা লম্বাটে, এশীয়, ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় একটা পাইপ কামড়ে পকেটে দেশলাই বা লাইটার খুঁজতে খুঁজতে উদভ্রান্ত অন্যমনস্কতায় চত্বরে বোধহয় এসেছিল। তার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেই অবহেলা ভরে চোখ সরিয়ে নিল। লাইটার বের করে পাইপ ধরিয়ে আবার একবার চাইল। তারপরই কেমন হতভম্ব আর ফ্রিজ হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

ধূমপান তিনি পছন্দ করেন না। নাকটা একটু কুঁচকে নিলেন। আর লোকটার ওই হতভম্ব ভাবটা তিনি একটুও উপভোগ করলেন না। বরং ভারি সংকোচ হল তাঁর। অপ্রত্যাশিত তাঁর দেখা পেলে লোকে কেন ভূত দেখে?

যে সৌভাগ্য লোকটা সারাজীবনও কল্পনা করতে পারেনি তিনি আজ ভোরে লোকটার জীবনে সেই সৌভাগ্যের কারণ ঘটালেন। একটু হেসে তিনি বললেন, গুড মর্নিং।

লোকটা তোতলাতে লাগল। সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তের মতো বলতে লাগল, মাই গড! ইউ... ইউ আর... ওঃ, গুড মর্নিং... গুড মর্নিং! গুড মর্নিং...!

তিনি স্মিত হাস্যে লোকটাকে আনন্দের ঝরনাধারায় ধুইয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন।

লোকটা জানে যে তিনি ধূমপান পছন্দ করেন না। পৃথিবীর সব মানুষই তার পছন্দ—অপছন্দের কথা জেনে গেছে। পাইপ নিভিয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলল, আপনার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছিল একথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না! আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু স্মারক দেবেন না? ছোটো স্বাক্ষর একটি?

তিনি মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাস্যে বললেন, এই সাক্ষাৎকার কি আপনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা।

কেন?

আমি এক সম্রাটের সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি ক্রীড়াজগতে গত বিশ বছর তাঁর অপ্রাকৃত জাদুবিদ্যা দেখিয়েছেন, যাঁর মতো কেউ কখনো জন্মায়নি, আগামী একশো বছরে কেউ জন্মাবেও না।

তিনি বললেন, মানুষের সাধ্য যা নয় আমি তা কী করে করতে পারি। আমি যা করেছি তা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নিশ্চয়ই। আর জাদুবিদ্যা আমি কিছুই জানি না, সারাজীবন আমাকে কঠোর অনুশীলন করতে হয়েছে।

এসবই আমরা জানি। কিন্তু তবু আপনি অলীকতার সীমারেখা ছুঁয়েছেন। বিশ্বকাপের এক ফাইন্যালে দেখেছি আপনার ভৌতিক ড্রিবলিং। সে যে না দেখেছে...

খুবই ক্লান্ত লাগে তাঁর। হয়তো এরা ঠিকই বলে! তাঁর মধ্যে কিছু একটা আছে। ধাঁধার মতো, রহস্যের মতো, অলৌকিকত্বের মতো। তিনি নিজে কোনোদিনই তা টের পাননি। কিন্তু অন্যেরা বলে যেসব কৌশলে আর পাঁচজন বড়ো খেলোয়াড় খেলে তাঁর নিজের কৌশল তার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়তো তিনি বেশি ত্রুটিহীন। আর সেটাই হাজারও লোক মিরাকল বলে মনে করে। তিনি বললেন, আমি যা করি তা সবই চেষ্টার দ্বারা।

বলতে বলতে তিনি চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলেন, তাঁর দেহরক্ষী অধৈর্য হয়ে পড়ছে, এগিয়ে আসতে চাইছে। উটকো এই লোকটা যদি কোনো বেতাল নড়াচড়া করে তবে তাঁর দেহরক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তিনি তাই তাড়াতাড়ি বললেন, আপনি অটোগ্রাফ চাইছিলেন না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে লোকটা একটা দশ টাকার নোট বের করে পকেট থেকে।

একটা ডটপেনও।

তিনি দশ টাকার নোটটা নিয়ে পকেটে ভরে নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগলেন। এরকম মজা তিনি প্রায়ই করেন। লোকটা চোরের মতো পিছু পিছু আসছে আর মাঝে মাঝে হেঁ হেঁ শব্দ করছে।

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, টাকাটার জন্য ধন্যবাদ। এটা দিয়ে আমার বালবাচ্চাদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাব।

লোকটা হাত কচলে বলে, সম্রাট, আপনাকে আমার কিছুই দেওয়ার থাকতে পারে না। আমি কী দেব আপনাকে? দয়া করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

তিনি হাসলেন। তোলা হাঁটুতে নোটটা রেখে ডটপেন দিয়ে বারো অক্ষরের নাম সই করে দিলেন অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

তারপর সামান্য ক্লান্তি ও গরম বোধ করে ফিরে এলেন। ঘরে স্ত্রী এমন চমৎকার সাজে সেজেছেন। অপেক্ষা করছেন প্রাতঃরাশের জন্য। তিনি স্ত্রীরএকটি চুমু খেলেন। স্ত্রী উজ্জ্বল মুখ করে তাকালেন তাঁর দিকে। সেই চোখের দৃষ্টিতে সুগভীর তৃপ্তি ও অহংকার তাঁর স্বামীকে নিয়ে।

স্ত্রী বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত খেলার ধকল এবার সত্যিই শেষ হচ্ছে।

তিনি বিছানায় শুয়ে থেকে বললেন, হ্যাঁ। আজ আমার শেষ খেলার আগের খেলাটি।

তুমি কি নামবে মাঠে?

নিশ্চয়ই!

খুব সাবধান। এদের মাঠ ভালো নয় শুনেছি।

তিনি হাসলেন। বললেন, আমিও শুনেছি। তুমি কিন্তু অকারণে দুশ্চিন্তা কোরো না। এটা আর একটা খেলামাত্র। খেলাই, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। যুদ্ধে সৈন্যরা এর চেয়ে অনেক শক্ত কাজ করে।

প্রাতঃরাশের পর তিনি ঘুমোলেন।

বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই দরজায় টোকার শব্দ। বিশিষ্ট লোকরা আসছেন। ফোনে খবর নিচ্ছেন। অন্যসব খেলোয়াড় দেখা করতে চাইছে। আসছে সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, টিভি বা রেডিয়োর লোক, আসছে ম্যাসাজ করতে মেসেউয়ার।

তাঁর স্ত্রী বহুক্ষণ এই ভিড় ঠেকিয়ে রাখলেন, আর ভিড় ঠেকাল তাঁর মজবুত দেহরক্ষী। তবু একসময়ে তাঁকে উঠতে হয়। হাসতে হয়। কথা বলতে হয়।

দুপুর গড়াতে—না—গড়াতে খেলা—পাগল এক শহর ভেঙে পড়ে স্টেডিয়ামে। কী গভীর আনন্দের চিৎকার ভরে ওঠে পরিমণ্ডল।

তিনি মাঠে নামেন এগারো জনের সঙ্গে। সবাই অভ্যস্ত তাঁর। সেই জয়ধ্বনি, ক্যামেরার ভিড়।

তারপর সব সরে যায়। হঠাৎ দেখেন, তিনি স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন। দাবার গুটির মতো সাজানো বাইশজন খেলোয়াড় দু—দিকে। মাঝখানে সেই ফুটবল। পৃথিবীর মতো গোল। এই বল তাঁকে সব দিয়েছে বা হয়তো সবটাই পাওনা ছিল না।

শরীরে এতটুকু ক্লান্তি বা অসুস্থতা ছিল না। মাঠ যথেষ্ট ভালো না হলেও কিছুটা খেলা যায়। চারদিকের আকুল চোখগুলি তাঁর দিকেই চেয়ে আছে তিনি জানেন। সমস্ত ক্যামেরার লেন্স তারই দিকে নিবদ্ধ তিনি জানেন। সমস্ত ভাষ্যকার—কণ্ঠ বারংবার তারই নাম উচ্চারণ করছে— তিনি জানেন। তার সমস্ত চলাফেরা, ছোটা, বল ধরা বা মারা এ সবগুলিই বারংবার দেখানো হবে, বর্ণিত হবে, ব্যাখ্যা করা হবে। মাঠের বাইশজনের মধ্যে বাদবাকি একুশজনের কোনো গুরুত্বই নেই এই হাজার লক্ষ কোটি মানুষের কাছে।

এত দিয়েছি তোমাদের— তবু কেন চাও? এবার চোখ ফিরিয়ে নাও আমার দিক থেকে। ফিরিয়ে নাও। আমি যে কখনো নিজমনে থাকতে পারি না।

—এই কথা তিনি মনে মনে বললেন।

চেষ্টাহীন রইলেন সারাক্ষণ। ছুটলেন না, উদ্যোগ করলেন না, বল কেউ কেড়ে নিতে এলে সহজেই ছেড়ে দিলেন। জানেন, তিনি চেষ্টা করলে কিছুতেই ওরা কেড়ে নিতে পারবে না। জানেন, তিনি যদি বল পায়ে ছোটেন তবে এরা বৃক্ষরাজির মতো স্থির হয়ে যাবে। তিনি অনায়াসে গোলরক্ষককে ঠকিয়ে বল পাঠাতে পারেন জালে। কিন্তু কেন তা করবেন তিনি। আরও হাজার লক্ষ কোটি চোখকে নিজের উপর টেনে আনতে? আরও অনির্জন, একাকিত্বহীনতাকে বরণ করবেন? ভক্তের মৃগয়া কি একসময়ে শেষ করা উচিত নয়? ওরা ভাবুক তিনি জাদুকর নন, স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষমাত্র।

খেলা শেষ হল। ড্র। তিনি বুঝলেন, তার দল ম্লানতার ছায়ায় ফিরে যাচ্ছে ড্রেসিং রুমে। সবাই বলছে— উনি আজ খেলতে পারেননি।

তিনি হাসলেন আপনমনে। আজ এরকম আনন্দ হয় তার। আনন্দটা নিখাদ নয়। একটু বিষাদের বিষ তাতে মিশে থাকে।

পরদিন রাতে সুন্দর স্বদেশের দিকে ধাবমান বিমানে বসে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের মাঝখানে অকারণে জেগে উঠলেন একবার। কেন জাগলেন তা বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু জাগলেন। মনে হল, খুবই ক্ষীণ একটা বাঁশির আওয়াজ যেন ঘুমঘোরে শুনেছেন তিনি। কোনো নিয়মভঙ্গের জন্য রেফারি যেমন বাঁশি বাজায়।

তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে চারদিকে চাইলেন। সবাই ঘুমে। বাইরে নীল রাত্রির আকাশ তীর বেগে উঠে যাচ্ছে।

নিয়মভঙ্গ ঘটল নাকি কিছু? কখন? কোথায়? তিনি ভাবলেন, খুঁজলেন মনে মনে। তাঁর সারা মুখে, শরীরে অজস্র শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের বন্ধুরতা। ডান গালে একটি প্রিয় ক্ষতচিহ্নে তিনি প্রায়ই আঙুল বুলিয়ে নন। এখনও নিলেন, কিছু মনে পড়ল না।

আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলেন তিনি। হেলানো সিটে মাথা এলিয়ে চোখ বুজলেন। খুব স্বস্তি পেলেন না। তার ভিতর থেকে কে যেন বলছে— ঠিকই শুনেছিলে। বাঁশি বেজেছিল।

এবার তিনি মৃদু হাসলেন। মাথা নাড়লেন আপন মনে। জানেন, তিনি জানেন।

নিয়মভঙ্গের জন্য কোথাও—না—কোথাও কে যেন বাঁশি বাজিয়েছে। ঠিক কখন নিয়মভঙ্গ ঘটেছে তা তিনি জানেন না। ফাউল? না হ্যান্ড বল? অফসাইড নয় তো?

না এসব নয়। তিনি তা জানেন। খেলার মাঠটা আর ছোটো থাকছে না। বড্ড ছড়িয়ে পড়ছে এবার। বিশাল তার পরিধি। সারা পৃথিবীময় আকাশময়, খেলাও এবার কত বিচিত্র! কত নিয়ম, কত অনিয়ম! অলীক রেফারি তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, সতর্ক করছে।

প্রসন্ন মনে তিনি মাথা নাড়লেন।

মুখ

খবরের কাগজের উপর দিয়ে একটা ভারি খুদে ছাইরঙা পোকা গুড়গুড় করে হেঁটে যাচ্ছে। ছাপা অক্ষরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে—মাঝে, দেখা যাচ্ছে না। ফের দেখা যাচ্ছে— ওই যে চলেছে, কোনাকুনি। কোথায় যাচ্ছে তা কি নিজেই জানে? তবু যাচ্ছে। এত খুদে যে, খুব ঠাহর করে দেখতে হয়। শচীন দেখছিল। খুব মন দিয়েই দেখছিল। ওটার হাঁটারও যেমন মানে হয় না, বেঁচে থাকারও তেমনি মানে হয় না। কোন ফল হবে ওটাতে দিয়ে? পোকা বলে কথা, মা—বাপ—ভাই—বোন নেই, ফ্যামিলি লাইফ নেই, শুধু ক—টা দিন উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে, খামোখা বেঁচে থেকে, হয় অপঘাতে নয়তো এমনিতেই মরে যাবে।

অধিকারী বলছে, চৈতলপাড়া হল গে তাঁবার টাট। এই চোত—বোশেকে সেখানে তপ্ত বালির উপর একখানা আলু ফেলে রাখো, বিকেলে দেখবে দিব্যি পোড়া—পোড়া ভাব হয়েছে। তেল—নুন মেখে দিব্যি খেয়ে নিতে পারবে। চৈতলপাড়া নামটাও তো মনে হয় ওই চোত মাস থেকেই হল। পুকুর—টুকুর সব শুকিয়ে ঝামা। মাঠ দেখগে যাও, ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে আছে। এক বালতি জল ফেললে চোঁ শব্দ করে টেনে নেয়।

শচীন অনেকক্ষণ ধরে চৈতলপুরের বৃত্তান্ত শুনছে। এবার বলল, ওটা কী পোকা বলো তো অধিকারীদাদা!

কোন পোকাটা?

ওই যে, ঢক্কানিনাদের ঢক্কার ওপর বসে আছে।

অধিকারী ঝুঁকে একটু দেখার চেষ্টা করে বলল, তা ভগবানের রাজ্যে কতরকম আছে। সব কি আর চিনি রে ভাই! তা হবে কোনো পোকা। তার কাণ্ডই আলাদা। বলছি চৈতলপাড়ার কথা, আর তুই পোকা নিয়ে পড়ে আছিস।

ভাবছি কি জানো, এ পোকাটা বেঁচে আছে কীজন্য বলো তো।

বললুম তো, ভগবানের রাজ্যে কত জীবই তো বেঁচে আছে।

আচ্ছা ওর তো কোনো নামও নেই। ধরো যদু, মধু, শচীন বা অধিকারী এসব বলে তো ডাকেও না কেউ ওকে।

পোকার আবার নাম!

সেইটেই তো বলছি। নাম নেই, ঠিকানা নেই, বাপ—মায়ের ঠিক নেই, কোথায় যাচ্ছে, কী করছে তাও বুঝবার মতো মগজ নেই, বেঁচে যে আছে তাও তো বুঝি সবসময়ে টের পায় না। ঠিক তো। তবে বেঁচে আছেই বা কেন?

রোদ আসছে রে, ওধারটায় একটু চেপে বোস। চোতের রোদে বড্ড ঝাঁঝ। তা কাগজে লিখেছে কী করে বাপ, একটু বলবি?

এ তো বাসি খবরের কাগজ অধিকারীদা। বোচনের বাপ রোজ নিয়ে আসে কলকাতা থেকে। আমি সকালে চেয়ে আনি। লিখেছে মেলা কথা, সব তুমি বুঝবে না।

অধিকারী বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, বুঝে কাজও নেই। দুনিয়ায় কত কী হয়ে যাচ্ছে রোজ। সেদিন শুনলুম, কোথায় একটা ক্ষেপে গিয়ে সাতটা লোককে মেরেছে। তা এরকম কত কী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পৈলেনের দিকটায় হাতিটাতি নেই।

কথাটার কোনো মানে হয় না। পৈলেনে হাতি নেই, এটা কী কোনো খবর হল। অধিকারীর তোম্বা মুখটার দিকে চেয়ে শচীন হেসে ফেলল। বলল তার চেয়ে চৈতলপাড়ার কথা যা হচ্ছিল সেটাই চালিয়ে যাও

অধিকারীদা।
সেটাই তো বলছিলুম রে। কথার মধ্যে পোকা পড়ল। বলছিলুম যে এই পৈলেনের মতো সরেস জায়গা নয়। পৈলেনেও শুখো বছর যায় বটে, কিন্তু চৈতলপাড়ার দিকটা হল একেবারে পাঁপড়ভাজা। গাছের পাতাটা অবধি শুকিয়ে মুচমুচ করছে।
লোকে সেখানেও তো বাস করছে।
ধুঁকতে ধুঁকতে। বছর চারেক আগে শুখোর সময়ে বিন্দির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে কী দুর্গতি হল বলার নয়। জলশৌচ অবধি করতে পারি না। তিন দিন চান না করে গায়ে পোকা পড়ার জোগাড়।
তবু তো লোকে বাস করছে।
তা কী করবে বলো। বাপ—পিতেমোর ভিটে ছেড়ে যাবে কোথা?
তুমি তাহলে গঙ্গারামপুর ছাড়লে কেন বলো। সেও তো তোমার বাপ—পিতেমোর জায়গা।
সে অন্য বৃত্তান্ত। আমি আর ছাড়লুম! আমাকে ছাড়ানো হল! সবাই সেকথা জানে। জ্ঞাতিরা যা উস্তম—কুস্তম করলে আমাকে। তা বাপু আমার কোনো গিঁট নেই। বাপ—পিতেমোর জায়গা বলে গঙ্গারামপুরের জন্য হেঁদিয়ে মরব আমি তেমন ঘরপোষা গেরস্ত নই। এই যে কাঁধে গামছাখানা দেখছিস এখানা যেখানে—সেখানে পেতে শুয়ে পড়ি, আর সে—ই জায়গাই আমার গঙ্গারামপুর।
এই গোটা দুনিয়াটাই।
বুঝলুম গো অধিকারীদাদা।
আমি হলুম গে তোর ওই পোকাটার মতো। লোক না পোক।
বড্ড চটেছো গো অধিকারীদা।
কথাটা শেষ করতে দিবি, নাকি! আসল কথাটাই তো বলতে দিলি না।
বলো। শুনছি।
তা সেই চৈতলপাড়ায় সেই চোত মাসেই এক সাধু এসে পাঁচ—পাঁচটা ধুনি চারদিকে জ্বেলে তপস্যায় বসে গেল। চৈতলপাড়ার ওই সাঙ্ঘাতিক মোষ—খ্যাপা গরমে। আমাদের মতো লোক হলে শুকিয়ে চামচিকে হয়ে টেঁসে যেত। সাধু বলে কথা। সাত দিনে গা ঝলসে কালো হয়ে গেল। শরীর শুকিয়ে হত্তুকি। তবু গা—ঝাড়া দিয়ে উঠল। সে কী যজ্ঞি বাবা জানি না, তবে যজ্ঞির পর নাকি বামুন খাওয়ানোর নিয়ম। তা সাধু গিয়ে বামুনপাড়ায় হাতজোড় করে জনে জনে নেমন্তন্ন করল। তা চৈতলপাড়ার বামুনরাও ট্যাটন। তারা পষ্টাপষ্টি বলে দিলে, সাধুর জাতধর্ম নেই, আমরা সাধুর নেমন্তন্নে যাব না। তখন সাধু রেগেমেগে করলে কী জানিস। গাছে গাছে যত হনুমান ছিল সবাইকে নেমন্তন্ন করে এল। তারপর সে কী কাণ্ড! পরদিন সাধু নিজের হাতে রান্না করছে আর দলে দলে হনুমান মেয়েমদ্দা ছানাপোনা সব হাজির। একেবারে পঙক্তি ভোজনের কায়দায় বসে গেল সব সারসার। তৃপ্তি করে খেল। ভোজনদক্ষিণাও নিল। চৈতলপাড়ার লোক কাণ্ড দেখে হাঁ। সেই থেকে চোতমাসে সেখানে হনুমান—মেলা হয়। কালো সাধুর মেলাও বলে লোকে। টানা একশো বছর ধরে হয়ে আসছে।
পোকাটা কাগজের একেবারে কানায় গিয়ে ঝুঁকে তলাটা একটু নিরিখ করল। তারপর আবার উলটোবাগে ফিরে আসছে। কী করবে, কোথায় যাবে কিছু বুঝতে পারছে না আহাম্মকটা।
আচ্ছা, পোকারা কী খায় বলো তো অধিকারীদা।
তোর মাথা থেকে পোকাটা যাচ্ছে না দেখছি।
ভাবছি, এইটুকুন তো পোকা, এর পেটটাই বা কতটুকু! খায় কী।
ওসব ভগবানের লীলা রে ভাই। দুনিয়াতে হাতির যেমন বন্দোবস্ত আছে, তেমনি পোকার জন্যও আছে।
সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু ভগবানের লীলারও তো মানে হবে নাকি! তুমিই বলো এই পোকাটাকে দিয়ে ভগবানের কোন কাজটা হচ্ছে। সব কাজেরই একটা মানে থাকবে তো। নইলে বলতে হয়, আমার ভগবানের

মাথায় বেশ একটু ছিট আছে বাপু।

তা মন্দ বলিসনি। আমারও মাঝে—মাঝে মনে হয় লোকটা একটু ছিটিয়ালই বটে। নইলে দেখিস না কোথাও গন্ধমাদন, কোথাও কেঁচোর ঢিবি। মদন তফাদারকে দেখ, টাকার পাহাড়ে চড়ে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছে, আর আমাদের দেখ অবস্থা কেরাসিন।

তুমি বড্ড মোটা দাগের লোক অধিকারীদা। কোথায় একটা গুরুতর কথা বললুম, তাই নিয়ে পাঁচটা মিনিট ঝিম ধরে বসে ভাববে। তা নয়, কোথায় কার টাকা আছে, কার নেই তাই নিয়ে পড়লে।

ও বাবা, তোর পোকামাকড় নিয়ে বসে ভাবতে হবে নাকি? আমার কি আর খেয়ে—দেয়ে কাজ নেই! পোকামাকড় নিয়ে তুই ভাব গে যা। হুঃ মোটা দাগের লোক!

শচীন হেসে ফেলল, তোমার চৈতলপাড়ার বৃত্তান্ত শেষ হয়েছে?

বৃত্তান্ত আবার কী। কথাটা উঠল তাই বললুম। লোকে তো পাঁচটা জিনিস নিয়ে কথা বলবে, নাকি! চুপ করে থেকে কী শেষে দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে? আর চৈতলপাড়ার কথাটা এমন খারাপ বা কী বললুম।

তুমি কেন মোটা দাগের লোক তা জানো? গুহ্য কথাটা বুঝতে পারো না বলে।

এই যে পোকাটা খামোখা বেঁচে আছে, খামোখা খবরের কাগজের ওপর হেঁটে হেঁটে সময় নষ্ট করছে, আমরাও ওর চেয়ে বেশি কিছু করছি না।

কথাটা তো আমিই আগে বললুম রে। লোক না পোক। তুই নতুন কথাটা আর কী বললি? এখন কাজের কথায় আয় দিকি বাপ। চৈতলপাড়া যাচ্ছিস কোন মতলবে?

মতলব একখানা আছে শচীনের। কিন্তু সে কথা ভাঙে কী করে? অধিকারী হল হাটের খোলা হাঁড়ি। তার পেটের কথা মুখে ভুড়ভুড়ি না কাটলে পেট ফাঁপে, বায়ু হয়। কথাটা চেপে শচীন বলল, মাঝে—মাঝে জায়গা বদলানো ভালো। তোমার সরেস পৈলেনে আমার তো তেমন সুবিধে হল না।

লটারির কারবারটা তুলে দিয়েই তো ভুলটা করলি। দু—পাঁচ টাকা তো আসছিল।

কচু। কত টিকিট বেচলুম। একটা লোকও পাঁচটা টাকা অবধি প্রাইজ পেল না। আজকাল লোকে ওসব ধরে ফেলেছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকা— এটা কথা হল? খরচের কথাটাও ভাবো।

শুনেছি লটারিওয়ালারা মাঝে—মাঝে নিজেরাই না—বিকোনো টিকিটের প্রাইজ পেয়ে যায়।

সেসব কপাল আলাদা, আমাদের কপাল একেবারে সিলমোহর আঁটা। আর লটারিতে কে না ঢুকছে বলো। সনাতন, হারু, পতিতপাবন, রাখোহরি, শুধু পৈলেনেরই দশ—পনেরোজন হবে। তার মধ্যে সনাতনের মাইকওয়ালা গাড়ি আছে, হারুর গাড়ি নেই কিন্তু মাইকওয়ালা রিকশা দাবড়ায়। গদাই মণ্ডল ধারবাকিতে টিকিট দিতে চাইছিলও না ইদানীং।

কিন্তু এই পৈলেন হল সোনার দেশ, এই তোকে বলে রাখলুম। এমন সরেস জায়গাটা ছেড়ে যাবি?

কী আছে, তোমার পৈলেনে? একটু ভেবে দেখ।

অত কথা কী, ওই পুলিনের শশার মাচানটাই দেখ চেয়ে। অতবড়ো নধর শশা ফলে কোথাও? ঘাসটা দেখ, পাতাটা দেখ, কেমন তেজালো সব ফলন। এ মাটির নীচে মা লক্ষ্মী আছেন রে। দুঃখকষ্ট যা হচ্ছে হতে দে, দেখবি চেপে বসে থাকলে বরাত একদিন ফিরবেই।

তোমার যতসব তাজ্জব কথা। তুমি পৈলেনে মাথা মুড়িয়েছ বলে কী আমাকেও মোড়াতে হবে নাকি? তুমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকো এখানে।

অধিকারী এ কথার টপ করে জবাব দিল না। কিন্তু মিটিমিটি চেয়ে তার স্যাঙাতটিকে জরিপ করার চেষ্টা করলে অনেকক্ষণ। তারপর গলার স্বরটা থেকে আবেগ বাদ দিয়ে একটু আহ্লাদ খেলিয়ে বলল, গুহ্য কথাটি ফাঁস করবি না তো বাপ! জানি। চৈতলপাড়ায় একখানা দাঁও তুই মেরেছিস তাহলে!

অধিকারী নানারকম গলা করতে পারে। পৈলেন—কুমড়োহাটি সরস্বতী অপেরার সে বাঁধা অ্যাকটর। বড়ো বড়ো পার্টও করে। তার দুঃখের কথা, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। পৈলেন—কুমড়োহাটির কর্ণার্জুন বা কংকাবতী বা সিরাজদ্দৌলা এখন আর বায়না পায় না। গাঁয়ের লোক কলকাতার অপেরা ধরে ধরে এনে যাত্রা দেখছে। টিকিট নিয়ে মারপিট। অধিকারী কলকাতার দলে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল, যেমন সবাই করে। সুবিধে করতে পারেনি। সরস্বতী অপেরার এখন যা—দশা।

শচীন পোকাটাকে ফের দেখছে। আচ্ছা ও শালাও কি দেখছে শচীনকে? ব্যাটা এখন কাগজের মাঝ—বরাবর। শচীন কাগজটাকে একটু ভাঁজ করে নৌকোর মতো করে ধরে রেখে পোকাটাকে দেখছে।

ইঃ বাবা, কতটুকু রে। অ্যাঁ! কতটুকু!

কথাটা শুনেছ অধিকারীদা, এই যে পোকাটা দেখছ এর চেয়েও হাজার ভাগ ছোটো সব পোকা নাকি আছে। তারাই শরীরে ঢুকে নানা রোগ বাধায়।

অধিকারী একটা শ্বাস ফেলে বলল, জানি। আজকাল সবাই বৃত্তান্ত জানে কিনা। চাঁদে মানুষ যায়, অ্যাটম বোমা হয়, কত কী হচ্ছে দুনিয়ায়। হচ্ছে হোক, তোর আমার কী?

তা বটে। মানুষ চাঁদেই যাক আর অ্যাটম বোমাই ফাটাক, তোমার পৈলেনে শশার ফলনটা ভালো হলেই হল। কী বলো!

তাই বললুম বুঝি! কপালটাই খারাপ রে ভাই, আমার কথা সবাই আজকাল উলটো করে ধরে। বেলা হল, উঠি। তা কবে যাচ্ছিস?

যাব একদিন, টেরও পাবে না।

টের পাব না মানে?

শচীন মিটিমিটি হেসে বলে, টেরটা পাবে কী করে বলো। সামন্তমশাই কাশী গেলেন, সঙ্গে এক গোরুর গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র, হাঁড়ি—কুড়ি—বালতি অবধি। আমার তো আর তৈজসপত্র নেই। একখানা টিনের বাক্স বগলে করে বেরিয়ে পড়ব, পিছনে থাকবে এই ভাঙা ঘরখানা শুধু। সাপখোপের আস্তানা হয়ে থাকবে। কেউ টের পাবে না গো অধিকারীদাদা।

অধিকারী উঠে পড়ল। পৈলেনের একটা লোক কমে যাচ্ছে, এটা তার কাছে যত গুরুতর সংবাদ, অন্য কারও কাছে ততটা নয়। তবু খবরটা পাঁচকান না করলে তার পেটটা বড়ো ফেঁপে উঠবে। বড়ো আইঢাই হবে। তাকে সবাই পেটপাতলা লোক ভাবে বটে, কিন্তু আর অসুবিধের কথাটা কেউ ভাবে না।

শচীন বাইরের রোদটার দিকে খানিক চেয়ে রইল। বড্ড ফর্সা রোদ, সাবানে কাচা, ধপধপে, মুচমুচে। টিনের চালে শালিক লাফাচ্ছে। কুচকুচ শব্দ। শুকনো গলায় একটা কাক তখন থেকে নিমগাছে বসে নাগাড়ে ডাকছে। পাঁশুটে আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই। খয়েরপুরের বাস ওই ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। কিছু দেখা আর কিছু শোনা নিয়েই তো দুনিয়াখানা নাকি? অনন্ত শচীন তো তাই জানে বরাবর। কিছু দেখ, কিছু শোনো। এর বাইরে আর কী আছে? আছে আর একখানা জিনিস। সে হল ভাবনা। তা সেও ওই শোনা আর দেখার মধ্যেই পড়ে। ঠেসে ভাবলে কত পুরোনো দিনের কথার শব্দ পাওয়া যায়, কত হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখাও যায়।

এই যেমন এখন ভাবতে গিয়ে দা হাতে তার মরা বাপকে স্পষ্ট দেখতে পেল শচীন। উত্তরধারে ঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে ভাঙা বেড়া বাঁধছে। গায়ে ঘাম, মুখে নিভে যাওয়া বিড়ি, গলায় মৃদুমন্দ যাত্রার কোনো গান। যেখানটায় রান্নাঘর ছিল সেখানে এখন আগাছা বুকসমান। তবু শচীনের চোখের সামনে রান্নাঘরখানা ভেসে উঠল। মায়ের শাড়ির সবজে আঁচলখানা অবধি দেখা যাচ্ছে। আর নিমপাতা ভাজার মিঠে বাস আসছে খুব। চোতমাসে নিম—বেগুন ছিল বাঁধা। তা শুধু ওই নিম—বেগুনই। তাই দিয়েই ভাতের ঢিবি তুলে ফেলত বাপে—ব্যাটায়। কাঁচা লঙ্কা থাকত। আর কী চাই? গরিব বাপ গরিবই রেখে গেল তাকে। মা—ও গত হল।

তারপর থেকেই যেন ঠেকনোর অভাবে বাড়িটা হেলে পড়তে লাগল। মাটির দাওয়ায় ইঁদুরের গর্তে সাপখোপও কি নেই! কাঠা তিনেক জমি নিয়ে এই বাড়িখানা কি কাঁদবে শচীনের জন্য। বাড়ি কি কাঁদে?

খবরের কাগজের ভাঁজে পোকাটা ঝিম মেরে আছে এখনও। এ ব্যাটার কি কোনো বাড়িঘর আছে! তা ধরা যায় এই খবরের কাগজের ভাঁজখানাই ওর বাড়ি। এর বেশি আহাম্মকটা আর জানেও না কিছু। টুসকি মেরে ফেলে দিলে যেখানে পড়বে সেটাই ফের ওর বাড়ি। শচীনেরও তাই। পৈলেন যতদিন ছিল ততদিন পৈলেন, নইলে চৈতলপাড়া। দুটোতেই ঐ—কার আছে। ভারি অদ্ভুত। ঐ—কার বড়ো একটা থাকে না যেখানে—সেখানে।

পৈলেনে এখন জমির দাম কত করে কাঠা যাচ্ছে কে জানে। তবে বেশি নয়, আর কেনার লোকও চট করে পাওয়া যাবে না। পেলেও দাম কষবে। তার চেয়ে থাক পড়ে। মাঝে—মাঝে তো ভাবতে পারবে, আমার একখানা বাড়ি ওই হোথায়, পৈলেনে!

লটারির ব্যাবসাটা কোনো কাজের ছিল না। গুচ্ছের বাতিল টিকিট এখনও জমে আছে ঘরে। ফেলতে মায়া হয়েছিল বড়ো।

কথাটা ভাঙেনি অধিকারীর কাছে। সে চৈতলপাড়া আজই রওনা হচ্ছে আর এবেলাই। বেলা দেড়টায় একখানা বাস যায় ওদিকে। রোদ খেতে খেতে একেবারে তপ্ত চাটুটি হয়ে এসে পৌঁছোয় খয়েরপুর থেকে। পুঁটিমারি, হাশিমের চর, বাগদাখাল, জিনপুর হয়ে নবীনগর। সেখান থেকে বাস বদলে নতুন রাস্তা ধরে আরও চার ঘণ্টার পথ।

কপালের ওপর বিশ্বাস নেই শচীনের। কপালে ভর দিয়ে অনেক কাটল। লাভ হল লবডঙ্কা। তবে খবর পাকা হলে, কোনো রসের নাগর রসিকতা না করে থাকলে, তার একজন মাসির খবর পাওয়া গেছে। শচীনের তিনকুলে কেউ আছে বলে সে জানত না। হঠাৎ একদিন আগে একখানা তোবড়ানো পোস্টকার্ড এসে হাজির। হাতের লেখা এমন জড়ানো যে সেটা হাবশি ভাষাও হতে পারে। রায়বাড়ির পরমেশ তার আতসকাচ দিয়ে অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার করেছিল। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে চৈতলপাড়ার পুঁটুমাসি জানিয়েছে যে, সে শচীনের এক মাসিই বটে। শচীনের সঙ্গে তার ভারি একটা দরকার। চিঠিতে কথাটা লেখা যায় না। শচীন যেন কাজ—কারবার ফেলে এখনই পত্রপাঠ চৈতলপাড়া চলে আসে। মাইমগঞ্জের মোড়ে নেমে নারান হালদারের নাম বললেই যে—কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

মোদ্দা কথাটা হল এই। তা এ চিঠির ওপর কথাটা ভরসা করা যায় কে জানে!

পরমেশ বলল, চিঠির ভাবখানা যা বুঝছি মাসি তোকে সম্পত্তি দিতে চায়। বোধহয় সন্তান—টন্তান নেই। যা দুর্গা বলে ঝুলে পড়।

কথা তা নয়। পুঁটুমাসি তার আপনার মাসি হলে এক—আধবার কী মায়ের মুখে নামটা শুনত না শচীন? চিঠির ভাবখানা এমন যে, একেবারে মায়ের সাক্ষাৎ সহোদরা। ধন্দটা এখানেই লাগছে শচীনের।

রোদটা আরও তেজালো হলে শচীন ঘরে এসে তার মাচানটায় শুয়ে একটু ঠ্যাং নাচাল। ভাবগতিক কেমন যেন ঠেকছে তার! ভালো, না মন্দ? পোস্টকার্ডখানা টিনের তোরঙ্গে ছিল। উঠে সেটা বের করে ফের আলোয় ধরে পড়ল শচীন। '...তুমি আমাকে চিনিবে না। আমি তোমার মাসি হই। সম্পর্ক খুবই নিকট।'

ঘরের বেড়ায় অনেক ভোগলা। সারাবার সাধ্য শচীনের নেই। শেয়াল—কুকুর ইচ্ছে করলেই ঢুকে পড়তে পারে। ঢোকেও। প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয় শচীনকে। এসে মাঝে—মাঝেই দেখে দু—তিনটে নেড়ি কুত্তা দিব্যি জমিয়ে বসে গেছে। বাচ্চাও দেয়। পাখি বাসা করে বসবাস করছে বহুকাল ধরে। বর্ষাকালে টিনের অজস্র ফুটো দিয়ে জল পড়ে, শীতকালে উত্তুরে হাওয়া বিনা বাধায় হা—হা করে বয়ে যায়। গতবারও ঝড়ে চালের টিন উড়ে গিয়েছিল। শচীন কুড়িয়ে এনে ফের লাগায়। তো এই হল শচীনের ঘর। এর জন্য মায়া করে আর লাভ কী?

তার বাক্স গোছানো হয়ে গেছে। থালা, গেলাস আর ঘটি চটের ব্যাগে ঢুকেছে। বিছানা বলতে একখানা শতরঞ্চি, ছেঁড়া বেডকভার আর তেলচিটে শক্ত বালিশখানা। তা সেটা এখনও দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়নি। হয়ে যাবে।

ও শচীন, আছিস নাকি?

শচীন বেজার মুখে উঠল। এ হল নরেনকাকা। ধারে লটারির টিকিট নিত একসময়ে। এখনও চোদ্দো টাকা শচীন পায়। নরেনকাকা লোকটা সুবিধের নয় মোটেই। ধান্ধাবাজ এক নম্বরের।

মানে যাই থাক, মুখে আদিখ্যেতা দেখাতেই হয়। শচীন উঠল। মুখে একটু হাসি খেলিয়ে বলল, আসুন কাকা, খবর সব ভালো?

নরেন সাপুঁই ঘরে ঢুকে চারদিকটা চেয়ে বলল, অধিকারী তাহলে মিথ্যে বলেনি! তুই তাহলে চৈতলপাড়ায় যাচ্ছিস। কেন বাপ, এ দিকটায় কি সুবিধে হচ্ছিল না? আমরা পাঁচজন তো ছিলুম পেছনে।

শচীন খুব লজ্জার ভাব দেখিয়ে জিব কেটে বলে, আপনারাও রইলেন, আমিও রইলুম। চৈতলপাড়া তো মোটে একবেলার পথ। ঘুরেও আসা হবে একটু।

মাসির সম্পত্তি পাচ্ছিস যে শুনেছি। তা কীরকম সম্পত্তি? বেশ একটা মোটা দাগে মারলি নাকি কিস্তিটা!

গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারখানা কী!

চিঠিতে কী লিখেছে? একটু ইশারা তো থাকবে।

শেষ দিকটা লেখা বড্ড জড়ানো, পড়াই যাইনি। তবে সম্পত্তির কথা কী যেন আছে একটু।

বাঃ এ তো তোফা হল রে। বাকি জীবনটা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে খাবি। অধিকারীও বলছিল বটে, দোতলা পাকা বাড়ি, বত্রিশ বিঘে ধানজমি, চালের কল, আমবাগান, তেজারতি কারবার, নগদ পঞ্চাশ হাজার আর সত্তর ভরি সোনা।

ওই যাঃ হাতিশালে হাতি আর ময়ূর সিংহাসনটার কথা ভুলেই মেরে দিয়েছে তাহলে! আর হাওয়াগাড়ি!

নরেনকাকা মুখখানা তোম্বা করে বলে, তা ওর কথা কি ধরি নাকি? গর্ভস্রাব আর কাকে বলে! বরাবর অধিকারীর কথার ন—আনা বাদ দিয়ে সাত—আনা ধরি।

আজই রওনা হচ্ছিস বুঝি! দুর্গা দুর্গা। তাহলে বাড়ির বিলিব্যবস্থা কী হচ্ছে?

হচ্ছে না কাকা। বাড়ি পড়ে থাকবে।

লাভ কী? পিছন দিকটায় তোর দু—বিঘে জমি ছিল না?

সে কবে বেচে খেয়েছি। পশুপতি ওদিকে গোয়ালঘর তুলল যে!

অ। তা বাড়িখানার তো ভারি দুর্দশা করে রেখেছিস বাপ।

অনেকদিন ধরেই দুর্দশা চলছে কাকা।

টিন ক—খানা আর খুঁটিগুলি যা কিছু কাজে লাগতে পারে। এমনিতেও খুলে নেবে লোকে। দশটা টাকা দেবো'খন—

বেচব না কাকা। চৈতলপাড়ায় কী হয় না হয় কে জানে। ঘর আমার যেমন আছে থাক।

থাক। তবে বন্দোবস্তটা আমার সঙ্গেই করিস, বলে রাখলুম। যদি ওদিকটায় তোর সুবিধে হয়েই যায়, চৈতলপাড়াতেই যদি চেপে বসিস তাহলে একটু জানাস বাপ।

সে পরে ভেবে দেখা যাবে।

তাল আর নারকোল গাছগুলির কীরকম বন্দোবস্ত করলি?

যেমন আছে থাকবে। যার খুশি পেড়ে খাবে। এমনিতেই খায়, আমি তো আর বাড়িতে থাকি না, এধার—সেধার ঘুরে বেড়াই পেটের ধান্দায়।

নরেশ সাঁপুই যেন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। গাঁ থেকে একটা লোক চলে যাচ্ছে, সুতরাং কিছু ধান্দা করা যায় কিনা দেখতে এসেছিল। কিন্তু কোন দিকটায় যে সুবিধে হবে তা বুঝতে পারছে না। লোকটা

সুবিধের নয় ঠিকই, তবে বোকা। বুদ্ধি না থাকলে খুব একটা ফেরেব্বাজও হওয়া যায় না।

নরেন সাঁপুই কয়েকবার ঢোক গিলে বলল, গোটা পাঁচেক টাকা হবে বাপ?

কাকা, আপনার কাছে আমি এখনও কিছু পাই।

সে কী আর মনে নেই রে। বড্ড ঠেকায় পড়ে গেলুম আজ। সামনে সংক্রান্তি। সংক্রান্তিতে নরেনকাকার কোন মোচ্ছব কে জানে। একটা অজুহাত খাড়া করতে হয় বলে করা। বোকা লোক। নরেন সাঁপুইয়ের জন্য আজ হঠাৎ মায়া হল শচীনের। পুরো পাঁচটা টাকাই বের করে হাতে দিয়ে বলল, এ আর শোধ দিতে হবে না।

নরেন একটু হাঁ হয়ে গেল। সে চাউন্তি লোক। মানুষ দেখলেই চায়। তা বলে সবাই কি আর দেয়! দশজনের কাছে চাইলে একজন হয়তো দেয়। তাও পুরোটা নয়। নরেন সাঁপুইয়ের চাওয়ার কোনো ঠিক নেই। কার কাছে কী চাইবে তাও আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। কোনটা চাইবে তারও কিছু ঠিক নেই। নিশিকান্তর কাছে হয়তো পাঁচটা আলু চাইল, নীলমণির কাছ থেকে চাইল নারকোলের দড়ি, পটলের কাছ থেকে দোয়াতের খানিকটা কালি। খুব একটা কাজের জিনিস নয়, লাগেও না তার কাজে। তবু চাওয়ার অভ্যাসটা রাখে। অধিকাংশ সময়েই পায় না কিছু। আজ ঝড়াক করে পাঁচটা টাকা পেয়ে গিয়ে ভারি থতমত খেল সে। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে ফেলল চোখের পলকে। তার একটা মেয়ে আছে। বিন্দু। বাপকে খুব উস্তম—কুস্তম করে বকে এই স্বভাবের জন্য, তা বকুক। এভাবেও তো ঘরে কিছু আসে। যা আসে তাই লক্ষ্মী। এই পাঁচটা টাকা চলে এল— এ কি চাট্টিখানি কথা! কেমন হেসে হেসে চলে এল। গায়ে ঘামটুকু হল না।

নরেন সাঁপুই টাকাটা না পেলে শচীনের পেতলের ঘটিখানা চাইত।

নরেন সাঁপুই একটু দেঁতো হাসি হেসে বিদেয় হওয়ার পর বেলাটা একটু ঠাহর করে দেখল শচীন। একটু আগে ঠেসে পান্তা খেয়েছে। এবেলা আর খাওয়ার বায়নাক্কা নেই। চৈতলপাড়া পৌঁছোতে রাত হবে। তা হোক, তার আবার দিনই বা কী, রাতই বা কী? নারান হালদারের বাড়ি পৌঁছোতে পারলেই হল।

একটু ভয় ভয় করছে অবশ্য। ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না এরকমটা হচ্ছে কেন? হঠাৎ একখানা পোস্টকার্ড আসবার দরকারটাই বা কী ছিল?

খবরের কাগজখানা বোচনের বাপকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বোচনের মা আবার ঠোঙা বানিয়ে বেচে। কাগজের খুব হিসেব। হাড়কেপ্পন লোক।

বিছানাটা ধীরেসুস্থে গুটিয়ে নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল শচীন! একরত্তি একখানা জিনিস হল। দুনিয়ায় তার তৈজসপত্রের পরিমাণ কোথায় এসে ঠেকেছে দেখে শচীন আপনমনেই হাসল। অবস্থাটা খুব খারাপ যাচ্ছে ইদানীং।

বাক্স—বিছানা নিয়ে হেলেদুলে বেরিয়ে পড়ল শচীন। তার কোনো দুঃখ হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না, মন কেমন করছে না। লোকের নানারকম শেকড়বাকড় থাকে, আঁকুসি থাকে, বাড়ি ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়, গাঁ ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। শচীনের সেরকমধারা কিছু হচ্ছেই না মোটে। তার কাছে পৈলেনও যা, চৈতলপাড়াও তাই।

শীতলাবাড়িতে একটা পেন্নাম অবশ্য ঠুকল শচীন, দেখো মা, যেন বেঘোরে না পড়ি। একটা আধুলি প্রণামীও ঠুকে দিল। কম হল কি? কিন্তু আর দিতে সাহস হল না। পকেটে মোটে এগারো টাকা চার আনা আছে, বাসভাড়া বাদে। টাকাটা রাখা দরকার।

শীতলাবাড়ির পিছনে শ্রীপতির পুকুর ঘুরে গেলে উত্তরে বোচনদের বাড়ি। বেশ বাড়ি। পাকা দালান। সামনে একটা বাড়ি, মাঝখানে উঠোন ছেড়ে পিছনে আর একখানা। একটা মাটকোঠাও আছে।

শচীনকে দেখে বোচনের মা কুলোঝাড়া থামিয়ে অবাক হয়ে বলল, এ কী রে, বাক্স—টাক্স নিয়ে কোথায় চললি?

শচীন একটু লজ্জা পেল। মা মরে ইস্তক আর কারও কাছে না হোক বোচনের মায়ের কাছে তার একটু কদর ছিল। অনেক উপোসের দিনে এই মাসি তাকে ডেকে ভাত দিয়েছে। পাল—পার্বণে নেমন্তন্ন ছিল বাঁধা, বদলে শচীন মাঝে—মাঝে গতরে খেটে দিয়ে ঋণ শোধ করে বটে, কিন্তু শোধ হয় না। মায়ার একটা দেনা আছে।

শচীন বলল, এই যাচ্ছি একটু চৈতলপাড়া। এক মাসি খোঁজ করেছে।

তা যাবি। কিন্তু ব্যাক্স—প্যাঁটরা নিয়ে কেন? আর মাসিই বা হঠাৎ উদয় হল কোত্থেকে? তোর মায়ের তো নাড়িনক্ষত্র জানি। আমার বাড়িতে ঢেঁকি কুটত, ধান ভানত, খই—মুড়ি ভাজত, আর মনের প্রাণের কত কথা বলত। তোর মাসি এল কোত্থেকে বল তো!

সেটা তো আমিও জানি না মাসি। একটা চিঠি এসেছে।

কী লিখেছে চিঠিতে?

বিষয়—সম্পত্তির কথা কিছু আছে। ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

সে কী করে? বোঝা যাচ্ছে না মানেটা আবার কী?

মনে হচ্ছে চিঠিতে ভাঙতে চাইছে না।

বোস ওখানে। একটু কথা বলি। ও বোচন, দে তো শচীনকে একঘটি জল। দুটি মোয়া দিস। শচীন বারণ করল না। অনেক দূরের পথ। ততক্ষণে পেটের পান্তা জল হয়ে যাবে। যা বোঝাই করে নেওয়া যায় তাই কাজে লাগবে। গরিবের পেটও বটে, মেলা জায়গা, কত যে আঁটে তার ঠিক নেই বাবা।

বোচন এসে ছোটো ধামায় কয়েকটা মোয়া আর কুয়োর ঠান্ডা জল রেখে গেল।

মাসি খানিকক্ষণ কুলো আপসে সব সরিয়ে রেখো মোড়া পেতে সামনে এসে বসল। ফর্সা মুখে ঘাম জমেছে টসটসে। মোটা মানুষের গ্রীষ্মকালে ভারি কষ্ট।

মাসির বিষয়—সম্পত্তি পাবি নাকি?

সেরকমই মনে হচ্ছে। তবে ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাসি আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বলে, চিরকালের মতো যাচ্ছিস নাকি?

না। একটু বুঝে আসি গিয়ে।

গাঁ ছেড়ে যাবি, তা অমন হুট করে যেতে আছে? মাতব্বর—মরুব্বিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হয়, পাঁচজনকে জানাতে হয়, তবে না! ও কীরকম অলক্ষুণে যাওয়া তোর!

শচীন মোয়া খেতে খেতে বলল, মাতব্বরেরা তো খোঁজখবরও নেয় না। পৈলেনে আর আমার আছেটা কে! এই আপনিই যা একটু ডাকখোঁজ করেন।

তা আমাকেও তো বলতে পারতি একবার। তোকে নিয়ে যে কত কী ভেবে রেখেছিলুম! শচীন একটু অবাক হল, আমাকে নিয়ে আবার ভাবনার কী মাসি? আমি নিজেই তো ভাবি না কিছু।

সে আছে রে। তোর মেসোকেও তো ক—দিন ধরে জ্বালিয়ে মারছি, ওগো, আমাদের শচীনের জন্য একটু ভেবো। তা তার মাথায় নানা ফিকির। তার কি আর সময় আছে আমার কথা কানে তোলার?

শচীন লজ্জায় অধোবদন হল। তার জন্য যে কেউ ভাবে, এটা তার কাছে বড়ো নতুন কথা।

ঘাড়গলার ঘাম মুখে মাসি বলল, কথা আরও আছে।

কী কথা মাসি?

তোকে সেকথা বলি কী করে? তোর মা হলে কথাটা পাড়তে সুবিধে হত। তা সে আবাগীর বেটি কোন সকালে ভবনদী পেরিয়ে গেল। এখন ছাই বলিই বা কাকে! এদিকে তুই নিজেও আবার বিবাগী হচ্ছিস।

কথাটা আমার জানতে নেই বুঝি?

জেনে তো বড্ড লায়েক হবি বাছা। তবে অনেকদিন ধরে কথাটা ভেবে রেখেছিলুম। বোচন ডাগরটি হওয়ার পর থেকেই। কিন্তু আমার ভাবায় হবেটা কী? সংসারে পেষাই হচ্ছি দিনরাত, আমার ভাবাভাবি সব

ভেতরে ভেতরে ভেপে ওঠে। বোচনের বাপ কোন কথাটা কানে তুলছে আমার বল তো!

না, মাসি ততটা ভেঙে বলেননি। তবু শচীন একেবারে পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল।

বাপ রে! ঠিক শুনেছে তো সে! কথার ভিতরকার মানে ধরতে পারছে তো! বোচন ডাগর হওয়ার পর থেকে মাসির মতলবখানা কোনদিকে যাচ্ছে?

মোয়া এমন জিনিস সে, হুড়োহুড়ি করে খাওয়া যায় না। অথচ ধামায় এখনও চার—চারটে পড়ে আছে। হাতছিপ্পু করে মোয়া ক—টা তুলে পকেটে পুরে নিল শচীন। মাসি খুদকুঁড়ো জড়ো করছে নীচু হয়ে। এই সুযোগ। ভিতরটা বড্ড শুকিয়ে উঠল হঠাৎ। শচীন জলের ঘটিটা গলায় প্রায় উপুড় করে ধরে সবটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল।

উঠলুম মাসি।

উঠবি মানে?

দেড়টার বাসটা ধরতে হবে।

চৈতলপাড়া বললি তো!

হ্যাঁ।

কত দূর এখান থেকে?

ঘণ্টা ছয়েকের পথ।

ও বাবা! তাহলে তো বেশ দূর!

তা আছে।

কবে আসবি আবার?

তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

মাসি কেমন যেন কাহিল হতাশ মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। শচীন একটা পেন্নাম ঠুকে উঠে পড়ল।

আজ যা রোদ উঠেছে, একেবারে চাষাড়ে রোদে। আকাশে একটা পিঙলে ভাব। চারিদিকটা যেন ঝিমঝিম করছে তেতে। চৈতলপাড়া নাকি এর চেয়েও শুখো। তা অধিকারীদাদা আগড়ম—বাগড়ম অনেক কথা বলে। তার কথার কিছু ঠিক নেই।

শচীন গুটি গুটি বাস রাস্তার কদমতলার ছায়ায় এসে দাঁড়াল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে লাভ হল না কিছু। সান্ত্বনা হল। বাক্সটা পেতে চেপে বসল শচীন। দেড়টার বাস আসতে এখনও ঢের দেরি।

এই গরমের দুপুরে আর কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। শচীন বসে বসে ভাবতে লাগল।

বোচন! কোনোদিন বোচনের কথা তেমন করে ভাবেনি শচীন, মুখটাও দেখেনি মন দিয়ে। কেমন মেয়েটা? শচীন চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করল। ভালো করে মনে পড়ল না। অথচ একটু আগে বোচন তাকে মোয়া আর জলের ঘটি দিয়ে গেছে। তবে মনে পড়ছে না কেন?

না। ভালো করে ভাবতে হবে।

মুশকিল হল, যতই ভাবতে যায় ততই পিছলে যায় ব্যাপারটা। জ্বালাতন আর কাকে বলে!

ওপাশে খয়েরপুরের বাস ধরতে একটা পরিবার এসে জড়ো হয়েছে, স্বামী—স্ত্রী আর গোটাকয় বাচ্চা। চাষিবাসী লোক। গাছতলায় চেপে বসে আছে। লোকটা বিড়ি ধরিয়েছে, বউটা কোলের বাচ্চাকে ওরই মধ্যে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটা আজ তেমন খারাপ লাগল না শচীনের। হাঁ করে দেখল। কয়েকটা মানুষ মিলে মোয়া বেঁধেছে যেন। চিটটা যে কীসের সেটাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

হ্যাঁ, বোচনের কথা। কী যেন বলছিল মাসি! ঠিক শুনেছে তো! মানেটা ঠিক ঠিক ধরতে পারছে তো! এই গাঁয়ের ওই একটিমাত্র মানুষ— অর্থাৎ বোচনের মা তার যা হোক একটু খোঁজখবর যে করত, তারও তো একটা মানে আছে। এমনি এমনি তো করত না!

শচীন ফের চোখ বুঝল। বোচনের মুখখানা কেমন? নাক, চোখ, ঠোঁট, চুল— কিছু একটা তো মনে পড়বে! রোজ দেখছে, তবু মাথাটা একদম ফর্সা শচীনের। কিছুই মনে আসছে না। বোধহয় এই গরমে আর রোদেই এমনধারা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে একটা কথা শচীনের মনে পড়ল। বোচন বছরটাক হল ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। আর নিমতলায় আজকাল আর তাকে এক্কাদোক্কা খেলতে দেখা যায় না।

খয়েরপুরের দিক থেকে একটা বিকট হর্নের শব্দ এল। বাস আসছে। বিশাল ধুলো উড়ছে বাসের পিছনে! একেবারে গন্ধমাদন।

শচীন উঠল। বড্ড গরম। শেষবারের মতো বোচনের মুখটা মনে করার খুব চেষ্টা করল সে। এত চেষ্টা করল যে, বাসটা সামনে এসে দাঁড়ানোর পর একমুঠো ধুলো মুখে নিয়ে সে চেতন হল। দাঁত কিচকিচ করছে ধুলোয়।

কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, পুঁটিমারি, হাশিমের চর, বাগদাখাল, জিনপুর, নবীনগর....

শচীন তিন পা পিছিয়ে এল। আর প্যাসেঞ্জার নেই বলে কন্ডাক্টর তার দিকেই চেয়ে চেঁচাচ্ছে।

শচীনেরও ওঠাই উচিত। তার কারণ এ বাস ছাড়লে আজ আর পৌঁছোনোর আশা নেই। তবে কিছুতেই সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে পা—দানিতে পা দিয়ে উঠে পড়ার মতো সহজ কাজটাও করে উঠতে পারল না।

উঠবে তো, নাকি! কন্ডাক্টর এবার বলেই ফেলল।

শচীন কাঁচুমাচু হয়ে বলল, যেতুম তো ভাই, কিন্তু একটা জিনিস যে ফেলে এসেছি।

অ, তাই বলো! বলে কন্ডাক্টর ঘণ্টি মেরে দিল।

নাঃ, ভারি লজ্জা করছে শচীনের। ওপাশ থেকে চাষি আর চাষি—বউও তাকে দেখছে।

শচীন আর দেরি করল না। জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। লোকে ঠিক বুঝবে না তার সমস্যাটা কোথায়। ওই যে বোচনকে কিছুতেই মনে করতে পারল না, এ লক্ষণটা শচীনের ভালো ঠেকছে না। এই গুরুতর স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় সে যায়ই বা কী করে?

আর কাণ্ডখানাই বা কী? মেয়েটার মুখটা মনে করতে পারল নাই বা কেন সে?

গুটি গুটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল শচীন। একটা কুকুর ঢুকে পড়েছিল, তাকে দেখে বেরিয়ে গেল লজ্জা পেয়ে। জিনিসগুলি যেমন ছিল তেমনি আবার রাখল শচীন। বিছানাটাও পাতল। তারপর শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে ভাবল, আজ বিকেলে জলের ঘাটে গিয়ে মেয়েটাকে ভালো করে দেখতে হবে।

আজ আর যাওয়া হল না শচীনের। কালও হবে কি না কে জানে!

শেষবেলায়

নেত্য, নেত্যগোপাল সামন্তর বাড়িটা এদিকে কোথায় জানেন? ও মশায়—

রকে এক বুড়ো বসে। একটা তেলচিটে তুলোর কম্বল থেকে মুখখানা জেগে ওঠে। বড়ো বেশি খানা—খোঁদল মুখে, আর নারকেল ছোবড়ার মতো রুক্ষ দাড়ি—গোঁফ। শিরা—উপশিরা সব ভেসে উঠেছে। মরকুটে বুড়ো। চোখের কোণে মাখনের মতো পিঁচুটি জমেছে।

নেত্য?

নেত্যগোপাল।

সামন্ত বাড়ি? কী বললে?

তাই বলছি। নেত্য সামন্ত? দালাল!

হবে।

সে থাকে কোথা?

বুড়োটা ঘোলাটে চোখে একটু চেয়ে থাকতেই কপালের চামড়ার নীচে বান মাছের মতো একটা রগ সরে গেল একটু পিছলে। মরবে! পিত্ত কফ শ্লেষ্মা তিনটেই প্রবল। গলার ঘর্ঘরটা সামলাতে পারছেন না। বুকে বাতাস ডাকছে।

শেলেশশা। বুঝলে।

বুঝেছি।

অনেক নতুন নতুন লোক বসিয়ে নিশ্চিন্দায়। নতুন কালের মানুষ সব।

সবাইকে কী চিনি? হরেন চৌধুরী বুঝল, হবে না, বলল, কিন্তু খুব নামডাকের লোক। তিন চার রকমের দালালি।

রাখো তোমার দালালি। দালাল নয় কে? কী নাম বললে? নেত্যগোপাল?

নেত্যগোপাল! সামন্ত বাড়ি—

এই বাড়িটাই দেখিয়ে দিল একজন।

এই বাড়ি? বলে মাথা নাড়ে বুড়োটা, কিছু ঠাহর পাই না। এই মনে পড়ে।

ভুলে যায়। ঝুব্বুস হয়ে বসে গেছি বাপ, কে আর দেখে আমাকে! জাড়টাও বাড়ল খুব এবার।

হরেন হাসে— জাড় কোথা খুড়োমশাই দিব্যি বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে।

তোমার তো দিবেই। যার মাথায় হাত তার জাড়। শরীরে সেই কোন সকালে শীত ঢুকে বসে আছে। তাড়াই কত। যায় না।

তো নেত্য সামন্তর খোঁজ পাই কী করে? বাড়িতে কে আছে?

আছে অনেক। জ্ঞাতিগুষ্টি কী কম? তিষ্টোতে পারি না বাপ, বড্ড জ্বালায় ছেলেগুলি। নিত্যগোপালের ছেলে, আমার নাতি—

হরেন ঝুঁকে সাগ্রহে বললেন, কী নাম বললেন? আপনার ছেলে নিত্যগোপাল?

বুড়ো হতচকিত চোখে চায়, তবে কার ছেলে? ভুল বললুম নাকি?

তাহলে তো এইটেই নিত্যগোপালের বাড়ি।

এইটাই।

চেনেন না বললেন যে?

চিনি। আমার ছেলে। ভুল হয়ে যায় বাপ। আমি হচ্ছি গয়েশ সামন্ত। বলে বুড়ো মাড়ি আর মুখের ফোকর দেখিয়ে হাসে, এইবার মনে পড়েছে। সব হিসেবে ঠিকঠাক। সামন্ত বাড়ি, নেত্য।

নেত্যকে আমার দরকার।

যাও না ভেতরে। এটা কি সকাল বাপ? ক—টা বাজল?

বিকেল। চারটে। এ সময়ে থাকার কথা।

আছে বোধহয়। এখানেই থাকে। গয়েশ সামন্তর ছেলে হল নেত্যগোপাল, নেত্যগোপাল।

ছেলেপুলে তো কাউকে দেখছি না। কাকে দিয়ে ডাকাই! অচেনা লোক হুট করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে?

ছেলেপুলে? নেত্যর? তারা সব গর্ভস্রাব।

গালাগালটা হরেনের শোনা। বাবা দেয়।

বলল, ছেলেগুলি জ্বালায় নাকি?

কিছু রাখে না। এক পুরিয়া চিনি লুকিয়েছি তোষকের তলায়। লোপাট। কিছু রাখে না। বড়ো এলাচ খেলে বুক ভালো থাকে, চিত্ত এনে দিয়েছিল একমুঠো। কড়মড় করে চিবিয়ে খেল। বউমারা সব যে পেটে এগুলি কী ধরেছিল, ছিঃ ছিঃ।

হরেন চৌধুরী দরজায় উঠে 'নেত্যবাবু' বলে ডাকতে লাগে।

ভেতরে শোনা যায় না। বুড়োটা বলে।

কেন?

সব অনেক ভেতরে থাকে। ছেলেগুলি সর্বক্ষণ খাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যায় না, ঢুকে যাও।

মেয়েছেলে রয়েছেন, যদি কেউ কিছু মনে করেন! উটকো লোক।

পর্দানশিন তো নয়। যখন গাল পাড়ে তখন তো ইয়ের কাপড় মাথায় উঠে যায়। মেয়েছেলে? যাও। সর্বক্ষণ লোক আসছে, এ বাড়ি হচ্ছে হাট।

তা হরেন চৌধুরী কিছুক্ষণ দোনোমোনো করে ঢুকেই পড়ে। রক পেরিয়ে দরজা। ভেতরে একটা বাঁধানো জায়গা, বারান্দামতো। তারপর মস্ত উঠোন। বাড়িটার কোনো প্ল্যান ছিল না নাকি? যেখান—সেখান দিয়ে ঘর—বারান্দা সব গজিয়েছে। দেওয়ালে প্লাস্টারের বালাই নেই, ইট বেরিয়ে আছে। একপাশে ভারা বাঁধা, রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে বোধহয়। কাণ্ডটা প্রকাণ্ডই। উঠোনের চারধারেই ঘর, ঘরের উপর ঘর উঠেছে কোথাও। একটাই বাড়ির খানিকটা একতলা, খানিকটা দোতলা, তেতলাও আছে। উঠোনের মাঝখানে কুয়ো, কুয়োর পাশেই আবার টিউবওয়েল। বিস্তর বাচ্চা—কাচ্চা, আর কয়েকটা মেয়েছেলে দেখা যায়। কুয়োপাড়ে বাসনের ডাঁই মাজতে বসেছে কুঁজো চেহারার কালো এক মেয়েছেলে। মাজতে মাজতে বকবক করছে। তার কাঁকালের ফাঁক দিয়ে বাঁদরের বাচ্চার মতো একটা বছর দেড়েকের মেয়ে ঝুলে আছে, তার মাথাটা বুকের মধ্যে সেঁদানো। মেয়েমানুষেরা পারেও! ভেবে একটু শিউরেও ওঠে হরেন।

হেঁকেই জিজ্ঞেস করে, নেত্যগোপালবাবুর বাড়ি তো এটা?

কেউ তাকালও না। উঠোন জুড়ে চিলচেঁচানি। খাপড়া ছুঁড়ে গুটিসাতকে ছেলেমেয়ে গঙ্গাযমুনা খেলছে। তাদের মধ্যে একজন এক ঠ্যাঙে লাফিয়ে তিন ঘর পেরিয়ে গেল, সবাই চেঁচাচ্ছে তাই!

এই হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলির ছবি। হরেনের চোখদুটো করকর করে উঠল। দুঃখে। একসময়ে সে এরকম একটা পরিবারে মানুষ হয়েছিল। সেসব ইতিহাস। আজ সামন্তমশাইয়ের কাছে এসেছে ছোট্ট একটা প্লট বা বাড়ির সন্ধানে। লোকটার হাতে বিস্তর জমির খোঁজ। কলকাতায় আর জমি নেই। যাও বা ছিল ঢাকুরে, যাদবপুর, বেহালা বা গড়িয়ায়— তাও টপাটপ ফুরিয়ে এল বলে। এরপর কলকাতার জমি বিক্রি হবে ঝুড়িতে। মানুষ তাই কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখবে। দেখবার মতো জিনিস হবে একটা। তা সেই দুর্লভ জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হরেন একমুঠো চায়, ছোট্ট প্লট হলেই তার চলে যাবে। সংসার বড়ো নয়। বউ আর

দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। কাঠাখানিক কী দেড়েক হলেই তিনতলা তুলবে। সুবিধেমতো জায়গায় হলে একতলাটা হবে দোকানঘর, দোতলায় ভাড়াটে, তিনতলায় তাদের ছোটো সংসার।

ছোটো পরিবারই সুখী পরিবার বলে বটে, কিন্তু হরেনের মনে ধন্দটা যায়নি।

সামন্তমশাইয়ের বাড়ির দৃশ্যটা দেখে কী জানি কেন হরেনের বুকটায় মেঘ জমে ওঠে। এইরকম একটা হাটখোলায় সে মানুষ হয়েছিল। সুখে নয়, আবার তেমন সুখ আর পাবেও না।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সে দু—কদম এগোল। বারান্দার নীচে নর্দমা, তাতে একটা নীল বল পড়ে আছে। উঠোনে ফাটা বেলুনের রবার ন্যাতার মতো, একটা ছাগল ঘাস থেকে মুখ তুলে হরেনের চোখে চোখ রাখে। কোন বিধবার রোদে—দেওয়া কাপড় অশুচি করেছে হতচ্ছাড়া কাক, বুড়ি দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে চেঁচাচ্ছে, বলি নেন্তি, কাকে ছোঁয়া কাপড় মা, রাঁড়ি বলে তো আর মানুষের বাইরে যাইনি, তখন থেকে বলছি, ধো না হয় গঙ্গাজলের ছিটে দে...

হরেন নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

বোঝা যায় যে, এ বাড়িতে লোকের যাতায়াত বিস্তর। সে যে ঢুকে এসে দাঁড়িয়ে আছে কেউ গ্রাহ্যই করে না। যেন—বা বাড়ির লোক। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বাড়ির লোক আর বাইরের লোক চেনা ভারি মুশকিল। কেউ অচেনা এলে দাঁড়ালে ছোটোবউ ভাবে বড়োবউ—এর কাছে এসেছে, বাপ ভাবে ছেলের কাছে এসেছে, ভাই ভাবে দাদার কাছে এসেছে। কেউ গা করে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে দিয়ে গলায় ব্যথা। বাচ্চাগুলিকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা বৃথা। তারা আরও ব্যস্ত।

মিনিটদশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটা চলতি বাচ্চাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে হদিশ পাওয়া গেল। নেত্য থাকে দোতলার ঘরে। 'ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান, ঘর খোলা আছে, কাকামশাই এ সময়ে অঙ্ক কষেন।' বলে বাচ্চাটা উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি চটা ওঠা। হয় সিমেন্ট পায়ে পায়ে উঠে গেছে, নয়তো লাগানোই হয়নি। গোয়াল সকলের, ধোঁয়া দেবে কে?

দোতলার ঘরে নেত্য সামন্তর অফিস কাম বেডরুম। ঘরটায় তক্তপোশ আছে, টেবিল—চেয়ারও। কিন্তু দলিল—দস্তাবেজ, মুসাবিদা আর মামলার কাগজে ছয়লাপ। টেবিল—চেয়ারে ডাঁই, বিছানাও অর্ধেক দখল নিয়েছে কাগজেরা। থলথলে চেহারার কালো মতো নেত্যগোপাল মেঝেয় বসে চৌকির উপর গ্রীবা তুলে জিরাফের ভঙ্গিতে— হ্যাঁ— অঙ্কই কষেছ বটে। আসলে ফর্দ। কীসের ফর্দ তা অবশ্য দেখার চেষ্টা করে না হরেন।

কী চাই আজ্ঞে।

নেত্যগোপাল সামন্তমশাই কি আপনি?

আজ্ঞে।

এসেছিলাম একটু বিষয় ব্যাপারে—

নিত্য বা নেত্যগোপাল ঘাবড়ায় না। নিত্যকর্ম। ফর্দটা মুড়ে রেখে বলে, আসুন।

বসুন। বলে নেত্যগোপাল বিড়ি ধরায়। তারপর বলে বলুন।

একটু বাস্তুজমি।

জমি?

আজ্ঞে। হুবহু নেত্যগোপালের অনুকরণ করে হরেন বলে?

খরচাপাতি কীরকম? এলাকা? তৈরি বা পুরোনো বাড়ি চলবে না?

চলবে, তবে তিনতলার ভিত হওয়া চাই।

নেত্যগোপাল হাসল। হাতের বিড়িটা ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখল একটু। তারপর বলল, যারা বাড়ি করে তারা তিন কী চারতলার ভিতই গাঁথে, সে একতলা বাড়ি করলেও। শেষ পর্যন্ত আর তিন—চারতলা হয়ে

ওঠে না। বেশিরভাগই টাকার অভাবে য—তলার ভিত তার আদ্দেক উঠে ফুরিয়ে যায়। মাটির তলায় বৃথা টাকা খরচ।

হরেন চুপ করে রইল। তিনতলাটা তার চাই—ই।

আমাদের বাড়িরই সেই দশা। মাটির নীচে হাজার পনেরো—বিশ টাকা উপরেতে ঠেঙে ভূতে—পাওয়া বাড়ি। বলে হাসল নেত্যগোপাল।

হরেন হাসল। কারণ নেই। তারপর হঠাৎ দালালের সামনে বেশি হাসা উচিত নয় ভেবে গম্ভীর হয়ে বলল, তবে বাড়ির চেয়ে জমিই ভালো। পছন্দমতো করা যাবে।

কীরকম করতে চান?

একতলায় দুটো দোকানের প্রভিশন থাকবে, আর গ্যারেজ। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তিনতলাটা আমার। ওটা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল বিড়িটা মন দিয়ে দেখে। চোখ ছোটো, কপালে লম্বা কোঁচকানো দাগ।

শুনছেন? হরেন সন্দেহবশত জিজ্ঞেস করে।

শুনেছি। বলে নেত্যগোপাল।

তিনতলাটায় চতুর্দিকে বারান্দা—টারান্দা হবে, চিলেকোঠার পাশে চারতলায় হবে ঠাকুরঘর।

নেত্যগোপাল শ্বাস ছাড়ল।

কথাবার্তায় আরও সময় গেল খানিক। আগামপত্তর করতে হল কিছু। পেয়ে যাবে হরেন। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলতে পারবে। নেত্যগোপালের দু—হাতের দশটা আঙুলের নখে নখে কলকাতার মাটি লেগে আছে। কলকাতার জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই একখামচা তুলে নিতে পারবে বলে ভরসা হয় হরেনের। একতলার দুটো দোকানঘরের একটাতে বসাবে গবেট বড়ো ছেলেটাকে। গ্যারেজটা অবিশ্যি খালিই পড়ে থাকবে এখন, যদি ভগবান কখনো সুদিন দেন...। গোরু পুষবার বড়ো শখ ছিল তার। হবে না। গোরু, সবজিখেত, হাঁসমুরগি এসবের জন্য মফস্সলের দিকে কাঁদালো জায়গাই পছন্দ ছিল তার, কিন্তু গিন্নির শখ কলকাতায় থাকবে। থাকো তাই। হরেনের গোরু তাই বাদ গেল। একটা শ্বাস পড়ে যায়। বাপ—দাদার সঙ্গে চিরকালের মতো ছাড়ান—কাটান হয়ে যাচ্ছে। যাক। এজমালি সংসারের লোভে মুখখানার হাঁ আর যে বন্ধই হয় না। বাবা গত এগারো বছর বসে আছে, দাদা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে বুড়ে হয়ে গেল। পরের ভাই মোটর মিস্ত্রি, তার ওপর লাভ—ম্যারেজের দজ্জাল বউ। থাকা যায় না একসঙ্গে। পয়সাকড়িতে রোজগারে, ওর মধ্যে হরেনেরই যা হোক একটু চিকিমিকি। বউ তাই রোজই সাবধান করে— এই বেলা ভেন্ন হও। নইলে সব তোমার ঘাড়েই হামলে থাকবে।

বুড়োটা নীচের বারান্দায় খেতে বসেছে। বাটিতে চিঁড়ের জাউ কিংবা সাগু— কিছু একটা হবে। সপসপে জিনিসটা হাতের কোষ তুলে ভয়ংকর মুখখানা হাঁ করে সড়াৎ করে টেনে নিচ্ছে। এই বয়সে খাওয়া বাড়ে। বাড়লেই বুঝতে হয়, তিন শেষ হয়ে আসছে। হরেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

প্রশ্নটা এসে পড়ে মুখে, সামলাতে পারে না হরেন। জিজ্ঞেস করে, তা সামন্ত মশাই তো ইচ্ছে করলেই নিজের মতো একখানা বাড়ি করে ভিন্ন থাকতে পারেন। এই ক্যাঁচকেঁচির মধ্যে থাকা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল হাত রসিদটায় চোষ কাগজ চেপে বলে, ভাবি মাঝে—মাঝে বুঝলেন! সাত ভাইয়ের সংসার, ছেলেপুলে মিলে একটা পুরো পল্টন। পয়লা তিন ভাইয়ের বিয়ে দেখেশুনে হয়েছিল, পরের চারজন কোথা থেকে একে একে সব বউ নিয়ে এসে পটাপট ঢুকিয়ে দিল বাড়িটায়। গুষ্টি বাড়ছে। ভাবি বুঝলেন!

আপনি ইচ্ছে করলেই তো হয়।

হয়। এক সদ্যবিধবার জমি পেয়েছিলাম সুবিধামতো। বায়না—টায়নাও হয়ে গেল। ঝপ করে দর পেয়ে ছেড়ে দিলাম। দালালি করার ওই অসুবিধে। দামটা সবসময়ে মাথায় বিঁধে থাকে। নিজের জন্য আর আমি

ভাবতেই পারি না। কয়েকবার চেষ্টাও করে দেখেছি। ভাবি, চলে যাচ্ছে যখন যাক। তবে ভাবি মাঝে—মাঝে বুঝলেন! ভাবনাটা আছেই। বলে খুব হাসে নেত্য বা নিত্যগোপাল।

আজকাল আর জয়েন্ট ফ্যামিলি চলে না—

সে তো বটেই! একা থাকার যুগ পড়ে গেল। ছোটো সংসার সুপসাপ ঘরদোর, ছোটো হাঁড়ি, ছোটো পাতিল। এসবই চল হয়েছে। ইচ্ছেও করে খুব।

বুড়োটা হড়হড়ে পদার্থটা তরল করে গোটা দুই রুটি গুড় আর জল দিয়ে মাখছে। দাঁত নেই, তবু জলে গুলে খাবে। খাওয়াটা এই বয়সেই বাড়ে। হরেনের বাবারও বেড়েছে। দিনরাত খাওয়ার গল্প। হরেনের বউ করে খুব বুড়োর জন্য। আলাদা হয়ে উঠে গেলে কষ্ট হবে উভয়তই। বাবাকে কি নিজের কাছে নিয়ে যাবে হরেন? ভেবে আপন মনেই মাথা নড়ে। নেওয়াটা ঠিক হবে না। কেন ঠিক হবে না তা অবশ্য ভেবে পায় না সে। নিজস্ব ঘরবাড়ি, তার মায়া বড়ো সাংঘাতিক। বুড়ো মানুষ ঘরে হাগবে—মুতবে। তাছাড়া, হরেনের বউ—ই একটা জীবন করে গেল হরেনের বাপের জন্য। এবার অন্য ভাইয়ের বউরাও করুক। এসব ভেবেই হরেন আপন মনে মাথা নাড়ে।

নেত্য বা নিত্যগোপাল রসিদখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, কথা তখনই পাকা হয় যখন জায়গাটা হয়ে গেল। ভাববেন না চৌধুরীমশাই, টাকা যখন আগাম বায়না নিয়েছি ভাবনা এবার আমার।

হরেন ওঠে। উঠতে উঠতেই বলে, পরের ভাবনা তো ভাবলেনই। আমি ভাবছি আপনার কথা! কত জমি আপনার তাঁবে। লাখোপতি থেকে আমার মতো অভাজন ধরনা দেয়। সকলেরই জোতজমি করে দেন আপনি! অথচ নিজের বেলায়—

নেত্য বা নিত্যগোপাল ভ্রূ কোঁচকায়। অমায়িক মুখে বলে, আমিও ভাবি। ভেবে ভেবে কেটে যাক জীবনটা। আলাদা বাড়ি, আলাদা সংসার তার স্বাদই আলাদা। বউও বলে, খুব বলে। জলে জলে হাত—পা হেজে—মজে যায়, জায়েদের ছেলেপুলে টেনে কাঁখে ব্যথা, প্রলয় উনুনের ওপর বিশাল কুম্ভীপাকে রান্না করে করে মাথাধরার ব্যামো, অম্বল। সবই বুঝি মশাই। কিন্তু মাথার মধ্যে এমন এক দাঁও মারার মতলব বাসা বেঁধেছে যে কী বলব।

আরও দু—চারটে কথা বলে হরেন চৌধুরী বেরোয়।

রকে এসে আবার মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে বুড়ো। হাতে বিড়ি। তাকে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, ক—টা বাজে বাপ?

হরেন হাসে! ঘড়ি ঘড়ি টাই জানা চাই, যেন কত অফিস বা সিনেমার বেলা বয়ে যাচ্ছে! ঠাট্টা করে বলে, টাইম জেনে কী হবে খুড়োমশাই? ইষ্টচিন্তা করুন।

সময় কি ফুরিয়েছে বাপ?

হরেন হাসিটা গিলে বলে, বেলা তো ফুরিয়েই এল খুড়োমশাই!

বেলা ফুরিয়েছে? বলে খুড়ো একটু থমকে চেয়ে থাকে। মুখখানা তুবড়ে অদ্ভুত দেখতে হয়। ঠোঁটদুটো ফোকলা হাঁয়ের মধ্যে কচ্ছপের মুখের মতো ঢুকে বেরিয়ে আসে। বুড়ো বলে, এটা কি বিকেল?

তাই বটে।

তবে যে মেজোবউমা বড়ো চিঁড়ের জাউ খাওয়ালে? অ্যাঁ! জাউ তো আমি সকালে খাই। বিকেলে আজ হালুয়া খাব বলেছিলাম যে? অ্যাঁ!

হরেনের একটু কষ্ট হয় বুকের মাঝখানটায়। বলে, খাবেন, তাই কী? খাওয়া কী একদিনের?

চিত্ত সুজি এনে রেখেছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তাহলে ওই গর্ভস্রাবগুলিকে খাইয়েছে। বাপ ঝুব্বুস হয়ে বসে আছি,— এখন কে আর দেখে আমাকে! চিঁড়ের জাউ আমার বেহান বেলায় খাওয়ার কথা

— নেত্যর বউ কিছু খেয়াল রাখে না বাপ। সাত—সাতটা বউ ইয়ের কাপড় মাথায় তুলে দিনরাত্তির ছেলেগুলিকে গেলাচ্ছে। বিড়িটা ধরিয়ে দাও তো বাপ, হাত বড্ড কাঁপে—

হরেন চৌধুরী গয়েশের বিড়িটা ধরিয়ে দেয় যত্ন করে। একটু হেসে বলে, হিসেব সব মেলে খুড়োমশাই?

হিসেব! কোন হিসেবের কথা বলছ?

এই যে আপনি গয়েশ সামন্ত, আপনার সাতটা ছেলে, সাত বউ, কত নাতি—নাতনি, তারপর এটা বেহান বেলা না সাঁজবেলা— এসব হিসেব?

বুড়ো বিড়িটা টেনে কাশতে কাশতে গয়ের তোলে গলায়। হাঁপির টান। বিড়ি খাওয়া বারণ নিশ্চয়ই, লুকিয়ে—চুরিয়ে খায়। খাওয়াটা আসল।

মেলে না বাপ ভুল পড়ে যায়। এই একটু আগে একজন কার খোঁজ করছিল।

আমিই।

হবে। বলে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে। হরেন কান পেতে শোনে। বুড়ো হিসেব মেলাচ্ছে— আমি হলুম গে গয়েশ সামন্ত... সামন্ত বাড়ি... বড়ো ছেলে চিত্ত, মেজো নিত্য, আর কতকগুলি...

হরেন ঘড়িটা দেখে নিয়ে হাঁটা দেয়। রেললাইন বরাবর হেঁটে প্ল্যাটফর্মে ওঠে। পাঁচটা পাঁচে ট্রেন। সিগন্যাল দেয়নি এখনও। প্ল্যাটফর্মে কালো কালো কিছু মেয়ে—পুরুষ আর বাচ্চা সংসার পেতে আছে। পোঁটলা—পুঁটলি, ইটের উনুন, কৌটোর মগ ছত্রাকার। উকুন বাচছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। বিশ—ত্রিশখানা রুটি রোদে শুকোয় এরা কে জানে! একটা বাচ্চা হামা দিয়ে এসে হরেনের জুতো ধরে ফেলেছে। হরেন ঠ্যাং টেনে নেয়। সংসারটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। ভারি নিশ্চিন্ত হাবভাব, দুনিয়াজোড়া জমি ওদের। যেখানে—সেখানে বসে যায়।

শীতের বেলা। রোদ মরে গিয়ে এ সময়টা বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে। মাটির ভাপ না ধোঁয়া মেঘের মতো গড়ায় মাটির ওপর। ওর ভারী বাতাস। দুঃখের শ্বাসের মতো জমে আছে পৃথিবীর ওপর।

সামন্তমশাই পাকা লোক। জমি একটা পেয়েই যাবে সুবিধেমতো। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলবে। ভারি একটা আনন্দ হয় হরেনের।

আবার কী জানি কেন রোদমরা বিকেলটার দিকে চেয়ে বুকটা হঠাৎ ঝাঁৎ করে ওঠে। কী একটা যেন মনে হয়, একটু ভয়—ভয় করে। বুকটায় বগড়ী পাখির মতো কী একটা গুড়গুড় করে ডাকে। পেটটা পাকিয়ে ওঠে।

ভিখিরিদের সংসার, প্ল্যাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দূরের সিগন্যাল— এসবের ওপর দিয়ে আকাশ আর জমির মাঝ—বরাবর একটা অদ্ভুত আলো—আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। ট্রেন রেল—পুল পেরিয়ে আসছে। হরেন চৌধুরী গাড়ির শব্দটা ঠিক শুনতে পায় না। সেই আলো—আঁধারিটার দিকে অন্যমনে চেয়ে থাকে।

সাঁঝের বেলা

শুষনী শাক তুলতে গিয়ে খেতে সাপ দেখেছিল মেজোবউ। 'সাপ সাপ' বলে ধেয়ে আসছিল, বেড়ায় আঁচল আটকে ধড়াস করে পড়ল। পেটে ছ—মাসের বাচ্চা। তাই নিজের ব্যথা ভুলে পেট চেপে কোন সর্বনাশের কথা ভেবে কেঁদে উঠল চেঁচিয়ে।

রোদভরা উঠানে শান্ত সকালে নরম শরীর বলের মতো গুটিয়ে বসে আছে সাদা কালো কয়েকটা বেড়াল। টিপকলের ধারে বসে বাসন মাজছিল ঝি সুধা। তাকে ঘিরে ওপর—নীচে 'খা খা' করে ডাকছে কাক। বড়ো পাজি কাক এখানে, লাফিয়ে এসে খোঁপায় ঠোক্কর দেয় সুধার। আশ থেকে পাশ থেকে এঁটো—কাঁটা নির্ভয়ে খেয়ে যায়। কখনো বা সাবানের টুকরো, চামচ, ঠাকুরের ক্ষুদে প্রসাদের থালা—গেলাস মুখে করে নিয়ে যায়। এ—বাড়ি ও—বাড়ি ফেলে দিয়ে আসে। বাসন মাজতে বসে সুধার তাই বড়ো জ্বালাতন। বসে বসে সে কাকের গুষ্টির উদ্ধার করছিল, কেলেভূত, নোংরাখেকো, গুখেকো গুলিন, মর মর! ভগবানের ছিষ্টি বটে বাবা, যেমন ছিরি তেমনি স্বভাব! রোসো, কাল থেকে এঁটো—কাঁটায় ইঁদুর মারা বিষ না মিশিয়ে দিই তো—তা কাকেরা শোনে না। কাটা—ঘুড়ির মতো নেমে আসে। সুধার মুখের দিকে চেয়ে 'খা' বলে ডাকে, লাফিয়ে সরে যায়, আবার চেয়ে ডাকে 'খা'।

বাঙ্গালীয়া দুধ দিতে এসেছে। নোংরা ধুতি, গায়ে একটা নতুন সাদা ফতুয়া, কাঁধে নোংরা গামছা। অদ্ভুত দেখায় তাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গোঁফ চুমরাচ্ছিল। দুধের ডেকচি এখনও মাজা হয়নি। ঝামেলা। একবার ডেকে বলছিল, এই সুধারানি, বর্ত্তন ভৈল? কেতো সময় লাগে তুমার— হাঁ? শুনে সুধা ঝামড়ে উঠেছিল, থাম তো তুই খোট্টা খালভরা কোথাকার! আমি মরছি বটে নিজের জ্বালায়। বাঙ্গালীয়া একটু হেসে খৈনির থুক ফেলে বলে, কৌয়া তো খুব দিক করে তুমাকে? একঠো বন্দু মূলাও না।

বড়োবউ চায়ের কেটলি আঁচল চেপে নামিয়ে কৌটা খুলে দেখে চা পাতা নেই। কুমুকে ফের পড়া থেকে তুলে দোকানে পাঠাতে হবে, একটু আগে একবার দোকানে গিয়ে পাউরুটি আর ছোটো খোকার রসগোল্লা এনে দিয়েছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল বড়োবউয়ের। জানালা দিয়ে ধমক দিল সে, ও সুধা, কেবল বকবক করলে কি হাত চলে? বাঙ্গালীয়া কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তো আর বাড়ির গাহেক আছে না কি?

এই যে বড়োবউয়ের মেজাজ বিগড়ালে এর জের সারাদিন চলবে। একে—তাকে ওকে সারাদিন বকতেই থাকবে যতক্ষণ না আবার তার বর বিষ্ণুচরণের মেজাজ বিগড়োয়। বিষ্ণুচরণ ধৈর্য হারালে বড়োবউকে পেটায়। মেজো হরিচরণ আবার তেমন নয়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ বউকে দেখে। উঠানে হয়তো কাপড় মেলে মেজোবউ কলধারে একটু গেঞ্জি কাচতে যায়, কী চুল শুকোয় তখন হরিচরণ জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে কী কপাটের আড়ালে লুকিয়ে বউকে দেখে। কখনো কখনো আবার কোকিলস্বরে আড়াল থেকে বলে, কু—উ! সেই শুনে আবার বড়োবউয়ের বুক জ্বলে! বলে, এমন মাগীমার্কা ব্যাটাছেলে দেখিনি বাপু জন্মে। হরিচরণ আবার সেটা টের পায়, ডেকে বলে, বউদি গো, বউ আমার খাবে—দাবে বসে থাকবে শুধু তুলবে—পাড়বে বিছানা।

যতীন এখন বুড়ো হয়েছে। হোমিয়োপ্যাথির ফোঁটা ফেলতে হাত কেঁপে যায়। এক ফোঁটার জায়গায় দু ফোঁটা তিন ফোঁটা পড়ে গিয়ে ওষুধ নষ্ট। লোকে বলে, যতীন ডাক্তারের হাতের জোর নষ্ট হয়ে গেছে ছোটোছেলেটা মরার পর থেকে; ছোটোছেলে ব্রহ্মচরণ অবশ্য বাপের সুপুত্র ছিল না। দা—কুড়ুল দিয়ে বাপ—ভাইদের কাটতে উঠত প্রায়ই বাড়ির মধ্যে। মুখে আনতে নেই এমন মুখখারাপ করে গাল দিত! এ হল মেজাজের বাড়ি। সকলেই মেজাজওয়ালা মানুষ। ব্রহ্মচরণ আবার তার মধ্যেই ছিল নুনের ছিটে। সে মরায় এ

বাড়ির লোক বেঁচেছে। মরল কীভাবে কে জানে! নিরুদ্দেশ বলে রা উঠেছিল, তারপর একদিন ঝিলে তার শরীর ভেসে উঠল। সারা গায়ে ছোরার গর্ত! কোনো কিনারা হয়নি, কিনারা করার আগ্রহও নেই কারও। কেবল বুড়ো যতীন ডাক্তার আজকাল ঝাপসা দেখে, হাত কাঁপে, রাতে ঘুমোতে পারে না, উঠে উঠে বাইরে যায়, বিড়ি টানে, কাশে।

অভ্যাসমতো যতীন ডাক্তার তার বাইরের ঘরে ওষুধের বাক্স নিয়ে বসেছে। রুগিপত্র বড়ো একটা হয় না। দু—চারজন গল্পবাজ বুড়ো এসে বসে আড্ডা দিতে। আর আসে দীন—দরিদ্র দশ পয়সা দু—আনার বাকির খদ্দের কয়েকজন। সকালে একবাটি বার্লি গিলে যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতে বসে আছে। সামনে প্রায় ত্রিশ বছরের পুরোনো টেবিল তার উপর ত্রিশ বছরের পুরোনো ব্লটিং পেপার পাতা চিঠিগেঁথে রাখার স্ট্যান্ড, পিচবোর্ডের বাক্স, পুরিয়ার কাগজ রাখার কৌটো, আঠার শিশি, ওষুধের খুদে চামচ— এইসব রাখা। মাছি বসছে উড়ে উড়ে। যতীন—ডাক্তার ঘোলাটে চোখে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে ছিল। ঘরের সামনেই একটা সুরকির রাস্তা, রাস্তার ধারে একটা বাবলা গাছ। বালীর এ অঞ্চলে বাবলা গাছ বড়ো একটা দেখা যায় না। তবু কী করে বালী—দুর্গাপুরে একটা বাবলা গাছ হয়েছে। হলদেটে ছোটো ছোটো তুলির মতো ফুল ফোটে। বাবলার কচি পাতা চিবিয়ে বা রস খেলে পেটের ভারি উপকার, বাবলা গাছের ওপাশে আবার বাড়ির এক সার, আর ওপাশে রেলের লাইন। বর্ধমান কর্ড টিপ টিপ করে মাটি কাঁপছে, দূরে মালগাড়ির হাক্লান্ত ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠেছে। পৃথিবীতে আর কিছু দেখার বড়ো একটা নেই। ফাঁকা ঘরে মাছি উড়ে উড়ে বসছে, নাকের ডগায়, ভুরুতে জ্বালাতন করে খাচ্ছে একটা মাছি। যতবার উড়িয়ে দেয় ততবার এসে ঠিক ওইখানটায় বসে। মাছির বড়ো জিদ। আজ সকালে কেউ আসেনি। বড়ো ফাঁকা একা লাগছে। কমললতা ওই রাস্তাটা দিয়েই ফিরবে একটু বাদে। ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আজকাল জিজ্ঞেস করে যায়— কেমন আছো ডাক্তারবাবু।

যতীন ডাক্তার আজকাল আর উত্তর দিতে পারে না। কমললতার মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এসে যায়। বউ মরেছিল সেই কবে, তার মুখখানা মনেও পড়ে না আর। তিনটে নাবালক ছেলে নিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিল তখন। সে সময়ে রুগির ভিড় থাকত হামেহাল। বড়োবাজারের শেঠেদের দোকান থেকে ওষুধ এনে তা থেকে আবার ওষুধ তৈরি করা। এরারুটের গুঁড়ো বানানো, পুরিয়া করা— অনেক কাজ! ছেলেগুলি ধুলোয় পড়ে কাঁদত। সে সময়ে কমললতা যৌবনের গরবিনি। ঝিগিরি করত বটে, কিন্তু হাঁটাচলার ভারি একটা মোহ সৃষ্টি করে যেত। যতীন ডাক্তারের বাড়ি ঠিক শেয়ালে নে যাবে। যতীন ডাক্তারের তখন শেষ যৌবন। কমললতার দুটো হাত ধরে ফেলে বলল, আমার ছেলেগুলি তুই নিয়ে যা কমল। তাতে অবশ্য কমল রাজি হয়নি। তবে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলল সে। নিজের একটা অপছন্দের বর ছিল বটে কমললতার, সে উদো মানুষটা ইটখোলার কুলিগিরি, জুট মিলের চাকরি এসব করে—টরে অবশেষে সাধু হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে, কমললতার কাম দমন করার মতো পৌরুষ ছিল না বলেই সে নাকি লম্বা দিয়েছিল। তবে আসত মাঝে—মাঝে। বাইরে থেকে 'ওঁ তৎসৎ', 'ওঁ তৎসৎ' বলে চেঁচিয়ে জানান দিত। দরকারমতো এক—আধ রাত কাটিয়ে যেত বউয়ের সঙ্গে। আর তখন কমললতা বরকে যা—নয়—তাই বলে গুষ্টি উদ্ধার করে দিত। ত্রিশূল ভাঙত, দাড়ি ছিঁড়ত, কমণ্ডলু আছড়ে টোল ধরিয়ে দিত। কিন্তু তবু লোকটা সাধুগিরি থেকে মাঝে—মাঝে কী এক নেশায় মাস—দু—মাস বাদে এসে হাজির হত ঠিকই। সেই অপছন্দের লোকটাকে যেমন পাত্তা দিত না সে, তেমন আর কোনো পুরুষকেও দিত না। কিন্তু যতীন ডাক্তার তাকে কাবু করে ফেলে। তিনটি ফুলের মতো ছেলে ধুলোয় গড়ায়। কবে এসে হুলো বিড়াল গলার নলি কেটে রেখে যায়, দেখবে কে? ডাক্তারের বিয়ে করারও ফুরসত নেই আর একটা। আর দেবেই বা কে? কমললতা তাই একদিন ঠিকে থেকে স্থায়ী ঝি হয়ে গেল এ বাড়ির। প্রথম প্রথম আলাদা ঘরে ছেলেদের নিয়ে শুত সে। তারপর ব্যবস্থা পালটাল। ডাক্তারের সঙ্গে বিছানাটা এক হয়ে গেল একদা। লোকে কু বলত। কিন্তু বলা

কথায় কী আসে যায়। কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই কমললতা হয়ে গেল ডাক্তারের বউ! অবশ্য বউয়ের মতো থাকত না। ঝিগিরিই করত বরাবর! ছেলেরা নাম ধরে ডাকত, তুই—তোকারি করত।

বিশ—পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এই সংসারের সঙ্গে জান লড়িয়ে দিয়েছিল সে। ছেলে মানুষ করা, সংসার সামলানো, ডাক্তারির সাহায্য। সব। ঝিয়ের মতো থাকত, কিন্তু তার কথাতেই চলত সংসার। ডাক্তার সোনাদানা, শাড়ি কাপড় দিয়েছে ঢেলে, কখনো কুকথা বলেনি, আদর করেছে খুব। শরীর উসকালে রাতে জেগে বসে থেকেছে। সাধু অবশ্য এ সংসারেও হানা দিয়েছিল। সে কী চোটপাট হম্বিতম্বি, পুলিশের ভয় দেখানো! কিছু চেলা—চামুণ্ডা নিয়ে এসে হামলারও চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার ভয় খেয়ে গিয়েছিল। কমললতা ভয় খায়নি। শুধু একবার দু—চোখ মেলে খর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল সাধুর দিকে। তাতেই সাধুর বুক চুপসে যায়। আসত বটে তার পরেও, তবে ভিক্ষে বা সিধে নিয়ে যেত, আর কিছু চাইত না।

কমললতা ভেবেছিল, এরকমই দিন যাবে। একটা জীবন আর ক—দিনের। মানুষ তো টুকুস করে মরে যায়। কিন্তু দিন যায়নি। ছেলেরা বড়ো হয়ে বুঝতে শিখে আপত্তি শুরু করে। এরকম সম্পর্ক নিয়ে বাপের থাকা চলবে না। সম্মান থাকে না। ঝঞ্ঝাটের শুরু তখন থেকেই। সেটা চরমে ওঠে বড়োছেলের বিয়ের পর। বড়োবউ বিয়ের পর এ বাড়িতে ঢুকেই যেন সাপ দেখল। এক বছর ঘুরতে—না—ঘুরতেই বলতে থাকে, আমার বাবা বলেছে, এখানে রাখবে না। এ হচ্ছে নিশ্চরিত্র জায়গা, নরক। স্বামীর ঘর করার সুখের চাইতে বাড়িতে থাকার দুঃখেও সোয়াস্তি আছে। হরিচরণ আর বিষ্ণুচরণও খেপে গেল হঠাৎ। এক ব্রহ্মচরণ মা বলে ডাকত তাকে, সে বুক দিয়ে ঠেকাত। কিন্তু হাউড়ে ছেলে, বাইরে দাঙ্গাবাজি করে বেড়ায়, ঘরে থাকে কতক্ষণ? ডাক্তারও বুড়ো বয়সে ছেলেদের সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তবু ব্রহ্মচরণ বেঁচে থাকা অব্দি ছিল কমললতা! তারপর বেরিয়ে যেতে হল। ইটখোলার দিকে আবার ঘর নিয়েছে সে। বুড়োবয়সে সে এখন পাঁচবাড়ি ঠিকে ঝির কাজ করে খায়। একটি ছোট্ট বোনপোকে এনে রেখেছে, সেই দেখাশোনা করে।

মায়া তো যায় না। রোজ তাই বাইরে থেকে একবার কী দুবার খোঁজ নিয়ে যায় সে ডাক্তারের।

সারাদিন ওইটুকুরই অপেক্ষায় থাকে ডাক্তার। এই একা—ফাঁকা বিশ্বসংসারে ওই কমললতা ছাড়া আর কেউ বন্ধু নেই।

মাছিটা উড়ে উড়ে এসে ভ্রূতে বসছে। সুড়সুড়ি পায়ে নাক বেয়ে নেমে আসে। উড়িয়ে দেয় ডাক্তার। আবার টপ করে এসে নাকের ডগায় বসে। নড়েচড়ে হাঁটে। সকালবেলাটা কেমন আঁধার আঁধার মতো লাগে। নিঃশব্দ ঘরে শ্বাস পড়ে শ্বাস ওঠে। ভগবান।

হরিচরণ মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ করে। সকালে যেতে হয়। দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টায় মেজোবউ নারায়ণী কখনো কাছে যদি থাকে। ঠিক পালিয়ে বেড়াবে। নিজেকে দুর্লভ করার ওই হচ্ছে তার কলাকৌশল। পুরুষমানুষকে জ্বালাতন করে না খেলে আর ছেলেমেয়ের কাছা হয় না? দু—বার তিনবার 'ক—উ ক—উ' ডাক ডাকল সে। সেই ডাকে দুটো কাজ হয়। বউকে জানান দেওয়া হয়, আবার বড়োবউকে জ্বালানোও হয়। ডালশুখো আর কাঁচা পেঁয়াজ—লঙ্কা দিয়ে ফ্যানসা ভাত খেয়ে টকচা ঢেকুর তুলে হরিচরণ বিরক্ত হয়ে বসে থাকে। মুখখানা না দেখে বেরোই কী করে। দিনটাই খারাপ হয়ে যাবে। কুমু আর রাখু দাদার দুই ছেলেমেয়ে হল্লাচিল্লা করছে পাশের ঘরে। বিরক্তি। মেজাজ খারাপ থাকে শব্দ সহ্য হয় না। 'অ্যা—ই' বলে একটা ধমক দিল এঘর থেকে, লেখাপড়া ফেলে হচ্ছেটা কী? শব্দটা বন্ধ হলে আবার একটা 'কু—উ' ডাক ছাড়ে সে।

বড়োবউ বোধ হয় শুনতে পায়। খেঁকিয়ে ওঠে সুধাকে— তোমার আক্কেল দেখে মরে যাই। ইস্টিলের বাসন কেউ ছাই দিয়ে মাজে? দ্যাখো তো দাগ ধরে গেল কেমন?

হরিচরণ একটু হাসে। বড়োবউয়ের মেজাজ ভালো নেই। ডালশুখোটা আজ মেখেছিল নারায়ণী। একটু হিঙের গুঁড়ো দিয়ে তেলে উলটেপালটে বাসি ডালটার দিব্যি তার করেছিল। বড়োবউ খাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন ডালশুখো খাচ্ছো গো, মেজদা?

বেশ।

তার আর কথা কী। কথাতেই বলে— বউ রেঁধেছে মুলো, খেতে লাগে তুলো তুলো।

আসলে নারায়ণী নিজের হাতে বরের ডালশুখো করেছে বলে রাগ। হিন্দ মোটরের মেকানিক বিষ্ণুচরণ যখন সাঁঝের ঘোরে এসে আজ পেটাবে তখন কেঁদে—কেটে রাগ পড়বে।

কিন্তু বউটা যে কোথায় গেল?

মেজোবউ শাকের খেতে সাপ দেখেছিল। শুষনী শাক অযত্নে হয়ে আছে। এ সময়টায় জিভের স্বাদের কোনো ঠিক থাকে না। ফোটা ভাতের গন্ধে বমি আসে, আবার চামড়া পোড়া গন্ধ ফেলে বুক ভরে দম নিতে ইচ্ছে করে। এই শীত আসি—আসি শরৎকালটা বড্ড ভালো! আকাশ কেমন নীলাম্বরী হয়ে আছে। গাছপালার রং ধোয়ামোছা ঝকঝকে! রোদ এখন ওম লাগে।

শীত রোদে নিশ্চিন্তে দক্ষিণের বাগানে সুষনি শাক তুলছিল মেজোবউ। লোকটা এখন বেরোবে। ফুঁসছে। তবু এখন কাছে যাবে না সে। অত বউমুখো, মেনিমুখো কেন যে লোকটা! বড্ড লজ্জা করে নারায়ণীর। বিয়ের পর যেমন—তেমন ছিল, কিন্তু পেটে বাচ্চা আসার পর এখন চক্ষুলজ্জা বলে বস্তু নেই। দিনরাত পারলে হামলায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘাসজমি, আগাছার মধ্যে শুষনী পাতা ডাঁটা টুকুস টুকুস করে ছিঁড়ছিল। মাঝে—মাঝে চোখ তুলে দেখছিল চারিধারে। অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশ যেন নীল। গাছ যেমন সবুজ। দুটো—চারটে ঘুড়ি উড়ছে আকাশে, ওই উঁচুতে চিল। ছাতারে উড়ে যায় একটা। কালচে কুবো পাখি কালকাসুন্দের ডালে হাঁটছে। 'বুক বুক বুক বুক' করে একটা মন খারাপ—করা ডাক ডাকছিল একটু আগেই।

একটা টসটসে ডগা, ছিঁড়তে হাত বাড়িয়েই মেজোবউ ঘাসের মধ্যে চকরাবকরা দেখতে পায় প্রথমটায় যেন গা নড়ে না, পা চলে না। সারা গাঁয়ে শিরশিরানি। রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। লকলকে শরীরটা এঁকেবেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা ঘাসে হারিয়ে আবার জেগে উঠছে।

সাপ! সাপ! বলে চেঁচিয়ে বাগানের ফটক পার হতে গিয়ে আঁচল আটকে পড়ে গেল মেজোবউ! পড়ে কিছু টের পায় না। কোনো ব্যথা না, জ্বালা না। কেবল বুকটা হাহাকারে ভরে দিয়ে যায় এক আতঙ্ক। ছ—মাসের বাচ্চা যে পেটে! কী হবে ভগবান!

কেঁদে উঠে মেজোবউ।

বড়োবউ স্তম্ভিত হয়ে যায়। নড়ে না। দাঁড়িয়ে আবার থরথর করে বসে পড়তে থাকে ভীতু, বউ—সর্বস্ব হরিচরণ, কলকাতায় একটা বাসন আছড়ে ছুটে আসে সুধা। আর আসে কমু রাখু!

বাঙ্গালীয়া দুধ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। বালতিটা রেখে এসে প্রথম ধরে নারায়ণীকে। বলে ক্যা হুয়া? সাপ কাটা হ্যায় কিয়া!

বাঙ্গালীয়ার বেশি বুদ্ধি নেই। সে মেজোবউকে ছুঁয়েই বুঝতে পারে, রূপের আগুনে তার হাত পুড়ে গেল বুঝি। কী ফর্সা, কী নরম, কী সুন্দর! এরকমই হয় বটে বাবুদের বাড়ির মেয়েরা। নাকি বাঙালি বলেই নরম। নরম শনিচারী কিছু কম নয়। কিন্তু এ তো তুলো। তার ওপর নাক মুখ চোখ আর রঙের কী বাহার।

মেজোবউ তার হাত ছাড়িয়ে নিল। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে তবু বাঙ্গালীয়া। ঘাসজমিতে যেন পুজোর ফুল কে একরাশ ঢেলে দিয়ে গেছে! বউটিকে কতবার দেখেছে সে। ছোঁয়নি ছোঁয়ার পর সে যেন সব আলাদা রকম দেখে। হাতটা মেখে আছে নরম স্পর্শ।

হরিচরণ আসে। বড়োবউ এসে ধরে তোলে নারায়ণীকে। সুধা এসে মাজাটা ওর মধ্যেই একটু ডলে দেয়। বলে, ভালো করো, ভালো করো, ভালো করো ভগবান।

আশপাশ বাড়ি থেকে দু—চারজন এসে জুটে যায়।

সাপের দাঁতের দাগ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার রাস্তার দিকে চেয়েছিল অপলক। মাছিটা বড়ো জ্বালাচ্ছে। ভোরবেলাটা কেন আঁধার আঁধার লাগছে আজ? ডাক্তার একটা চিৎকার শুনতে পায়, 'সাপ সাপ'! চেয়ারে শরীরটা বাঁ ধার থেকে ডান ধারে মুচড়ে বসে ডাক্তার। পা—দুটো তুলে হাঁটু জড়ো করে বুকের কাছে। বাতাসে একটু শীতভাব। সময়টা ভালো না। কে চেঁচাল 'ডাক্তার ডাক্তার' বলে? না, ডাক্তার বলে নয়, 'সাপ সাপ' বলে। মেয়েছেলের গলা। কমল নয় তো!

মাথাটা ভালো লাগে না ডাক্তারের।

পেছনে জোর পায়ে শব্দ উঠে যেন। ডাক্তার ভয় খায় নাতি রাখুকে। মিষ্টি ওষুধের লোভে প্রায়ই এসে চুরি করে শিশিকে শিশি ফাঁক করে দেয়। অ্যাকোসিসের মাদার টিংচার একবার শিশিসুদ্ধ খেতে গিয়েছিল।

ডাক্তার পিছু ফিরে দেখে বেড়ালটা। হুশ হুশ করে শব্দ করে। বেড়ালটা সবজে চোখ মেলে তার দিকে চায়। ক্ষীণ একটা শব্দ করে। কমল এদের পালত—পুষত। দুটো কমলের সঙ্গে গেছে। আর দুটো রয়ে গেছে। কেউ পালে না, পোষে না, আদর করে না। এরা এমনি থাকে।

বাবা! একটা বুকফাটা চিৎকার করে কে ঘরে ঢোকে।

ডাক্তার চমকে ওঠে। মাথার মধ্যে একটা আলো যেন ঝলসে উঠেই নিভে যায়। মাছিটা ঠিক বসে আছে ভ্রুর মাঝখানে। নড়ছে হাঁটছে।

বাবা, শিগগির আসুন।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরায়, কে?

আমি হরি।

ও! চেঁচিয়ো না।

চেঁচাব না কী। আপনার বউমার কী হয়েছে দেখে যান।

তোমরা দাখো গে।

হরিচরণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর এই চরিত্রহীন অপদার্থ নাম ডোবানো বুড়োটার প্রতি তীব্র হিংস্র একটা আক্রোশ বোধ করে সে। দু—হাতে যতীনের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় সে।

কী বলছেন?

ওঃ! যতীন নাড়া খেয়ে ভারি ভয় পেয়ে যায়। মাথার মধ্যে লাল আলো নিভে একটা সাদা আলো জ্বলে। আবার সাদাটাও নিভে যায়।

শিগগির আসুন।

কোথায়?

আপনার বউমাকে সাপে কামড়েছে।

ভেতরে একটা হুলস্থুলের শব্দ হচ্ছে! সেই শব্দ থেকেই বড়োবউ গলা তুলে বলে, সাপে কামড়াল কোথায়! কামড়ায়নি! পড়ে গেছে বাপু।

হরিচরণ বাবাকে একটা খোঁচা দেয়, পড়ে গেছে। বাচ্চাটা নষ্ট হতে পারে।

আসুন।

পড়ে গেছে! যতীন বড়ো বড়ো চোখ করে চারদিকে চায়। শালার মাছিটা। ঠিক বসে আছে এখন নাকের ডগায়। ছাড়ছে না। যতীন বলে, কী করব!

একটু দেখুন।

ডাক্তার ডাকো।

ডাকতে পাঠিয়েছি। সে তো দু—মাইল দূর থেকে আসতে যেতে তিন ঘণ্টা। তার মধ্যে কিছু যদি হয়ে যায়।

ডাক্তার ভাবে ওষুধের নাম কিছুই মনে পড়ছে না। অনেক ভেবে বলে, থুজা টু হানড্রেড।

কী বলছেন?

উহুঁ। ডানদিকে ব্যথা তো? লাইকোপোডিয়াম দেওয়াই ঠিক হবে।

ডানদিকে না কোনদিকে কে জানে। আপনি আসুন।

ছেলের দিকে ভীত চোখে চেয়ে থাকে ডাক্তার। বলে, আমি কিছু জানি না বাপু, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

তার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে হরিচরণ বলে, তা বলে একবার চোখে এসে দেখবেন না। আপনারই তো ছেলের বউ।

বিড়বিড় করে ডাক্তার বলে, ছেলে না ইয়ে। তোমরা আমার কেউ না। বলতে বলতেও ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। হ্যাঁচকা টানে বুকের বাঁদিকে একটা খিঁচ ব্যথা ওঠে। মাথাটা দুটো টাল খায়। আলোটা দপ করে জ্বলে ফুস করে নিভে যায়।

ভিতরের ঘরে লোকজন জুটেছে মন্দ নয়। মেজোবউ শুয়ে আছে খাটে। কোঁকাচ্ছে। শ্বাসকষ্টের কোঁকানি, চোখের তারা স্থির। মুখে গাঁজলার মতো কষ গড়াচ্ছে।

বিড়বিড় করে যতীন ডাক্তার বলে, নাক্স ভমিকা টু হানড্রেড! শিগগির।

হরিচরণ ছুটে যাচ্ছিল ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে, না ভুল।

তবে?

সালফার থার্টি।

কীসব বলছেন?

ভুলে যাই যে বাবা।

হরিচরণ কী করবে ভেবে পায় না। হাঁ করে চেয়ে থাকে অপদার্থ বাপের দিকে। যতীন ডাক্তার বিড়বিড় করে বলে, পুত্র আর মূত্র একই পথ দিয়ে আসে। বুঝলে? পুত্র যদি পুত্রের কাজ না করে তো মূত্র। না কী?

কথাটা অবশ্য হরিচরণের কানে যায় না। কিন্তু সে লক্ষ করে এই দুঃসময়েও তার বাবা বিড়বিড় করে বকছে। এরকম কখনো করত না তো বুড়ো! পেগলে গেল নাকি!

বাঙ্গালীয়া বাঁহাতের খৈনির গুঁড়োর ওপর ডান হাতে একটা আনন্দিত চাপড় মারে। কনুইয়ের ভাঁজ থেকে দুধের খালি বালতি ঝুলছে, মনে অনেক আশ্চর্য আলো এসে পড়েছে আজ। ভারি অন্যমনস্ক সে। একটা দেশওয়ালি গান গুনগুন করে গায় সে। হাতে একটা নরম স্পর্শ লেগে আছে এখনও।

কমললতার সঙ্গে দেখা।

ক্যায়া হো কমলাদিদি।

ও বাড়িতে কী হয়েছে রে বাঙ্গালু?

সাপু কাটা নেহি। গিরে পড়ল।

কে?

বহুজি। যান না, দেখিয়ে আসেন।

বিপদে বারণ নেই। কমললতা তাই এদিক—ওদিক একটু দেখে নেয়। ভয় করে। পঁচিশ বছর কাটিয়েও ভয়। তবু সে ঢুকে পড়ে।

কী হয়েছে?

বলে সে সোজা ঘরে ঢুকে যায়। কেউ কিছু বলে না, বারণ করে না। সাহস পেয়ে কমললতা বিছানার কাছে উপুড় হয়ে দেখে নারায়ণীকে। মুখটা তুলে বলে, বড়োবউমা একটু গরম জল করো, আর মালসায় একটু আগুন। এ কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।

কেউ কিছু বুদ্ধি খুঁজে পাচ্ছিল না। কমললতার কথায় যেন বিশ্বাস খুঁজে পায় সবাই। বড়োবউ ধেয়ে রান্নাঘরে। চোখের জল মুছে, উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে জল চাপায়।

কমললতা সাহস পেয়ে মেজোবউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে হাওয়া করে।

বহুকাল বাদে নিজের হারানো জায়গাটা যেন পেয়ে গেছে কমললতা।

হরিচরণকে ডেকে বলে, তোর বাপের ঘর থেকে অ্যালকোহল দশ ফোঁটা একটু গরম দুধে দিয়ে নিয়ে আয়।

হরিচরণ কমললতার দিকে একপলক চায়। চোখে কী ফোটে কে জানে।

তারপর বাপের ঘরের দিকে চায়!

যতীন ডাক্তার খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল। মেজোবউয়ের দিকে নয়।

মেজোবউ বা পৃথিবী আর কিছুর কোনো অস্তিত্ব তো নেই। সে চেয়েছিল কমললতার দিকে। কাম কবে মরে গেছে, যৌবনের প্রেম বলতে কিছু নেই এখন। কিন্তু বুক জুড়ে আছে সহবাস। সে বিড়বিড় করে ডাকে, কমল, কমল, কমল বড়ো একা ফাঁকা জগৎ। থাকো। এখানেই কেন থাকো না! থাকো।

কমললতা যতীনের দিকে চায়। বুড়োটার চোখ ঘোলাটে লাগে যে? বিড়বিড় করে কী বকছে। আহা, ওরা কী আর যত্ন করে?

সন্ধের দিকেই ঠিক হয়ে যায় মেজোবউ। ডাক্তার দেখে গেছে। বলছে, গাইনির ডাক্তার দেখাতে। তবে ভয় নেই। বিকেলের দিকে মেজোবউ ওঠা—হাঁটাও করল খানিক। চুল বাঁধল, হাসল। হরিচরণ গেছে কলকাতা থেকে বউয়ের জন্য বলকারী ওষুধ আনতে।

সারাদিন কমললতা আজ এ বাড়িতে রয়ে গেল। মেজোবউয়ের কাছেই রইল বেশিক্ষণ। যতীন ডাক্তার ডিসপেনসারিতেই আগাগোড়া বসে আছে আজ। ভাত খেতে বসে অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল দুপুরে। শরীরটা খারাপ না কি!

কমললতার বুকের মধ্যে কেমন করে। তিন—চার দিন আগে খবর এসেছে, সাধু মানুষটা মরেছে কুলটির হাসপাতালে। একটু কেঁদেছিল কমল। কান্নাটা মেয়েদের রোগ, নইলে সে মানুষের জন্য কান্নাই কী, দুঃখই কী! কমললতা ভালোবাসা যা পেয়েছে তা এই যতীন ডাক্তারের কাছে। কাছে যাবে সে উপায় নেই। কে কী বলে। বাড়ি থেকে বেরই করে দিল হয়তো। এ বাড়ির বাতাসে শ্বাস না নিয়ে বুক মরুভূমি হয়ে থাকে। সাধুটা মরে গেল! ডাক্তারও কেমন যেন করছে। তাই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না আজ। মেজোবউয়ের সেবার নাম করে সারাটা দিন থেকেছে। বড়োবউ ডেকে দু—মুঠো খাইয়েছে দুপুরে। সে কথা ভাবতেই মনটা ভালো লাগে।

সন্ধের পর একটু ফাঁক পেয়েই কমললতা বুড়োমানুষটার ঘরে আসে।

ডিসপেনসারি থেকে উঠে এসে কখন বিছানায় শুয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় কমললতার মুখের দিকে চাইল। বলল, মাছিটা কেবল বসছে।

কোথায় মাছি?

কপালে। সকাল থেকে উড়ে উড়ে বসছে!

কমললতা কপালটা দেখে। বলে, নেই তো।

আছে।

কমললতা যতীন ডাক্তারের মুখখানা দেখে ভালো করে। চোখ ঘোলা আর লালচে। শ্বাস গরম। কপালে হাত চেপে ধরলে বোঝা যায়, শিরার মধ্যে রক্ত লাফাচ্ছে।

কমল বলে, আমি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

তুমি থাকো।

থাকার জো কী? বিষ্ণুচরণ এলেই তাড়াবে।

না। তুমি থাকো।
আচ্ছা। শরীরটা কি খারাপ।
না। বড়ো একা লাগে।
একা কেন? সবাই রয়েছে।
কেউ নেই।
কমললতার চোখে জল আসে। গাল বেয়ে নামে। নাকে সর্দি টানার একটা শব্দ হয়। একটা গাঢ় শ্বাস ফেলে সে। সংসার বড়ো মায়াহীন।
ডাক্তার দেখে কমললতা চাঁদকে লণ্ঠনের মতো ধরে আলো দেখাচ্ছে। ডাক্তার ওঠে। বলে, দাঁড়াও ওষুধ বানাচ্ছি।
বানাও।
এ ওষুধে দু—জনের সব সেরে যাবে, বুঝলে কমল?
জানি। তুমি ধন্বন্তরী।
ডাক্তার জ্যোৎস্নার লণ্ঠনে কমললতার সঙ্গে পথ চিনে বাগানে যায়। ফুলে তুলে আনে চুপিচুপি ডিসপেনসারিতে ঢোকে দু—জনে। ডাক্তার একটা ঝিনুকে ফুল টিপে মধু ফেলে ক—ফোঁটা। একটু জ্যোৎস্না মেশায়। একটু চোখের জল তার সঙ্গে।
আর দু—ফোঁটা অ্যাকসিস।
অমৃত। ঝিনুকটা তুলে ডাক্তার বলে।
জানি।
দু—জনে খাই, এসো।
স্বপ্নটা ভেঙে যায়। ডাক্তার জাগে। কেউ কোথাও নেই। মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা সব বোধ গুলিয়ে দেয়।
যতীন ওঠে। তারপর শূন্য ডিসপেনসারিতে গিয়ে ঢোকে। অন্ধকার। খোলা জানালা দিয়ে দুধের মতো জ্যোৎস্না ভেসে যাচ্ছে ঘর।
আধছায়ায় যতীন ডাক্তার উলটোদিকের চেয়ারটায় গিয়ে বসে। তারপর নিজের বসা শূন্য চেয়ারটার দিকে বলে, ডাক্তারবাবু, আমার বড়ো অসুখ। বড়ো অসুখ।
হরিচরণ তখন বউকে জড়িয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে হাতে—পায়ে বেঁধে রেখেছে। নারায়ণী ঘুমের মধ্যে ঠেলা দিয়ে বলে, আঃ, দম আটকে মারবে নাকি বাপু?
হরিচরণ ঘুমচোখে বলে, তুমি যা দুষ্টু হয়েছ।
উঃ, সরো বাপু। গরম লাগছে।
হরিচরণ বলে, তোমার জন্যে সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি।
নারায়ণী পাশ ফিরে বলে, ইঃ।
তখন হামলে তাকে আদর করতে থাকে হরিচরণ। বাধা মানে না।
বিষ্ণুচরণ বউয়ের গা—ঘেঁষা ভাব পছন্দ করে না। লাইনের ওধারে তার আবার মেয়েছেলে রাখা আছে। এক কাতে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে বউ বলল, কমল কিন্তু অনেক সেবাটেবা করেছে।
করুগগে। আর ঢুকতে দিয়ো না।
মায়া পড়ে গেছে তোমাদের ওপর।
হুঁ। শেষমেষ বাড়ির অংশ চাইবে। তা ছাড়া কলঙ্ক। আপদ যখন বিদেয় হয়েছে, আর না।
কোলেপিঠে করেছে তোমাদের।
খুব দরদ যে!
বলছিলাম মাঝেমধ্যে আসে যদি আসুক।

উহুঁ। ফের যদি ঢুকতে দাও তোমার কপালে কষ্ট আছে।

কিন্তু ওকে ছাড়া বুড়োমানুষটা যে থাকতে পারে না।

বিষ্ণুচরণ ঝাঁকি মেরে ওঠে, পারে না! অ্যাঁ। এই বুড়ো বয়সেও রস আছে নাকি? ভয় খেয়ে বড়োবউ চুপ করে যায়।

ডিসপেনসারি থেকে উঠে নিজের ঘরে আসে যতীন। আবার ডিসপেনসারিত যায়। তারপর বেভুল হয়ে এ—ঘর ও—ঘর ঘুরতে থাকে হারানো শিশুর মতো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদে। মাছিটা উড়ে উড়ে বসছে ভ্রূতে, নাকে, কপালে সুড়সুড়ি পায়ে হাঁটছে, যতীন ডাক্তারের চারধারে পৃথিবীর রহস্যটা গুলিয়ে ফেলতে থাকে। চাঁদের আলো, গাছপালা, ঘরদোর— সবকিছুই অবোধ চোখে দেখে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, কমললতা মা, মা গো, কমলমা, মাছিটা তাড়িয়ে দাও... মাছিটা তাড়িয়ে দাও... মা...

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়।

তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সিটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর—ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্যসব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সিটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কন্ডাকটার ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো—ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরও সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, জামা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশো হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবে না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায়নি তো। এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কনডাক্টারকে দু—কথা শুনিয়েছে, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ—দুঃখ বুঝলে না। আমাদের কি গোরু ছাগল পেয়েছ, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরও ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনও সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না! বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড়ো ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ—কিছু লোক নেমে যাবে। হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একবারে সুনসান হয়ে যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়? জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছেও না। নতুন নতুন কারণে—অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালোমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার জন্য আহা, উহুঁ করার আছে কে দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই এখন ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাস্টিকের চটি পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা—টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ার আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম।

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতে তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি?

কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? উপরের শিক ভালো করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুর গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে, সামনেই এত বড়ো কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু—জোড়া চোখ থাকলে ভালো হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড়ো আঁচিলটা এখনও দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরও ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দু—খানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপকাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিয়ে কে একজন জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কী যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়।

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যতসব মেনিমুখো পুরুষ। বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কনডাক্টর।

বাস থেমেছে। হুড়হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে আছে। সর্বনাশ। বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড়ো বড়ো চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পটাপট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কী গো? এমন সুযোগ আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল বাসের সুমুখদিকে খগেনবাবু। তাকিয়ো না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা—চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু—একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড়ো বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন একটু তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়। কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দোঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছো নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটোলোক আর বলে কাকে!

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশিরভাগ পা—ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক—ফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমাটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে—মাঝে। মেয়েমানুষ কোনোকালে কথা শুনবে না। হাঁ—হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরও কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছ কচুর উপর। কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কী যায় আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে। এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বললে, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্যে একেবারে আঁকুপাঁকু যে। দু—দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কী যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, অছে, আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাক।

খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনছে। ভারি লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখনি তো! জুঁই বলে।

জ্বলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কী করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো। একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে! বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে—খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কনডাক্টর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড়ো ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমন কী কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও পেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভালো চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলেছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখ। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবড্যাবে চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো!

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছ। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মন হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটুলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক—চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ে খাল। পুরোনো পোল দু—বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কী হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে। নতুন নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনও দেখছে। বিরক্তি কেটে এবার একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই। চার—পাঁচ বছর সুখে—দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্চাকাচ্চা হয়েছিল না ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধ হয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নীচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে!

হোক না! দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য! নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখেনি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে।

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম।

মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বল তো! বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জান, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কী? মেয়েমানুষের কত রকম মরণ আছে, জান?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হৈ—রৈ নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নীচু হয়।
কী বলছ?
কারা নামল?
কী করে জানব? কত লোক নামছে উঠছে। কেন?
ওরা কিনা?
জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন।
এদিকে পিছন ফেরানো। ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।
দেখতে চাইছ কেন?
দেখি না কীরকম।
ভালোই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভালো মেয়েছেলেই পাবে। তুমিও তো খারাপ ছিলে না।
আমি তো কালো।
রংটাই কি সব?
জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে কর্তা অবশ্য কোনোদিন কালো বলেনি। বরং বলত, মাজা রংই আমার পছন্দ।
এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।
কী জানি।
আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তো।
না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।
দুর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।
জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে—মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।
এই করতে করতে বাসটা থেমে এল প্রায় কনডাক্টর ছোকরা তেজি গলায় চেঁচাল, বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।
ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম দুড়ুম করে লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!
জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফর্সা। খুব ফর্সা। বুঝলে।
কে?
বউটা।
হোক না। তাতে তোমার কী?
জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কী!
সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরেসুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফর্সা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছর—খানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিল। বলল, সাবধানে নেমো।
জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছ! কী সুন্দর নাদুসনুদুস।
আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সিটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল নাকি?
জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই

করেছে তাহলে।
করবে না কে? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?
জুঁই মাথা নেড়ে ভালো মানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।
দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে।
ভিড়ে ভিড়াক্কার।
তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফর্সা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।
খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।
সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নীচে ভরা বর্ষার খাল গোঁ—গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।
উরে বাবাঃ! বলে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।
একটা খোকা কেঁদে উঠল হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে। আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।
জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ।
দু—জনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কী? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দু—জনকেই এগোতে হল।
সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছনবাগে।
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারেনি।
জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়েছে। কিছু দেখছে না যেন।
কিছু বলছ?
বললাম, কপালটা ভালো। আমাদের চিনতে পারেনি।
বউটাকে দেখলে ভালো করে?
ও আর দেখব কী? রংটাই যা ফর্সা।
জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।
থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড়ো বড়ো চোখ নয়।
তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছ, দেখলে কখন?
দেখেছি।
ছাই দেখেছ। বউটা সুন্দরীই।
আমার চোখে লাগল না।
জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দেখ ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।
দু—জনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।
পথ ছেড়ে দু—জনে ঘাসজমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।
দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ—বাচ্চা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নীচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে তাতে সুন্দর দেখানোর কী আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড়োবউয়ের জিম্মায় আছে। বড়োবউ আবার বেশিক্ষণ জুঁইয়ের বাচ্চা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজের তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চল চল। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াব! বল কী? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না, সামনে আদিগন্ত খোলা হা—হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোটো স্যুটকেস।

কনডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর....নলতাপুর....চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড়ো বড়ো চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনোকালে দেখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। তে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারেনি?

বরাতজোর আর কাকে বলে! চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বল তো!

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কী হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কী করে?

দেখেইনি ভালো করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকল।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনার কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম উঠে বুঝলাম, একেবারে কর্তার পিঠের উপর....

ওঃ, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখ! কতকাল পর....

কী কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায় মেয়েমানুষটা যত ফর্সাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কী করে?

বলছি। জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চল তো। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কনডাক্টর ওই হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দেখ চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাব।

উরে বাস! বলো কী। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাব না। দেখব।

কী দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাব।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না।

একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোর মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চিঠি

ভুতটাকে আমি দেখেছিলাম পুরোনো পোস্ট অফিসের বাড়িতে। সেই থেকে ভূতের গল্পটা সবাইকে বলে আসছি, কেউ কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ কেউ করছে না। নদীর একটা দিক ভাঙতে ভাঙতে শহরের উত্তর দিকটা অনেকখানি গিলে ফেলল। পুরোনো পোস্ট অফিসের বাড়িটা থেকে যখন আর মাত্র বিশ গজ দূরে জল, তখনই প্রমাদ বুঝে সরকার তরফ অফিসটা শহরের মাঝখানে তুলে আনেন। পুরোনো বাড়িটা নদীগর্ভে যাওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে একা পোড়োবাড়ির মতো দাঁড়িয়ে রইল, তার বিশ গজ দূর নদীর পাড় আরও খানিক ভাঙল। আরও খানিক। আরও খানিক। ভাঙতে ভাঙতে একদিন সেই জল এসে বাড়ির ভিত ছুঁয়ে ফেলল। তলা থেকে ধুয়ে নিয়ে গেল মাটি। কিন্তু সেসময়ে বর্ষার পর জলে মন্দা লেগে যাওয়ায় সে বছরের মতো পুরোনো পোস্ট অফিসের বাড়িটা বেঁচে যায়। কেবল নদীর দিকটায় ভিতের জোর কমে যাওয়ায় একটু কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বারান্দার দুটো মোটা থাম ভেঙে ছাদের একটা অংশ নেমে এসে আড়াল দিল। নৌকা বেয়ে নদী দিয়ে যেতে যেতে চেয়ে দেখলে মনে হত, ঠিক যেন নতুন বউ ঘোমটা দিয়েছে লজ্জায়, যেমন নতুন বউরা ঘাটে এসে নৌকা দেখলে দেয়।

ওই ভাবেই রয়ে গেল বাড়িটা, কেউ সে বাড়ির দখল নেয়নি। কেবল তার জানালা—দরজাগুলি গরিব—গুর্বোরা খুলে নিয়ে গেল, কিছু আলগা ইট নিয়ে গেল লোকজন। কিন্তু পিসার হেলানো স্তম্ভের মতো সেই হেলা—বাড়িতে কেবল নদীর বাতাস বইত দীর্ঘশ্বাসের মতো, আর ছিল বাদুড়, ইঁদুর, চামচিকে, সাপখোপ আর উদ্ভিদ। গাছের জান বড়ো সাংঘাতিক, তারা ভিত ফাটিয়ে গজায়, দেয়ালে শেকড় দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফেলে। তা এরাই সব ছিল, আর কেউ নয়।

তখন আমি ছোটো, বছর সাত—আটেক বয়স হবে। সে বয়সটার ধর্মই এই যে, পৃথিবীর সবকিছু হাঁ করে দেখি, সব কথা হাঁ করে শুনি। কিছু বোকা—সোকাও ছিলাম। বড়োরা কেউ সঙ্গে না থাকলে যেখানে সেখানে যাওয়া বারণ ছিল, যাওয়ার সাহসও ছিল না।

তখন দাদু বিকেলবেলায় প্রতিদিন একহাতে আমার হাত আর অন্য হাতে লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরোত। সবদিন একদিকে বেড়ানো হত না। তবে প্রায়দিনই আমরা নদীর পাড়ে যেতাম। নদী শহরের ভিতর ঢুকে এসেছে, কাজেই বেশি দূর যেতে হয় না। একটু হাঁটলেই নদী। শহর বাঁচানোর জন্য বাঁধের ব্যবস্থা হয়েছে। চাঁই চাঁই পাথর, মাটি সব ফেলা হচ্ছে। শীতকাল তখন, বিশাল, বিস্তীর্ণ চর ফেলে নদী আবার অনেকটা উত্তরে সরে গেছে। সে চরের মাটি চন্দনের মতো নরম, তার উর্বরতা খুব। সেই মাটিতে বিষয়ী বিচক্ষণ লোক চাষ দিয়েছে, জমির কোনো দাবিদার নেই। যে চষে তার। চমৎকার গাঢ় সবুজ সব ফসলের সতেজ চেহারা নদীর মারকুটে ভয়ংকরতাকে ঢাকা দিয়েছে, সেই ফসলের জল জোগান দিয়ে তিরতিরে নদীটা বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ তিন চারটে ধারায়।

আমি আর দাদু সেই নদীর পাড়ে দাঁড়াতাম, দাদু লাঠিটা তুলে দূরের দিকে দেখাতেন। বলতেন, ওই যে কাকতাড়ুয়া কেলেহাঁড়ি দেখছ ওইখানে ছিল একটা বহু পুরোনো ডুমুর গাছ। ওর তলায় পঞ্চাশ—ষাট বছর আগেও রাম পণ্ডিতের পাঠশালা ছিল। আর ওই ডালের খেতে একটা খোড়ো ঘরও ছিল ডাকাতে কালীবাড়ি। এখন দেখে বোঝাই যায় না, ওই নদীর উপর দিয়ে একটা সুরকি বাঁধানো সড়ক গিয়েছিল জমিদারবাড়ি তক।

শহরের অনেকটা অঞ্চল হারিয়ে গেছে। এই অংশটুকুতে ছিল বসত, ইস্কুল, মন্দির, রাস্তা।

সেইটুকুই সব নয়, তার সঙ্গে অনেকের বাল্য ও কৈশোরের নানা স্মৃতিচিহ্ন। কত পুরোনো গাছ, পাথর, ঘাট—আঘাটা।

দাদু নদীর ধারে এলে কিছুক্ষণ আমাকে উপলক্ষ্য করে সেসব পুরোনো স্মৃতির চিহ্নগুলির স্থান নির্দেশ করার চেষ্টা করতেন। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নতুন ঘাট তৈরি হয়েছে, সেখানে নৌকো বাঁধা। দাদু কখনো সেই ঘাটের কাছে গিয়ে ঝিম হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর একদিকে লাঠি, অন্যধারে আমি।

বাঁ ধারে, অনেকটা দূরে পুরোনো পোস্ট অফিসের রহস্যময় হেলা বাড়ি দেখা যেত। জানালা—দরজার প্রকাণ্ড হাঁ—গুলি শোকার্ত চোখের মতো চেয়ে আছে সজীব পৃথিবীর দিকে। ভেতরের অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। সামনের বর্ষায় যদি বাঁধ ভাঙে তো তার পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হবে। বাঁধ না ভাঙলেও হেলাবাড়ি নিশ্চয়ই ওইভাবে রেখে দেবে না লোকে। ভেঙে ফেলবে। মুমূর্ষু বাড়িটা এই সত্যটা বুঝতে পেরেছিল। সে তাই অজানা মানুষের কাছে তার মৃত্যুর সংবাদ পাঠাত ওইসব অন্ধকার চোখের ভাষায়।

বিকেল ফুরিয়ে এলে আমরা নিঃশব্দে উঠে আসতাম।

একদিন ওইভাবে দাদু ধ্যানস্থ। নদীর ওপর শীতের শেষবেলার একটা অদ্ভুত আবছা আলো পড়েছে। ফসলের খেত নিস্তব্ধ নিঃসাড়। একটা কুয়াশার গোলা নদীজল থেকে উঠে আসছে। ঘাটে জনহীন নৌকো বাঁধা। জলে স্রোত নেই, শব্দ নেই।

সেই বয়সের যা স্বভাব। আমি উঠে কিছুদূর একা একা হাঁটলাম। কাঁকড়ার গর্ত, মানুষ ও পশুর মল পড়ে আছে, বিজবিজে কাঁটাঝোপ সর্বত্র। জলের একটা পচাটে গন্ধ শীতের বাতাসকে ভারী করে তুলছিল। একটা লাল বল গড়িয়ে গড়িয়ে পায়ে পায়ে নিয়ে আমি, আস্তে আস্তে ছুটছি। কখনো দাঁড়াচ্ছি। দাদুর দিকে ফিরে দেখি, দাদু তেমনি বসে আছেন। সাদা লাঠিটা দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

কোথায় একটা ইশারা ছিল। একটা ইঙ্গিতময় ষড়যন্ত্র! নদীর ভাঙা পাড় বেয়ে নেমে গিয়ে জল ছুঁয়ে শীতভাব টের পাই। বলটায় নোংরা লেগেছিল। সেটা জলে ধুয়ে উঠে আসছি, ঠিক সেসময়ে মুখ তুলে দেখি, ঠিক মাথার উপরে হেলা বাড়িটা ঝুলছে। ভিতের থেকে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে একটা ঝুল বারান্দার মতো ঝুলে আছে সে, ঝুঁকে আমাকে দেখছে।

এত কাছ থেকে ওভাবে বাড়িটাকে দেখেনি কখনো। দাদুকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, বিকেলের হালকা অন্ধকার তাঁকে ঢেকে ফেলেনি তখনও। সাদা লাঠিটা তখনও ঝলকাচ্ছে। মুখ তুলে বাড়িটা আবার দেখি। বাড়িটার মাথার ওপরে একটা ফ্যাকাশে চাঁদ।

ভূতটাকে তখনই দেখতে পেলাম।

কথাটা কিছু ভুল হল। ভূতটাকে আসলে আমি দেখেছি কি? বোধহয় না। দেখা নয়, ভূতটাকে তখনই টের পেলাম।

নদীর দিক থেকে কখনও হাওয়া দেয়। দমকা হাওয়া! একবার শ্বাস ফেলেই চুপ করে যায়। চাঁদের আলোটা তক্ষুণি একটু ঢেকে দিল কুয়াশা এসে। ঘোমটা খুলে বাড়িটা তখন চারধারে চেয়ে দেখে নিল একটু।

পায়ে পায়ে আমি খাড়া পাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। কোনো কারণ ছিল না, কেবল মনে হল একটু বাড়িটা দেখে আসি তো।

কিন্তু দেখার কিছু ছিল না, চারধারে ভাট আর শ্যাওড়ার জঙ্গল, বিছুটির পাতা ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। দু—একটা বড়ো নিমগাছ, এসব পার হয়ে অন্ধকার জানালা—দরজার কাছে গেলে দেখা যায়, ভিতরে গভীর অন্ধকার, ধুলোর ধূসরতা, চামচিকে ডেকে ওঠে। একটা বাদুড় ডানা ভাঁসয়ে শূন্যে ঝুলে পড়ে আচম্বিতে। দাঁড়িয়ে থাকি। অন্ধকার সয়ে আসে চোখে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখতে পাই বড়ো ঘরটার মেঝেয় একটা চিঠি পড়ে আছে। একটা চিঠি। আর কিছু নয়।

একটার—পর—একটা বাদুড় অন্ধকারের আভাস পেয়ে জানালা—দরজা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ঝুলে পড়ছে নদীর ওপরকার শূন্যতায়। ব্যস্ত চামচিকেরা ডাকছে পরস্পরকে। পুরীষ—গন্ধ নাকে এসে

লাগে। দাঁড়িয়ে থাকি! একটা চিঠি পড়ে আছে ঘরে।

কার চিঠি? কাকে লিখছে? কে ফেলে গেল ওইখানে?

একসঙ্গে অনেকগুলি শব্দ ওঠে। নিমগাছে ফিসফিস হাওয়া কথা কয়। তক্ষক ডেকে ওঠে নিজস্ব ভাষায়। বাড়িটার ভিতরে নীচে অদৃশ্য জলের শব্দ হয়। কার চিঠি! কার চিঠি!

দাঁড়িয়ে থাকি। চিঠিটা পড়ে আছে ধুলোয়। সাদা, চৌকো।

সন্ধে হয়ে এল। আলো জল থেকে তুলে নেয় তার শরীর। নদীর পরপারে ঘোর লাগা অন্ধকার। বেলা যায়।

কথা হয়। সে কেমন কথা কে জানে! কিন্তু তবু জানি, চারধারে কথা হয়। গাছের, জলের, বাতাসের, কীটপতঙ্গের। প্রাণপণে তারা করে বার্তা বিনিময়। সেরকমই একটা কথা চারধারে তৈরি হতে থাকে।

হঠাৎ উত্তর পাই— তোমরা, নাও।

প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘরের মেঝেয় চিঠিখানা পড়ে অছে। সাদা, চৌকো। তুলে নাও। ও চিঠি তোমার জন্যই পড়ে আছে।

আমার চারধার অপেক্ষা করছে, দেখছে। চিঠিটা আমি তুলে নিই কিনা।

আমি নিলাম না।

দাদু দূর থেকে ডেকেছিল, কোথায় গেলে ভাই?

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মাথা নেড়ে বললাম, না নেব না।

উত্তর পেলাম, যেখানেই থাক, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক, একদিন—না—একদিন এই চিঠি ঠিক তোমার ঠিকানা খুঁজে যাবে। চিঠি পাবে, চিঠি পাবে!

ভূতটা আমি দেখেছিলাম সেই প্রথম ও শেষবার, পুরোনো পোস্ট অফিসের বাড়িতে। ঠিক দেখা একে বলে না। অনুভব করা। একটা প্রকাণ্ড ঘর, ধুলোটে মেঝে, একটা সাদা চৌকো চিঠি পড়ে আছে।

ভয় করে না। তবে চোখে জল আসে কখনো। বয়স হল। কবে সেই শহর ছেড়ে চলে এসেছি। কতদূরে। কিন্তু ঠিক জানি, চিঠি পাব। চিঠি পাব।

অপেক্ষা

মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানালার চৌকাঠে। দু—হাতে ধরে আছে জানালার শিক, শিকের ফাঁকে মুখ গলানো। তার বাবা ফিরতে দেরি করছে। বাবা ফিরলে তারা সবাই দোকানে যাবে। আজ ফ্রক কেনা হবে পুজোর। কিন্তু বাবা ফিরছে না।

পাঁচ বছরের মেয়ে, সব কথা কইতে পারে। হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কটা বাজে মা?

মেয়ের মা সেলাই মেশিন থেকে মুখ তুলে ঘড়ি দ্যাখে। সাতটা, মানুষটা এত দেরি কখনো করে না। বড্ড মেয়ে ন্যাওটা। বউ ন্যাওটা মানুষ, অফিসের পর আড্ডা—টাড্ডা দেয় না বড়ো একটা। দিলেও আগে—ভাগে বলে যায় ফিরতে দেরি হবে। সরকারি অফিস, তাই ছুটি—টুটির ধার ধারে না, অফিসের ভিড় ভাঙার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার ওপর আজ পুজোর কেনাকাটা করতে যাওয়ার কথা। দেরি হওয়ার কারণ নেই। তবু সাতটা বেজে গেল, মানুষটা আসছে না।

মেয়ের মার বয়স মোটে ছাব্বিশ, ছয় বছর হল বিয়ে হয়েছে। দেখতে শুনতে আজও বেশ ভালো। পাতলা দীঘল গড়নের যুবতী, এখনও কত সাধ—আহ্লাদ। মেয়ের বাবারও বয়স ত্রিশের মধ্যেই। ভালো স্বাস্থ্য, সাবধানী, সংসারী এবং সঞ্চয়ী পুরুষ। সংসার সুখেরই!

তারা দু—বেলা ভাত খায় এই আকালের দিনেও। তবু কেন সাতটা বেজে গেল। সময়ের চোরা স্রোত কেন বয়ে গেল হু হু করে?

মেয়ের মা সারাদিন সেলাই করছে। মেয়ের বাবার বড়ো শখ হয়েছে ফতুয়া পরবে। পরশু চার গজ পাতলা লংক্লথ কিনে এনেছে। দুটো ফতুয়া সেলাই করতে করতে চোখ ঝাপসা, মাথা টিপটিপ, মেশিনটা সরিয়ে রাখে বউ মানুষটা। মন ভালো লাগে না। দুশ্চিন্তা হচ্ছে বড়ো। সাতটার মধ্যে না আসার কথা নয়।

মেয়ে আজকাল ইস্কুলে যায়। তাই মেয়ের মা সারাদিন একাভোগা। কী করে, কী করে, কী করে! ঘুরেফিরে ঘর সাজায়। বিছানার কভার পালটায়, জানালার পর্দা পালটায়, সেলাই করে। উল বোনে, একশোবার ঘরের আসবাব এধার থেকে ওধার করে।

আজও সারাদিন সাজিয়েছে, তারা আর বেশিদিন এই ফ্ল্যাটে থাকবে না। গড়িয়ার দিকে একটা জমি কেনা হয়েছে। বিল্ডিং মেটেরিয়ালের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। বাড়ি উঠলে তারা নিজেদের বাড়িতে উঠে যাবে। কথা আছে। বাড়ি হলে সামনে শখের বাগান করবে বউটি, স্টিলের আলমারি করবে, ভগবান আর একটু সুদিন করলে গ্যাসের উনুন আর একটি সস্তার রেফ্রিজারেটরও হবে তাদের। মেয়ের বাবার শখ টেপ রেকর্ডারের, আর ডাইনিং টেবিলের। তাও হয়ে যাবে। সাশ্রয় করে চললে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু সাতটা বাজে। সময় বয়ে যাচ্ছে।

মেয়ের মা রান্নাঘরে আসে। দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। দেরির একটাই মানে হয়। কিন্তু মানেটা ভাবতে চায় না বউ মানুষটি। সে ঢাকনা খুলে দেখে রুটিগুলি শক্ত হয়ে গেল কিনা। সে এলে আবার একটু গরম করে ঘি মাখিয়ে কচুর ডালনার সঙ্গে দেবে। চায়ের জলটা কি বসাবে এখুনি? হাতে কেটলি নিয়ে ভাবে বউটি। জনতা স্টোভের সলতে উসকে দিয়ে দেশলাই ধরাতে গিয়েও কী ভেবে রেখে দেয়। জল বেশি ফুটলে চায়ের স্বাদ হয় না। এসেই তো পড়বে এক্ষুনি, তখন চাপাবে।

মেয়ে আবার চেঁচায়, কটা বাজল মা?

বুকটা ধ্বক করে ওঠে। ঘড়ি না দেখেই বউটি উত্তর দেয়, কয় টা আর! এই তো সাড়ে ছয়টা।

মিথ্যে কথা, প্রকৃত হিসেবে সাতটা পেরিয়ে গেছে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। বউটি নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলল।
না। সে নয়। উপরতলায় লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।
বাবা আসছে না কেন? মেয়ের প্রশ্ন।
এল বলে। তুই বেণীটা বেঁধে নে না ততক্ষণে।
বাবা আসুক।
আচ্ছা বাপ—ন্যাওটা মেয়ে যা হোক।
কেন আসছে না বাবা?
রাস্তাঘাট আটকে আছে বুঝি! আজকাল বাসে—ট্রামে বুঝি সহজে ওঠা যায়!
রোজ তো আসে।
আজও আসবে।

বিশ্বাস। বিশ্বাসের জোরেই বউটি হাত—মুখ ধুয়ে এসে পরিপাটি করে চুল বাঁধল। সিঁদুরটা একটু বেশিই ঢালল সিঁথিতে। ইদানীং বাজে সিঁদুরে চুল উঠে যায় আর মাথা চুলকোয় বলে সিঁদুরটা কমই লাগাত। আজ কম দিল না। একটু ফাউন্ডেশন ক্রিম ঘষল মুখে। লিপস্টিক বোলালো। সূক্ষ্ম কাজলও টানল একটু। ঘড়ির দিকে চাইল না।

সকালের রাঁধা তরিতরকারি জ্বাল না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যখন স্টোভ জ্বেলে জ্বাল দিতে বসল তখনই সে টের পেল, গায়ে—পায়ে একটা কাঁপুনি আর শীত। শরীর বশে থাকছে না। ভয়? না কি পেটে একটা শত্তুর এল?

কিন্তু রাত থেমে থাকল না। গড়াতে লাগল সময়। একসময়ে বউটির ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে ঘড়িটাকে আছাড় মেরে বন্ধ করে দিয়ে আসে। কারণ আটটাও বেজে গেল? মানুষটা ফেরেনি।

লুকিয়ে আছে কোথাও? ভয় দেখাচ্ছে না তো?

জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়েছে শিশুটি! তার খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। বউটি পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে একবার ঘুরে এল। ও ফ্ল্যাটের কর্তা ফিরেছে। ও বাড়ির বউ শুনে—টুনে বলে, রাত তো বেশি হয়নি, সাড়ে আটটা। আর একটু দেখুন, তারপর না হয় আমরা কর্তাকে খোঁজ নিতে পাঠাব। শুনলুম, কারা মিছিল—টিছিল করেছে, রাস্তা খুব জ্যাম।

আশ্বাস পেয়ে বউটি ফিরে আসে। কিন্তু ঘরে এসে শান্ত বা স্থির থাকতে পারে না। কেবলই ছটফট করে। ঘড়ির কাঁটা এক মুহূর্ত থেমে থাকছে না যে! বউটি বার দুই বাথরুমে ঘুরে এল। মেয়েকে খাওয়াতে বসে বারবার চোখে আসা জল মুছলে আঁচলে। তার বয়স বেশি নয়। মাত্র ছ—বছর হল বিয়ে হয়েছে। একটা জীবন পড়ে আছে সামনে।

ঘড়ির কাঁটা জলস্রোতের মতো বয়ে চলেছে। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, বারবার ওপরে উঠে আসে আরও ওপরে উঠে যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ নেমে আসে, নেমে যায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। সময় যাচ্ছে বয়ে।

শিশু মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বলে, মা, বাবা বাক্যটা শেষ করে না। বউটি আগ্রহে ঝুঁকে শুনবার চেষ্টা করে বাক্যটি। শিশুরা তো ভগবান, ওদের কথা অনেক সময় ফলে যায়। কিন্তু শিশু মেয়েটি বাক্যটা শেষ করে না। বউটির বুক কাঁপে।

এবার বউটি একা! জানলার পাশে। শিকের ফাঁকে চেপে রাখা মুখ চোখের জলে বাসে! ন—টা বেজে গেল বুঝি! বউটি আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, তার মানুষটা আর আসবে না। অমন মানুষটার নানা চিহ্ন তার মনে পড়ে। কথা বলার সময় ওপরের ঠোঁটটা বাঁদিকে একটু বাঁক খায়, লোকটার দাঁত একটু উঁচু, গাল ভাঙা, কপালের ডান দিকে একটা আঁচিল, সাবধানি ভীতু এবং খুঁতখুঁতে মানুষ। বড্ড মেয়ে—ন্যাওটা আর বউ—ন্যাংটা। এমনিতে এসব মনে পড়ে না, কিন্তু এখন বড্ড মনে পড়ছে। বউটা হাপুস হয়ে কাঁদতে থাকে।

সদর খোলা ছিল। সিঁড়িতেও শব্দ হয়নি।

অন্ধকার ঘরের ভিতর একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, একী, সব অন্ধকার কেন?

চমকে ওঠে বউটি, বুঝতে পারে, মানুষটা ফিরেছে।

কী হয়েছিল শুনি!

আর বোলো না, সত্যকে মনে আছে?

কে সত্য?

কোন্নগরের। আমরা বুজুম ফ্রেন্ড। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেল। খবর পেয়ে অফিস থেকেই গিয়েছিলুম। মনটা যে কী খারাপ লাগছে।

বউটি আলো জ্বালে, ঘরদোর আবার হেসে ওঠে। তারা খাওয়াদাওয়া সারে। হাসে গল্প করে।

মানুষটা বারবারই তার মৃত বন্ধুর কথা বলে। বউটি বলে আহা গো।

কিন্তু বউটি তবু সুখীই বোধ করে। কারণ তার মানুষটা ফিরেছে। মানুষটা ফিরেছে। মানুষটা বেঁচে আছে।

হলুদ আলোটি

অদ্ভুত এক আলোর ভেতরে ঘুম ভাঙে মনোরমার। রোজকার আলো নয়। পাকা যজ্ঞিডুমুর ভাঙলে যেমন রং তেমন এক আলো। মনোরমার পায়ের দিককার জানলার ধারে ডুমুর ফল রোজ এসে ঠোঁটে ভাঙে বুলবুলি। সেই রংটাই এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে এই বৈশাখের বিকেলে।

শানুর থুঁতনিতে ঘাম, নাকের নীচে ঘাম, বুকে—গলায় মুক্তোফল ফুটে আছে ঘামের। বড্ড ঘামে মেয়েটা। কোমরের জাঙিয়ার ইলাস্টিক আঁট হয়ে কোমরে বসেছে। ঘুমের আগে বাতাসা খেয়েছিল, বিছানায় সেই বাতাসার গুঁড়ো, আর লাল পিঁপড়ে কামড়েছে, সারাক্ষণ, তবু নিপাট হয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। মনোরমা শানুর জাঙিয়া খুলে দেয়, বিছানাটা হাত দিয়ে ঝাড়ে তারপর হঠাৎ নিঃঝুম হয়ে আলোর দিকে চেয়ে থাকে। এ কী পৃথিবী? এ কী পৃথিবী নয়?

পৃথিবীর কীই—বা সে জানে। একটা শ্বাস ফেলে। কিছু না। তবু মনে হয় তার ঘুম ভেঙেছে এক স্বপ্নের ভিতরে। মাঝে—মাঝে গাছপালা, মাটি, আকাশ, পালটে যায়। যজ্ঞিডুমুরের গাছে একটা বুলবুলি ডুমুর ভাঙছে। পাখির গায়ের রোঁয়া উলটে যাচ্ছে হাওয়ায়! মনোরমা ঝুঁকে দেখল, আকাশে ঝড়ের মেঘ। গুমোট ভেঙে দমকা হাওয়ায় ধুলোবালি আর পুকুরের আঁশটে গন্ধ উড়ে এল।

জানলার জালের নীচে একটুখানি ফোকর দিয়ে সাবধানে হাত বাড়িয়ে মনোরমা জানলা বন্ধ করে। উঠে বাইরে আসে। হাওয়ায় তারের ওপর শুকোতে দেওয়া শাড়ি ঝুলে উঠোনে লুটোচ্ছে, শানুর ফ্রক উড়ে গেছে বাগানে, কয়লার স্তূপের উপর পড়ে আছে ব্লাউজ। সেগুলি কুড়িয়ে নেয় মনোরমা, আর তখনও তার নিবিড় এলোচুলে ঝড়ের বাতাস এসে লাগে, ছুটে আসে বৃষ্টির গন্ধ, তামাটে মেঘ থেকে অদ্ভুত আলোটি ধীরে ধীরে বহুদূর পর্যন্ত রঙিন করে দিচ্ছে। এই হচ্ছে ঝড়ের রং। এখুনি রেলগাড়ির মতো ঝড় এসে যাবে। তবু দু—দণ্ড মনোরমা দাঁড়ায়। কত অচেনা জায়গা ছুঁয়ে আসে ঝড়, কেমন পুরুষ স্পর্শ তাঁর। মনোরমা দু—দণ্ড দাঁড়ায়, তার কপালের ওপর বড়ো একটা বৃষ্টির ফোঁটা এসে পাখির ডিমের মতো চড়াৎ করে ফাটে। অমনি দৌড়ে ঘরে আসে মনোরমা, মনে পড়ে— ওই যাঃ অনুপমার ঘরের জানলা তো সে বন্ধ করেনি! কত ধুলো ঢুকে গেছে। দিদি চেঁচাবে ঠিক।

অনুপমার ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ, সমস্ত বিছানাময় বালি কিরকির করছে, দাঁতে ধুলো, চুলে ধুলো।

বিছানার চাদর উলটে গেছে হাওয়ায়। জানালার পাল্লাগুলি মড়মড় করছে, একটা পাল্লা ব্যাঙ খুলে ঠাস করে শব্দ করল। খড়কুটো উড়ে পড়েছিল কিছু, ভেন্টিলেটারে পাখির বাসা দমকা হওয়ায় খসে পড়ল বিছানায়। চমকে উঠে মনোরমার নাম ধরে চেঁচাতে যাচ্ছিল সে, ঠিক সে সময়ে বাইরের রংটা চোখে পড়ল। শালিকের পায়ের মতো হলুদ এ কেমন রং? হলুদ রংটাই কেমন শিরশিরানি তুলে দেয় শরীরে। মনে পড়ে হুলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ, মাঘের দুপুরে উঠোনে পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে শীতল জলে সেই রোমাঞ্চকর স্নান। হলুদ সেই রংটা কে ঢেলে দিয়েছে চারধারে এখন! পাখির বাসাটা আপনিই গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। আজকাল বড্ড মনে পড়ে। বাতাস বয় উলটোভাগে, ঠিক সেইসব পুরোনো কথা ধুলোবালির মতো উড়িয়ে আনে, ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে যায়! সে এক বাতাস অনুপমার বুকের ভেতরে দমকা মেরে ঘোরে, ঝড় ওঠে। আজকাল বড্ড মনে পড়ে।

পাশ ফিরতে অনুপমা কুসি ছানাটাকে দেখতে পেল। আহা রে, কতটুকু চড়াইয়ের ছানা একটা, মুখে বোল ফোটেনি তবু বার বার হাঁ করছে। সদ্য জন্মেছে বলে গায়ের পাতলা চামড়ায় এখনও রোঁয়া ওঠেনি, রাঙা শরীর কাৎ করে পড়ে আছে বিছানায়, অনুপমার পায়ের পাতার পাশেই। আর একটু হলে চাপা পড়ত।

অনুপমার উঠে বসতে বড্ড কষ্ট হয়। বুক ধড়ফড় করে। পাখির ছানাটার দিকে হাত বাড়ায় ঠিকই। ধরতে সাহস হয় না। কতটুকু ওর শরীর। ডিম সুতোর গুলির মতো একটুখানি! এমন পলকা জীব ধরতে ভয় করে। যদি হাতের চাপে মারা যায়!

বৈশাখী ঝড়ের একটা ঝাপটা এসে লাগে বড়ো নারকেল গাছে। ডগাসুদ্ধ বিশাল একটা শুকনো নারকেল পাতা টিনের চালের ওপর হুড়মুড় করে খসে পড়ে। অনুপমা আজকাল আর চমকায় না।

চড়াইয়ের ছানাটা হাঁ করে আছে। তেষ্টা পেয়েছে নাকি? তোর মা মুখপুড়ি কোথায় রে? আহা কাঁপছে দেখ থিরথির করে। অনুপমা সাবধানে হাত বাড়িয়ে চড়াই ছানটাকে তুলে নেয়।

সরু কাঠের মতো দু—খানা পা, ছুঁচের মতো সরু নখ, তাই দিয়ে ছানাটা অনুপমার একট আঙুল আঁকড়ে ধরল। শিউরে উঠে বে—খেয়ালে হাত ঝেড়ে ছানাটাকে ফেলে দিল অনুপমা, চেঁচিয়ে ডাকল, মনো, শিগগির আয়।

কেউ শুনল না, শুকনো পাতা উড়ছে, বৃষ্টির ফোঁটা ফাটছে চড়বড় করে টিনের চালে— তার শব্দে অনুপমার গলা ডুবে গেল। জানলার জালের নীচে ছোট্ট ফোকর, সেই ফোকরটা দিয়ে পাখির ছানাটা গলে বাইরে গিয়ে পড়েছে। বাইরে ঝড়।

অনুপমা ঝড়ের বাতাস উপেক্ষা করে বিছানায় কষ্টে হাঁটু গেড়ে বসে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। জানালার ধারে নর্দমা, নর্দমার পাশে পাশে ডুমুরের গাছ, কচুর ঝোপ, ভাঙের জঙ্গল। কোথায় গিয়ে পাখিটা পড়ল।

বাইরে সেই অদ্ভুত আলোটি, হলুদ। পাঁখটা খুঁজতে খুঁজতে অনুপমা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

আলোটা তার গায়ে কেমন আজ ছড়িয়েছে! ইচ্ছে করল এই আলোতে হাত—আয়নায় একবার নিজের মুখটা দেখে।

অনুপমার ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করেছে মনোরমা। এখন বিছানাটা ঝাড়ছিল।

অনুপমা নিস্তেজ গলায় জিজ্ঞেস করে, শানু উঠেছে?

না! ঠান্ডা বাতাস পেয়ে ঘুমোচ্ছে। আরও একটু ঘুমোবে আজ।

অনুপমার একবার বলতে ইচ্ছে হল, শানু উঠলে ওকে সবজির ঝোলটা খাওয়াস মনে করে।

তারপর ভাবল, মনোই তো খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, সব করে। বলার দরকার কী? গত দু—মাস ধরে মনোই তো সব করছে! শানু অনুপমার কাছে বড়ো একটা আসে না আজকাল।

একটা পাখির বাসা বিছানায় পড়েছিল, একটা চড়াইছানাসুদ্ধ। চড়াইছানাটাকে ধরতে গিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি। বৃষ্টিটা থামলে একটু ঘরের পেছনে গিয়ে দেখিস তো?

ফেলে দিলে? কাকগুলি ঠুকরে কিছু রাখবে নাকি? নইলে বেড়াল মুখে নিয়ে যাবে।

ধরতে গিয়েছিলাম, আঙুলটা সরু পায়ে আঁকড়ে ধরল এমন! মাগো বলে চমকে হাত ঝাড়লাম, ছিটকে বাইরে পড়ে গেল। বাঁচবে না ঠিকই, তবু দেখিস তো একটু। কুসি ছানাটা, মা—পাখিটা রাতে এসে কাঁদবে হয়তো।

মনোরমা বলে, এ পাশটা বৃষ্টির ছাঁটে একটু ভিজে গেছে দিদি।

ভিজুকগে; বড়ো বিছানা, আমি তো একটা পাশে পড়ে থাকি। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে, তুমি একটা কিছু গায়ে দিয়ে শোও। একটা কাঁথা বের করে দেব?

থাকগে, একটু জুড়োই কিছুক্ষণ। পিঠটা ঘামাচিতে ভরে গেছে। চা করবি নাকি? করলে একটু দিস।

এক্ষুনি করব। চা খাওয়ার একজন লোক তো বিকেলে আসেই, সে এলে একেবারে করতাম।

তোটন কি আজ আসবে? যা বৃষ্টি?

পালকের ঝাড়নে বাজুর মিহি ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মনোরমা মুখ লুকিয়ে হাসে। আসবে না আবার! না এসে পারে নাকি?

তোর জামইবাবুর ছবিটা মুছিস। মালাটা শুকিয়ে গেছে, ফেলে দিস।

ছবিটার মুখে মুখি দাঁড়িয়ে মনোরমার বুকটা কেমন করে। অভিরামদা তেমন সুন্দর ছিল না মোটাসোটার ওপরে চেহারা, প্রকাণ্ড গোঁফ ছিল, মুখখানা সাধারণ। কিন্তু এসবে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি পুরুষ আছে, তবু তার মধ্যে ওই একজনই ছিল অনুপমার মানুষ। আলাদা মানুষ, একার মানুষ নিজের মানুষ। মাস দুই আগে অভিরামদা মারা গেছে, অনুপমা তারপর থেকে আজও বিছানা ছাড়েনি। সেই কালিকাপুর থেকে মনোরমা এসে আছে টানা দু—মাস। শানুকে রাখে, অনুপমার দেখাশুনা করে। অভিরামদা বাড়িটা করে না গেলে দিদি আজ অবশ্যই কালিকাপুরে বাপের বাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকত। অল্পবয়সেই বাঁড় করেছিল অভিরামদা। তোটন পারবে কি? ছাই পারবে। এখনও চাকরিই পেল না!

বৃষ্টির সাদা চিক—এ ঢেকে গেল কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়। মাঠে দুধের মতো সাদা সাদা ফেনা তুলছে বৃষ্টি। বাতাসে বলটা ঘুরে যায় এদিক—সেদিক, জলের মধ্যে থপ করে পড়ে আটকে যায়, আবছা হয়ে গেল মাঠ। খেলোয়াড়রা দৌড়ে মাঠ ছেড়ে চলে আসতে থাকে। সবার আগে তোটন, তার বুকে ধরা বল।

চারধারেই পুকুর, মাঠ, ঘাট, আর শহরতলির নতুন নতুন না—হওয়া বাড়ির ভিত। তারা কেউ একসঙ্গে ছোটে না। দু—চারজন একটা বাড়ির নীচের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাদবাকি সবাই শিবাজীর চায়ের দোকানে।

দাঁড়ায় না একমাত্র তোটন, বুকের বলটা শিবাজীর চায়ের দোকানের ভিতরে ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সন্ধের পর দেখা হবে গণেশ।

গণেশ পিছন থেকে চেঁচায়, কোথায় যাচ্ছিস?

তোটন জবাব দেয় না। তার চারধারে ঝড় আর ঝড়। একপাল পাগল হরিণের মতো বৃষ্টি ছুটছে। জলপ্রপাতের মতো পড়ছে। তার ভিতরে দেখা যায়, মজা পুকুরের কচুরিপানার পাতাগুলি উলটে দিচ্ছে বাতাস। তার পায়ে বুট, গায়ে কলারওয়ালা সাদা গেঞ্জি,পরনে খাটো প্যান্ট। ঝড়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো নিজেকে বোধ করে সে। কোথায় যাবে? কোথাও না, তোটন দৌড়োবে একা, অনেক দূর।

নীল আগুনে ঝলসে ওঠে আকাশ। গুড়গুড় করে মাটি কাঁপে। তোটন হা—হা করে হাসে। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োয়।

আজ স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে একটা রিগ্রেট লেটার এসেছে। চাকরিটা তার হল না। না হোক। তোটন এখন যে ঘাসপাতা, যে মাটির উপর দিয়ে দৌড়োচ্ছে, চারধারে যে বৃষ্টির ঝরোকা, উদ্ভিদের স্বেদগন্ধ, যে শব্দ ও স্পর্শ — এসবের মধ্যে ঠিকই থেকে যাবে তোটন। থাকবে আনন্দ। সে কখনো কাউকে কষ্ট দেবে না। কী ভালো এই ঝড় এবং একাকী সে! অনেকক্ষণ দৌড়োবে তোটন! একা একা।

সন্ধেবেলায় বীণা তার দোতলার অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে রোজ। মোটা কালো বীণার স্বামী আশু পোদ্দার পয়সা করেছে। দু—দুটো দোকান। কিন্তু এক দুঃখ, তাদের ছেলেপুলে নেই। স্বামীর তেমন টান নেই বীণার দিকে/ রাত করে ফেরে, কাকভোরে আবার বেরোয়। সারাদিন বীণা একা। প্রেতচক্ষু মেলে সে দোতলা থেকে নীচের লোকালয়টির দিকে লক্ষ রাখে। পাড়ার সব কুমারীর খবর রাখে সে, সব বউয়ের। কোন কুমারীর পেটে ভ্রূণ এল, কোন বউকে স্বামী নেয় না, কে পরপুরুষের সঙ্গ করে, কার বা আছে বাঁধা মেয়েছেলে— কাকের মতো এসব নোংরা খোঁটে সে, তারপর এ—বাড়ি ও—বাড়ি ছড়ায়।

সন্ধের পর নীচের রাস্তা দিয়ে তোটন যায়। টেরিলিনের প্যান্ট—শার্ট, চুল আঁচড়ানো, ঠোঁটে সিগারেট।

বীণা অন্ধকারে হেসে নেয়। তারপর গলা বাড়িয়ে ডাকে, তোটন।

তোটন মুখ তুলে বলে, কী বউদি?

কোথায় যাচ্ছ?
অভিরামদার বাড়ি।
রোজ যাও?
যাই! দেখাশোনা করি, আমরা আত্মীয়রা কাছাকাছি আছি, আমরা না দেখলে কে দেখবে?
বীণা হাসে, আত্মীয় আবার কী? তুমি তো অভিরামবাবুর পিসতুতো ভাইয়ের শালা, ওকে আত্মীয়তা বলে নাকি?
তোটন সিগারেটটা এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল পিছনে। হঠাৎ মেয়েমানুষটার প্রতি একটা ঘেন্না বোধ করে সিগারেটটা বের করে একটা টান দিয়ে বলল, যা ভাবেন।
ভাবাভাবির কী আছে ভাই? যার যেখানে ভালো লাগবে যাবে।
তাই তো যাচ্ছি।
বীণা একটা শ্বাস ফেলে। তোটন চলে গেলে আবার প্রেতচক্ষু মেলে চেয়ে থাকে। তার চোখে ঝড়ের আগের হলুদ আলোটি কখনো বিস্ময় সৃষ্টি করেনি। সে অনুভব করেনি বৃষ্টির সৌন্দর্য। নীচের লোকালয়টির মানুষগুলির পচনশীল শরীরের মাংস—কৃমির কথা সে শুধু ভাবে। তার ভারি আনন্দ হয়।

শানু ঘুম থেকে উঠে ডাকে, মাসি।
যাই! রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় মনোরমা।
আমাকে মশা কামড়াচ্ছে। চুলকে দাও।
কেটলির জল ফুটে গেল, তোটন এখনও এল না। আবার বাবুর জন্য জল চড়াতে হবে নাকি? ভারি বিরক্ত বোধ করে মনোরমা।
রান্নাঘরে হাত জোড়া বলে মনোরমার উঠতে দেরি হচ্ছিল। অনুপমা ও—ঘর থেকে ডাকল, শানু, মাসি কাজ করছে, আমরা কাছে আয়, গা চুলকে দেব।
পরিষ্কার রাগের গলায় শানু বলে, না, মাসি দেব।
বোধ হয় অভিমানে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অনুপমা, তারপর হতাশ গলায় বলল, মনো, শানু আমার পর হয়ে যাচ্ছে।
কেটলিটা নামিয়ে ও—বেলার তরকারি গরম করতে বসিয়ে মনোরমা বলল, কী যা তা বলো, মাসি কি কখনো মা হয়!
অনুপমা ও—ঘর থেকে গুনগুন করে বলে, তোর ওপরে আমার হিংসে নেই রে মনো, শানু, বরাবরই আমার পর ছিল। বাপ বেঁচে থাকতে বাপকেই চিনত, মার কাছে ঘেঁষত না।
শানুকে কলতলায় নিয়ে গেল মনোরমা। মুখ—চোখ ধুইয়ে যখন জামা পরাচ্ছে তখন এল তোটন।
চা হয়ে গেছে নাকি! বলে গোটা দুই হাঁচি দিল পরপর।
অনুপমা বিছানায় উঠে বসল, বলল, তোটন, আজ একটা চড়াইয়ের বাচ্চা আমার হাতে মরল। মনো, তোটনকে নিয়ে একবার যা না, কুসি বাচ্চাটা, একটু খুঁজে আন।
এনে কী হবে? ঝংকার দেয় মনোরমা!
একটু মাটি চাপা দিয়ে রাখ উঠোনে! অন্ধকার হয়ে গেছে, টর্চটা নিয়ে যা।
যাচ্ছি বাবা, একটু বোসো। মেয়েকে খাওয়াই, তরকারিগুলি গরম করে দিই, তোমার যে কী সব বাতিক!
বাতিক নারে, আমার হাতেই মরল তো! কষ্ট হয়। কাকে—বেড়ালে ছিঁড়ে খাবে, একটু মাটি চাপা দে। হরিনাম করে দিস, ওতে গতি হয়।
খুক করে একটু হাসল তোটন, বলল, চড়াইয়েরও গতি আছে নাকি! অল্পবয়সেই আপনি বড্ড বুড়ো হয়ে গেলেন বউদি!

হলাম। বলে পাশ ফেরে অনুপমা।

মেঘ কেটে আকাশ এখন বড়ো পরিষ্কার। ঝলমলে নক্ষত্র আকাশময়। চাঁদও উঠবে একটু পরে। বাতাস ঠান্ডা, ভেজা। বাইরের ফিকে অন্ধকারের দিকে অভিমানভরে চেয়ে শুয়ে আছে অনুপমা। শিশুর মতো শোওয়ার ভঙ্গি।

সেদিকে চেয়ে বড়ো কষ্ট হল মনোরমার। ভগবান ওর সব কেড়ে নিলেন। বর্ষার পর গাছে যেমন পাতা আসে তেমনি ওর সুখ সদ্য ফুটতে শুরু করেছিল। তখনই—

তোটন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সর্দি লেগে গেল।

মুখ ফিরিয়ে গিন্নির মতো মনোরমা বলে, বৃষ্টিতে ভেজা কেন?

তোটন বলল, এমনিই। নতুন বর্ষা, প্রথম ঝড় দেখে ভাবলাম, একটু ঝড় খাই। ঠান্ডা লেগে গেল, ফ্যারিংসের দোষও আছে। জ্বর না এসে যায়!

শরীর যতটা খারাপ তার চেয়ে বেশি ভান করা হচ্ছে। মনোরমা বোঝে। পুরুষদের কায়দা—কৌশল সবই পুরোনো এবং বোকার মতো, সেই কারণেই ভালো লাগে মনোরমার।

শানু ডাকে, মাসি!

উমম!

শানু রাগের গলায় বলে, আমাকে আবার মশা কামড়াচ্ছে।

এ ঘরে এসো।

না। তুমি আমার কাছে এসো।

অনুপমার ঘর থেকে ওই ঘরে চলে যাওয়ার এই একমাত্র অজুহাত এবং সুযোগ। মনোরমা শানুর কাছে উঠে গেল। শানু বিছানায় ছবির বই খুলে বসেছে, কোলে পুতুল। পুতুলকে ফ্রক দিয়ে ঢেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ওর পাশে বসে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে উৎকর্ণ হয়ে থাকে মনোরমা। তোটন আসবে। অনুপমার সঙ্গে দু—একটা কথা বলে ঠিক উঠে আসবে। রোজই আসে।

তোটন বলল, যাই।

এসো।

তোটন ও—ঘরে গেল। অনুপমা চিৎ হয়ে শুয়ে ওপরের দিকে চেয়ে দেখছিল।

মা—পাখিটা ফিরে এসেছে। ভিজেছে খুব, থরথর করে কাঁপছে। ভেন্টিলেটর থেকে বাসাটা বাচ্চাসুদ্ধ খসে গেছে। শূন্য জায়গাটায় বসে পাখিটা ডাকছে। ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু অনুপমা বুঝতে পারে। বুঝতে কষ্ট হয় না।

তোটন আর মনোরমা পাঁখির বাচ্চাটাকে খুঁজতে গেল না। ভুলে গেছে। ও ঘরে বসে কথা বলছে দু—জন। হাসছে। অনুপমা এখন আর হাসে না! হাসবে না বহুদিন। পৃথিবীর হলুদ রংটা মুছে গেছে। বাতাস এখন উলটোভাবে বয়, যত রাজ্যের পুরোনো কথার ধুলোবালি ছড়িয়ে যায় ঘরময়। বড্ড মনে পড়ে আজকাল।

ভেজা চড়াইটা ডানা ঝাপটাচ্ছে। ডাকল 'চিড়িক' করে। অনুপমা চেয়ে থাকে। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভালো দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। পাখিটা কাঁপছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে।

ঝড়ের রংটা নিঃশেষে মুছে গেছে। রং মুছে গেলেই পৃথিবীটা কেমন গভীর হয়ে যায়।

ডুবুরি

আঁচিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই থমকে গেল টুনু। বাঁশের মাচার উপর বিছানায় মাথা গুঁজে মা কাঁদছে। একটু আগে তাদের খেতে দিয়ে মা পুকুরে গিয়েছেন স্নান করতে। এখনও মা—র শাড়িটা ভেজা। মাটির মেঝেটা শাড়ির জলে অনেকটা ভিজে গিয়ে কাদা—কাদা হয়ে গিয়েছে। সেই কাদা মা—র হাঁটুর কাছে আর গোড়ালিতে লেগে আছে। মেঝেতে বসে উঁচু হয়ে ময়লা কাঁথা আর শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তৈরি—করা চাদরের বিছানায় মুখ গুঁজে মা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মাকে কাঁদতে এই প্রথম দেখছে না টুনু, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে কিংবা বাবা মারলে মা চিৎকার করে সারা কলোনিকে জানিয়ে কাঁদতে বসে। কিন্তু এইভাবে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্নাটা অন্যরকম। টুনু ভয় পেয়ে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল তার।

টুনু ফিসফিস করে ডাকে, মা, ওমা, মা। মা উত্তর দেয় না। টুনু আস্তে আস্তে মার কাছে এগোয়, মা, কান্দ ক্যান, গো? কী হইছে?

কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মা—র খালি পিঠের পাতলা চামড়া ভেদ করে পাঁজরের হাড়গুলি গিরগির করে উঠছে। টুনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় চিৎকার করে ওঠে সে, কী হইছে কওনা ক্যান?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মা—র কান্না থেমে যায়। সোজা হয়ে বসে মা। ভেজা মাথার চুল থেকে কেঁচোর মতো মোটা মোটা ধারায় জল এঁকেবেঁকে নেমে চোখের জলের সঙ্গে মিশে হাড়—উঁচু শুকনো মুখের থুতনিতে এসে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে।

টুনু চেয়ে থাকে। মা—র গলার কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই চোখের জল হাত দিয়ে মুছে মা বলে, কিসু হয় নাই, চিক্কইর দিস না।

কিসু হয় না, তবে কান্দ ক্যান? কী হইছে কওনা আমারে।

কইলাম তো কিছু হয় নাই! খাইছস নি প্যাট ভইরা?

টুনু এগিয়ে গিয়ে মা—র কাছে, খুব কাছে দাঁড়ায়। তারপর সোজা হয়ে মা—র চোখের দিকে তাকিয়ে বারো বছরের টুনু বিজ্ঞের মতো বলে, কী হইছে কও না আমারে।

চুপ চুপ, আস্তে। কেউ য্যান, শোনে না। মা তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলে, তর বাবার ট্যার পাইলে কিন্তু আস্তা রাখবো না। দুলটা পুকুরে হারাইছি।

টুনু বুঝতে পারে। কেননা, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, মা—র বাঁ কানের লতিটা শূন্য। ওখানে একটু আগেও ঝকঝকে সোনার দুলটা দুলছিল। যদিও মা—কে খুব বেমানান লাগছিল। হাড়—উঁচু মুখ, প্রায় ন্যাকড়ার মতো জ্যালজেলে ময়লা শাড়ি আর রুক্ষ তেল—না—দেওয়া চুলের সঙ্গে দুলটার কোনো মিল ছিল না। কাল রাতেও বাবা ঠাট্টা করে বলেছে, গোবরে পদ্মফুল। মাইনষের যেমন দুল চাই, দুলেরও হেমুন মানুষ চাই। সাজলেই হয় না গো মাইজ্যা বউ। এসব কথায় মা রেগে গিয়েছিল খুব। রাগ করে বলেছে, হগো হ শরীল যে গেছে হেই দোষটা আমারে না দিয়া বুঝি শান্তি পাও না। মাইয়ামানুষ পালতে গেলে মুরাদ চাই, বুঝলানি! কয় ট্যাহা রোজগার কর তুমি যে, শরীল তুইল্যা কথা কও! কিন্তু ঝগড়াটা শেষপর্যন্ত খুব সাংঘাতিক হয়নি। কারণ কাল সুভাষপল্লির হারান জ্যাঠার মেয়ে লতিদির বিয়েতে গিয়েছিল দু—জন। তা না হলে কীভাবে মা—র একটা গয়না নিয়ে বিক্রি করে সংসার খরচ চালিয়েছে বাবা, সে কথা না বলে এবং বুক চাপড়ে না কেঁদে মা থামত না।

কাল রাতে মা তার বহু পুরোনো লাল রঙের ওপর সাদা জরির তারাফুল তোলা বেনারসিটা পরে বাবার সঙ্গে লতিদির বিয়েতে গিয়েছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলেই মা বেনারসিটা পরে আর কানে ওই দুলজোড়া। এ ছাড়া মা—র আর ভালো পোশাক নেই, গয়নাও নেই, শুধু হাতে কয়েক গোছা ব্রোঞ্জের চুড়ি ছাড়া।

কাল রাতে সুভাষপল্লিতে হারান জ্যাঠার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে মা আর দুলজোড়া খুলে রাখেনি। কাল রাতে মার মুখটা হাসি হাসি ছিল। বাবার মেজাজ ভালো ছিল কাল।

কিন্তু আজ? ভাবতেই টুনুর গাটা শিরশির করে।

রোগা হাড় বের করা মায়ের দিকে তাকায় টুনু। বলে, ভালো কইরা খুইজা দ্যাখছ নি? অন্য কোনোখানে পড়ে নাই তো?

মা চাপা গলায় বলে, চুপ। আস্তে কথা কইতে পারস না। বুলকি আর পানু যদি শুইন্যা ফ্যালায়?

টুনু রান্নাঘরের দিকে তাকায়। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বেড়াগুলি পুরোনো হয়ে ভেঙে গেছে এদিকটায়। পানুর ডোরাকাটা শার্ট আর বুলকির সবুজ রঙের ফ্রকের অংশ দেখতে পায় সে।

না, শুনব না। অরা অখনো পাখঘরে। খাইত্যাছে।

শয়তান দুইটা। শুনলেই বাপের কানে লইয়া তুলব।

বাবার ভয়ে মা সিঁটিয়ে যাচ্ছে যেন। মা—র চোখের পাতাগুলি পড়ছেই না। টুনু চুপ করে থাকে।

বাবাকে সে চেনে। খুব ভালো করেই চেনে। চারদিকের সবকিছুর ওপর বাবা যেন সবসময়ে খেপে আছে। টুনু একবারের বেশি দু—বার ভাত চাইলেই বাবা চিৎকার করতে থাকে, হ, সোয়াস্যার গিল্যা খাসি হইতাছ; ল্যাখাপড়ার নামে তো লবডঙ্কা! য্যাগো ল্যাখন—পড়ন হয়, তারা স্যার—সোয়াস্যার চাউলের আহার করে না। কিংবা কখনো কেউ কোনো জিনিসে ভেঙে ফেললে বাবা বলে, কীরে বাসী, ঠাকুর্দার জমিদারির জিনিস পাইছ নাকি। নিব্বইংশা পোড়ারমুখা—

বাবার রুদ্র মূর্তির কথা মনে পড়তেই টুনু শিউরে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, আর একবার খুঁইজ্যা দ্যাখবা না?

মা বলে, হ, আর একবার খুজুম। তুইও চ দেখি আমার লগে। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, ঘাটে কেউ নাই অখন। একলা ডুব দিতে ডর করে।

টুনু মনে মনে হাসে। মা সাঁতার জানে, কিন্তু ডুব দিতে মা—র ভীষণ ভয়।

ঠিক দুপুর। নিস্তরঙ্গ সবুজ জল। কয়েকটা শুকনো পাতা জলের উপর ভাসছে।

খুব নির্জন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই।

টুনু বলে, কোনখানে মা?

কাটা সুপুরিগাছ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি করা সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে মা ইতস্তত করে। চারদিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

টুনু আবার বলে, কোনখানে মা?

মাঝখানের জলটা সবুজ, আর ঘাটের কাছে ঘোলা। কেউ বাসন মেজে গেছে সেই ছোবড়াগুলি ছাই—কাদার মধ্যে পুকুরপাড়ে পড়ে আছে। কেমন যেন আঁশটে গন্ধ।

ঘোলাজলের দিকে তাকিয়ে মা বলে, এইখানেই পড়ছে। কিন্তু—

আঁশটে গন্ধটা এড়াবার জন্যেই টুনু ঘাটের কাছ থেকে সরে এসে ঢেঁকির শাক আর কচুর জঙ্গলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা ঠিক কোমরজলে দাঁড়িয়ে আছে। পা ঘষে ঘষে খুঁজছে দুলটাকে! টুনু তাকিয়ে রইল। মা আর একধাপ নামল। জলের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে মা। কিন্তু জলটা ঘোলা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না মা।

এমনই কপাল! দুল কি পাওন যাইব! তিন আনি আর তিন আনি— এই ছয় আনি সোনাই আছিল ঘরে। পোড়ার কপালে ছয় আনির তিন আনি গেল। ঠিক গলাজলে দাঁড়িয়ে মা বলে, ইচ্ছা করে বাকি তিন আনিও উদ্দা মাইরা ফ্যালাইয়া দেই।

কচুগাছের পাতা হাওয়ায় দুলে টুনুর পায়ে লাগে। কেমন সুড়সুড় করে যেন। খুব তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মাকে দেখে টুনু। জলগুলি গোল চাকতির মতো মা—র চারদিকে, বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। মা—র মাথাটা এক টুকরো কাঠের মতো জলের ওপর ভাসছে।

মা—র থুতনির কাছে জল এখন।

হঠাৎ মা চিৎকার করে, এই যে, কি জানি একটা পায়ে লাগল রে!

মা ডুব দেয়। ছলাৎ করে খানিকটা সবুজ জল ফেনা তুলে সরে যায়। টুনু একলাফে ঘাটের কাছে এগোয়। জলের ঠিক ওপরের ধাপে কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখে মা—র সাদা শাড়িটা সবুজ জলের ভিতরে মাছের মতো ডুবে যাচ্ছে। টুনু দম বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ জলটা অল্প ঢেউ তুলল। টুনু তাকিয়ে রইল।

হুস করে মাথা তুলল মা! মুঠো করা হাতটা জলের ওপর তুলে আঙুলগুলি আলগা করে দিল। মা—র হাতের চেটোয় ছোট্ট একটা লোহার স্ক্রু।

হাসি পায় টুনুর, কিন্তু হাসে না।

মা—র মুখটা এখন আরও সাদা, ঠোঁটদুটো চেপে লেগে আছে। মা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে এখন।

স্ক্রুটা খুব জোরে আরও গভীর জলের দিকে ছুঁড়ে দেয় মা। ক্লান্ত সুরে বলে, দ্যাখ তো বুলকি আর পানু এদিকে আছে নাকি? আইলে কইস কিন্তু। আমি আর একটু খুঁজি।

আইচ্ছা। জবাব দেয় টুনু। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

মা—র সরু রোগা দেহটা আরও গভীর জলের দিকে সরে যাচ্ছে ঢেউ তুলে।

ডিঙি নৌকোর মতো স্বচ্ছন্দ গতি, দু—পাশে সরু রেখার মতো ঢেউ তুলে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। জোড়া হাতে আর পায়ের আঘাতে জল ছপছপ শব্দ হচ্ছে আর ঢেউ উঠছে জলে। পায়ের কাছে দুটো ট্যাংরা মাছ মুখ তুলল। টুপ করে ডুবে গেল আবার।

আর দূরে যাইয়ো না, মা। টুনু চিৎকার করে বলে। ভয় করে তার।

আরে ডরস ক্যান। গাঙপারের মাইয়া আমি, এত সহজে ডুবুম মা। মা বলে।

জলের উপর দিয়ে তার গলার স্বরটা কাঁপতে কাঁপতে এল। খুব ক্লান্ত স্বর।

জলের জন্যেই বোধহয় ঠিক কাশির মতো শব্দ হল।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে টুনু দেখে মা টপ করে ডুবে গেল। জলের নীচে এখন আর মাকে দেখা যাচ্ছে না। তবু টুনু চোখদুটো স্থির করে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল। দুপুরের রোদ ওপারে নারকেল গাছের পাতায় লেগে ঝিকমিক করছে।

চোখদুটো করকর করে তার। চোখে জল আসে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে টুনু তারপর আবার তাকায়।

এবার প্রথমে মা—র হাত দুটো সরু দুটো কাঠির মতো জলের উপর ভেসে উঠল। তারপর মাকে দেখা গেল। টুনু নিশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে দাঁড়ায়।

মা চিৎ হয়ে পা দিয়ে জল কাটে। চিৎ সাঁতার দিয়ে পাড়ের দিকে এগোতে থাকে। টুনু বুঝতে পারে যে, মা আর দম পাচ্ছে না।

পাড়ে এসে কাদার মধ্যে সুপুরিগাছ আর বাঁশের সিঁড়িতে বসে হাঁফাতে থাকে মা। দুটো হাত দিয়ে ভর দেয় ছাইমাখা ছোবড়া ছড়িয়ে থাকা নোংরা জায়গাটায়। শাড়িটা কাদায় মাখামাখি।

আর পারি না। ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে মা বলে, দম পাই না আর। পোড়া কপাইল্যা দুল! শরীলটায় পিছা মারে।

আমি একবার দেখুম, মা?

দূর! জলে লামলে ঠান্ডা লাগবো তর। আরে, কপালে নাই ঘি, ঠকঠকাইলে হইবো কী! খুব ক্লান্ত সুরে মা বলে। পা—দুটো জলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নোংরা মাটিতে হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে মাথাটা ডান কাঁধে কাত করে দিয়ে মা বলে। মাথার চুলগুলি একদিকে সরানো। মা—র সরু ঘাড় আর ঘাড়ের ওপর তিনটে ঢিবির মতো উঁচু হাড় দেখতে পায় টুনু। মা—র জন্য কেন যেন ভীষণ কষ্ট হয় তার।

মা— টুনু মা—র খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে মা—র পাশেই উবু হয়ে বসে চাপা গলায় বলে, পরান মাঝিরে ডাকুম একবার?

কী হইবো হ্যারে ডাইক্যা?

একবার খুঁইজ্যা দেখবো।

পয়সা নিবো না? তখন পয়সা পামু কই?

একটু চিন্তা করে টুনু। বলে, বেশি লাগবো না। দুলটা যদি পাওন যায়—

হু, দে একবার খবর। বেশি জানাজানি হইলে কিন্তু আমার কপালে কষ্ট আছে।

মা খুব আস্তে আস্তে বলে। জল থেকে পা—দুটো টেনে আনে মা। পা—দুটো ভেজা, পায়ের পাতার নীচের চামড়াটা সাদা, কোঁচকানো— কাদার মতো নরম। মা একটা হাত উঁচু করে টুনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, একবার ধর তো আমারে টুনু। শরীলটা য্যান কাঁপে আমার।

টুনু মাকে ধরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না মা। পা—দুটো থরথর করে কাঁপছে। মাথাটা নুয়ে পড়ছে সামনের দিকে।

ওয়াক। হিক্কা ওঠে মা—র। টুনু মাকে জড়িয়ে থেকে টের পায় যে মা—র শরীরের ভিতরটা গুরগুর করে কাঁপছে। মাকে শক্ত করে ধরে সে। মাথার ভেজা চুলগুলি সামনের দিকে দড়ির মতো দুলছে। মুখটা সাদা।

আর একবার হিক্কা তোলে মা। খানিকটা হলুদ জল বেরোয় মুখ দিয়ে। তারপর মা হাঁফাতে থাকে। টুনু চিৎকার করে, কিগো মা কি হইছে তোমার?

মা একবার তার কাঁধে ভর দেয়, কিছু না, কিছু হয় নাই। সারাদিন খাই নাই তো কিছু। পিত্তি পড়ছে। গিয়া একটু শুইয়া থাকলেই সারবো।

হ তোমারও মাথা খারাপ। এই শরীল লইয়া কেউ জলে ডুবায়? টুনু বলে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় যেন।

কিন্তু দুলটা। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে, আমার বিয়ার দুল। তর বাবায় দিছিল।

বড়ো শখের দুলরে! সব তো গেছে। এই দুলজোড়া আছিল। মা কাঁদতে থাকে, আর হাঁফাতে থাকে আর কাঁপতে থাকে।

টুনু ধমক দেয়, কান্দনের কী হইছে! বাবায় ট্যার পাওনের আগেই দুল পাইয়া যাইবা। অখন গিয়া শুইয়া থাক। আমি পরান মাঝিরে একবার খবর দেই।

মাকে ধরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে থাকে টুনু। মা—র গা থেকে ভিজে জলের আর বমির কটু গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। একটু গা ঘিনঘিন করে তার।

উঠোনের আগলটা হাত বাড়িয়ে ধরে মা বলে, তুই এইবার মাঝির কাছে যা।

আমি একলাই ঘরে যাইতে পারুম। তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে দুর্বল স্বরটায় যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে মা ডাকে, বুলকিরে, পানুরে, এইদিকে আইয়া ধর দেখি আমারে একটু।

টুনু বলে, শয়তান দুইটা পাড়া বেড়াইতে বাইর হইছে বোধহয়।

মাকে ধরে মাটি—লেপা দাওয়ায় বসিয়ে রেখে টুনু বলে, ঘরে গিয়া শুইয়া থাক, আমি পরান মাঝিরে খবর দেই।

পরান মাঝি পুকুর থেকে চোখ ঘুরিয়ে টুনুর দিকে তাকাল। একটু হেসে বলল, না কর্তা, আট আনায় হইবো না। পুরা একখানা ট্যাহা দিলে লামতে পারি জলে।

ক্যান মাঝি, জল দেইখ্যা ভয় পাইলা নাকি? মনে মনে যেন একটু রাগ করেই বলে টুনু। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে লোকটা হাসছে।

ভয়? কত পদ্মা—ম্যাঘনা পার হইলাম কর্তা, অখন হালার পুষ্করিণীরে ভয়! দিয়েন কর্তা, বারো আনাই দিয়েন।

পরান মাঝি মাথার গামছাটা খুলে কোমরে জড়াল। এবার খালি মাথাটা দেখতে পেল টুনু। চুলগুলি প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলিও সাদায়—কালোয় মেশানো।

শরীরটা মস্ত বড়ো পরান মাঝির, কিন্তু চামড়াটা ঢিলে, কোঁচকানো। খাটো একটা কাপড় আঁট করে পরা। পায়ের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। কেঁচোর মতো শিরাবহুল মোটা গোড়ালি। পা—গুলি সরু সরু।

খুব আস্তে আস্তে জলটাকে একটুও ঘোলা না করে মাঝি জলে নামতে লাগল। গলা জলে দাঁড়াল মাঝি। এক আঁটি বিচালির মতো সাদা মাথাটা জলে ভাসছে।

টুনু দেখে মাঝির কালো লম্বা শরীরটা প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের মতো নড়ছে জলের নীচে।

হুস করে ডুব দেয় মাঝি। অনেকক্ষণ পর ভেসে ওঠে। টুনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ পাওয়া যায়নি। মুখ থেকে খানিকটা জল 'পিড়িক' করে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় মাঝি। দুপুরের কড়া রোদে সবুজ, ঘন জলের নীচে অনেক নীচে একটা প্রকাণ্ড মাছের মতো পরান মাঝির শরীরটা নেমে যেতে থাকে। তারপর তাকে আর দেখতে পায় না টুনু।

পরান মাঝিকে কুশলী ডুবুরির মতো লাগে টুনুর। যেসব ডুবুরি (সে বইতে পড়েছে) একটুও ভয় না করে সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে। সেই ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো। মুক্তো দেখেনি টুনু, ডুবুরিও না। পরান মাঝিকে দেখে শুধু ডুবুরির কথা মনে হয়।

পরান মাঝির মাথাটা এবার প্রায় মাঝ—পুকুরে ভেসে ওঠে। হাতের মুঠো থেকে খানিকটা কাদা ছুঁড়ে ফেলে পরান মাঝি আবার ডুব দেয়। সেই ছুঁড়ে দেওয়া কাদার মধ্যে কয়েকটা শামুক।

এবার পাড়ের কাছে মুখ তোলে মাঝি। ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, না কর্তা, ঠিক কুনখানে পড়েছে হেইরে না জানলে হইবো না।

টুনু মনে মনে ভয় পায়। ব্যস্ত হয়ে বলে, এইখানেই পড়ছে। তুমি আর একটু খুঁইজ্যা দ্যাখো। ছানের সময় বেশি দূরে যায় নাই মা।

পরান মাঝি হতাশভাবে জলের দিকে একবার তাকায়। ঘাটের সিঁড়িতে ভর দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে, দেখি আর অ্যাকবার! হালার দমে কুলায় না, না হইলে হালার পুষ্করিণীরে— কথাটা শেষ না করেই পিচ্ছিল গতিতে সাপের মতো জলে নামে মাঝি।

এবার পরান মাঝিকে স্পষ্ট দেখতে পায় টুনু। ঘাটের খাড়া পাড়ের কাছে জলটা গভীর। পরান মাঝি প্রকাণ্ড দুটো হাত মাছের পাখনার মতো নাড়তে নাড়তে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গতিটা এবার আর সহজ নয়। খুব আস্তে আস্তে নামছে মাঝি। সবুজ জলের ভিতরে তার পায়ের সাদা তলাটা নড়ছে। পা—দুটো ওপর দিকে আর মাথাটা নীচের দিকে মাঝির।

অনেকটা নেমে প্রায় পুকুরের তলায় মাঝি থেমেছে। টুনু দেখতে পায়, মাঝি খুব সন্তর্পণে মাটিটা দেখছে। একটু পরেই জলটা আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে গেল। কাদা কাদা হয়ে গেল ওপরটা। মাঝিকে আর দেখতে পেল না টুনু।

অনেকখানি জল ছিটিয়ে মাঝি ভেসে উঠল আবার। এবার পাড়ের খুব কাছে। মুখ তুলে দম নেয় মাঝি। বলে, আর একটু কর্তা, দেখি একবার। মনে লয় পাইয়া যামু। কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলতে পারল না মাঝি। হাঁফাতে হাঁফাতে কেটে কেটে বলল। বলেই আবার ডুবে গেল জলের মধ্যে। জলের উপর সাদা কতকগুলি বুদ্বুদ জমা হল। আরও বুদ্বুদ উঠে এল জলের ভিতর থেকে। কাচের মার্বেলের মতো সেগুলি ভাসতে লাগল জলের উপর।

টুনু তাকিয়ে দেখে মাঝি উঠে আসছে। টুনু চেয়ে দেখল মাঝির হাতে মুঠো করা কাদা—মাটি।

পরান মাঝি ভেসে উঠল জলের উপর। ক্লান্ত হাতে জলে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ওপরে।

কর্তা। দম নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে মাঝি বলে, দ্যাখেন তো এইগুলির মধ্যে আছে নাকি!

কাদার মুঠোটা খুলে মাঝি তাকে দেখায়। টুনু কাদার দলাটা হাত বাড়িয়ে নেয়। খানিকটা কাদা কয়েকটা পচা গাছের পাতা, একটু শ্যাওলা শামুক। আর কিছু নেই। টুনু নিশ্বাস ছাড়ল।

না মাঝি নাই তো এর মধ্যে।

কোমরের গামছাটা খুলে মাটিতে বসে সেটা নিংড়োতে থাকে মাঝি। বলে, দ্যাখলাম য্যান দুলের মতোই। খাংলা দিয়া তুললামও। কপালে নাই কর্তা, কী করব্যান!

পরান মাঝির গলার স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে আছে ঠিক এমনি ক্ষীণ স্বরে সে বলে, পারি না কর্তা আর। যখন মাঝি আছিলাম শরীরে জোর আছিল। একদমে নদীর তল থিক্যা মাটি উঠাইতাম, গাঙ পার হইতাম ভরা বর্ষায়। হেইদিন গেছে। অখন মাঝির নাম ঘুচাইয়া রিফিউজি হইছি।

গা মুছতে মুছতে পরান মাঝি টুনুর দিকে তাকায়। টুনু মাঝিকে দেখে। প্রকাণ্ড শরীর কড়া পড়া হাত। অথচ মাঝির হাত দুটো যেন কাঁপছে।

মাটিতে ফেলে রাখা ময়লা সাদা জামাটার পকেট থেকে বিড়ি বের করে পরান মাঝি। সেটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে বলে, আছিলাম পরান মাঝি, একডাকে মাইনষে চিনতে পারত। কুয়ার মইধ্যে লাইম্যা ঘটি—বাটি গলার হার তুলছি, অখনে অ্যাক বুক জলে ডুব দিতেই দম শ্যাষ। বয়স বাড়ছে অখন, শরীলে আর হেই তাকত নাই, প্যাটে ভাত নাই কর্তা।

মাঝি ধোঁয়া ছাড়ে। আর পুকুরপাড়ে ভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে টুনু বাবার কথা ভাবে। বাবা ফিরে এলে যদি জানতে পারে তার মা আজ আর বেঁচে থাকবে না। গাটা শিরশির করে তার। বড়ো দুঃখী মা, টুনু ভাবে মা বড়ো দুঃখী। লোহার মতো শক্ত হাত বাবার, রোমশ বুক, পেট। খালি হায়ে যখন উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে তামাক খায় বাবা, তখন তারা কেউ কাছাকাছি যায় না। মাঝে—মাঝে যখন মাকে মারে বাবা, বিশ্রী গালাগাল দেয়, তখন মা কুঁইকুঁই করে ইঁদুর ছানার মতো কাঁদতে থাকে। বাবার প্রকাণ্ড দেহের দুটো হাতের ভিতর মাকে তখন ইঁদুরের মতোই ছোট্ট আর অসহায় মনে হয় তার।

পরান মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দেয়। বলে, চলি কর্তা কাইল আইয়া আর একবার দেখুম অনে।

টুনু চেয়ে থাকে। জামরুল গাছটার তলা দিয়ে বিন্দু পিসির ঘরে বেড়ার কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে পরান মাঝি চলে গেল। টুনু ভাবে ঠিক তার রোগা, ছোট্ট মায়ের মতোই পরান মাঝিও যেন দুর্বল। খুব দুর্বল।

টুনু জলের দিকে তাকায় এবার। সবুজ জল, ঘন শ্যাওলা। দুপুরের সূর্য অনেকটা হেলেছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখনও দুপুর। গরম লাগছে টুনুর। সে আস্তে আস্তে জলের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

গায়ের শার্টটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে ঘাসের ওপর। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল জলে। কচু গাছ হাওয়ায় দুলছে। কেমন বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ। পানা পুকুরের জলে তার ছায়া পড়ল।

টুনু তার ছায়ার দিকে তাকায়। রোগা লম্বাটে একটা ছেলের ছায়া। ছায়াটা জলের ভেতরে।

একটা ডুবুরির মতো জলের মধ্যে থেকে ছায়াটা তাকে দেখছে। মায়ের কথা ভাবল সে, পরান মাঝির কথাও। আজ সন্ধ্যাবেলা কিংবা অন্য কোনো দিন যখন বাবা টের পাবে তখন মাকে বাবা মারবে। হয়তো এবার মেরেই ফেলবে। কেননা, দুলটা সোনার আর সোনা বলতে তাদের ঘরে ওই দুলজোড়াই।

নীচু হয়ে জলটা দেখতে লাগল টুনু। ইচ্ছে হলে একবার পরান মাঝির মতো ডুবুরি হয়ে খুঁজে দেখে দুলটাকে। কিন্তু সে সাঁতার জানে না। সাঁতার জানলে পাথর—নুড়ি, শ্যাওলা আর গাছের পচা পাতার মধ্যে গিয়ে সবুজ জলে ডুবুরির মতো সে দুলটাকে একবার খুঁজে দেখত।

একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে সিঁড়িতে রাখে সে। ঠান্ডা জলটা সুড়সুড়ি দেয় পায়ে।

টুনু আর এক ধাপ নামে। আর এক ধাপ। হাঁটুর উপর জল এবার। টুনু নীচু হয়।

ঘোলা জলটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সেই ঘন সবুজ রং। জলের নীচে অনেকটা দেখা যাচ্ছে। টুনু চোখটা বড়ো বড়ো করে তাকায়। চোখটা সরিয়ে আনে সিঁড়িগুলির দিকে। একটা, দুটো তিনটে সিঁড়ি স্পষ্ট এবং তারপর আরগুলি ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলি গুনতে শুরু করে টুনু তারপর— চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজের মুখে হাতচাপা দেয় টুনু। স্পষ্ট পরিষ্কার জলের নীচে চতুর্থ সিঁড়িটার ঠিক শেষে বাঁকা আর সুপুরি গাছের দড়ির বাঁধনটার কাছে সোনার দুলটার ছোটো হুকটা চিকমিক করছে। কী আশ্চর্য! কেউ দেখতে পায়নি। টুনু মস্ত বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে থাকে। বুকটা ঢিপঢিপ করে তার।

টুনু ঝপ করে আর এক ধাপ নামল। কোমরের কাছে জলে এবার। প্যান্টটা ভিজে গেল। ঠিক এই ধাপে দাঁড়িয়েই রোজ স্নান করে সে। এর বেশি নামতে সে ভয় পায়। সিঁড়িগুলি খুব উঁচু। আর এক ধাপ নামলেই গলা জল।

কিন্তু দুলটা সে নিজেই তুলবে। চারদিকে তাকায় টুনু। কেউ নেই। আরও দু ধাপ নামলে দুলটা।

টুনু পা বাড়ায়। গলা জল।

টুনু নিশ্বাস টানে। পচা শ্যাওলা আর পানাপুকুর আর মাটির গন্ধ। টুনু পা বাড়ায়।

ঝপ করে পরের সিঁড়িটায় পা রাখতে না রাখতেই টুনু ডুব দেয়।

দুলটা! হাতের কাছেই।

কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে টুনুর।

সে মাথা তোলে।

পায়ের নীচেই সিঁড়িটা। ওপরের ধাপ। গলা জলে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস টানে টুনু।

বুক ভরে বাতাস নেয়। দুলটা তাকেই তুলতে হবে। টুনু তাকায়। জলে ঢেউ।

জল ছলছল করছে গলার কাছে।

সেই ঢেউ আর সবুজ শ্যাওলার ভিতর দিয়ে দুলটা চিকচিক করছে।

টুনু নীচু না হলে হাতে পাবে না।

ডুব দেয় সে। জলের ভেতরে অন্ধকার। জলের ভিতরে সবুজ রঙের অন্ধকার।

পায়ের তলা দিয়ে একটা কি—যেন সড়াৎ করে সরে গেল বোধহয়। মাছ! চমকে ওঠে সে।

হাত বাড়ায় সে। আরও একধাপ।

মুখ থেকে বুদ্বুদ বেরিয়ে গাল ঘেঁষে জলের ওপর উঠে যাচ্ছে।

পরের ধাপে পা দেয় টুনু। নীচু, আরও নীচু হয়।

আর মাত্র এক বিঘত দূরে দুলটা! দম পায় না টুনু। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে।

কোমরের নীচের দিকটা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার মাথাটা নীচে।

পরান মাঝির মতো হাত দুটো দু—দিকে দোলায় টুনু। খুব তাড়াতাড়ি।

দুলের কাছেই হাতটা এদিক—ওদিক চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চাপে টুনু।

দুলটা! কাছেই।

দু—আঙুলের মধ্যে হুক—টা!

একটা হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে সঙ্গে দুলটা তার হাতের মুঠোয় এসে যায়।

যেন অনেক ভার বুকে। টুনু মুঠো—করা হাতটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

হাতের আঙুল আর চামড়া কেটে দুলটা যেন তার হাতের মধ্যেই বসে যাবে।

সিঁড়িটায় পায়ের চাপ দিয়ে টুনু সরে যায়। কোনদিকে যে সরছে, তা বুঝার আগেই চোখে সূর্যের আলো লাগে।

বাতাস! আঃ!

হাঁ করে বুক ভরে নিশ্বাস টানে সে। হাত—পায়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলি শিথিল।

কিন্তু তারপরেই আবার টুনু ডুবতে থাকে। একপলকের জন্য সে দেখতে পায় হাত—দশেক দূরে ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। সে অনেকখানি সরে এসেছে। হাতের মুঠোয় দুলটা।

প্রাণপণে হাত আর পা দিয়ে জলে আঘাত করে সে। তারপর ডুবে যেতে থাকে। হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে আসছে।

আবার মাথা তোলে। ঘাট এমন হাত—ছয়েকের মধ্যেই। কিন্তু টুনুর মনে হল, পুকুরটা যেন বহুবিস্তৃত সমুদ্রের মতো বড়ো হয়ে গেছে। যেন কূলকিনারা কিচ্ছু নেই পুকুরটার। থই নেই পায়ের নীচে। হাতের মুঠো দুলটাকে প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করে।

গাঁটে গাঁটে অসংখ্য ফোঁড়ার যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরটা শিথিল। হাত—পা নাড়তে পারছে না সে। চোখের সামনে সূর্যের আলোটা নিভে গিয়েই জ্বলে উঠছে। কানে শুধু কলকল ছলছল জলের শব্দ।

না, আর জোর নেই শরীরে। আর কিছু নেই। হাতের পেশিগুলি সংকুচিত হচ্ছে না। মুঠোটা আলগা হয়ে আসছে। প্রাণপণে আঙুলগুলিকে বাঁকিয়ে রাখতে চাইছে সে। পারছে না।

প্রাণপণে চিৎকার করতে গেল টুনু। মুখে জল ঢুকল। টুনু ঢোক গেলে।

জল তাকে ঘিরে যেন ঘুরছে। তাকে টেনে নিচ্ছে পাতালের দিকে। কত নীচে যে তলিয়ে যাচ্ছে সে! বেঁকানো আঙুলগুলি জট ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। বুক থেকে সমস্ত নিশ্বাস শুষে নিচ্ছে জল। দম নেওয়ার জন্যে সে হাঁ করে। জল ঢোকে মুখে।

মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে হাতচারেক দূরে ঘাট দেখতে পায় সে। দেখতে পায় এক পাঁজা বাসন হাতে বিন্দুপিসি আসছে ঘাটের কাছে।

তারপর জল আর পাতাল। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট একটা দৈত্যের মতো কার মুখ যেন জলের ভিতরে।....ঝপ করে একটা শব্দ। একটা চিৎকার।

শেষবারের মতো ক্লান্তি, ঘুম আর অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে সে টের পায়, তার শরীরটা আছড়ে পড়লো মাটিতে। বুকটা হালকা। আর ডান হাতের তেলোয় তার মুঠোর মধ্যে শিথিল আঙুলের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়বার আগমুহূর্তে দুলটাকে সে অনুভব করে। দুলটা আছে! হাতেই!

তারপর একটা ছুঁড়ে দেওয়া কালো চাদরের মতো অন্ধকারটা তাকে ঢেকে ফেলল।

টুনু চোখ মেলে চায়। অল্প অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক লোক তাকে ঘিরে, তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। টুনু বুঝতে পারে না কিছুই। মা—র মুখটা সবচেয়ে কাছে। মা কাঁদছে। আর অন্য সকলের ভিড়ের ভিতরে বাবা দাঁড়িয়ে। বাবার পাশেই বিন্দুপিসি। তাকে দেখছে সবাই। সবাইকে একসঙ্গে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে তার। তারপর আস্তে আস্তে মাথার ঝিমুনি ভাবটা কেটে যায়। মনে পড়ে যায় আজ দুপুরবেলায়, ঠিক দুপুরবেলায় জলের অনেক নীচে সে আর সোনার দুলটা একই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছিল।

টুনু চোখ বোজে। ক্লান্তি আর ঘুম।

অনেকক্ষণ পরে তাকায় সে। তার পাশে বাবা। আর কেউ নেই।

আবছাভাবে লণ্ঠনের অল্প আলোয় বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছে সে। মুখটা তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। অল্প দাড়ি বাবার মুখে। কোমল, শান্ত দুটো চোখ।

বাবার রোমশ কঠিন একটা হাত আলতোভাবে তার কাঁধের উপর, আর একটা হাত তার মাথার চুলের ভিতরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

খুব নম্র শান্ত গলায় বাবা বলে, কেমন আছসরে বাবা?

ভালো। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় টুনু।

বাঘের বাচ্চা। বাবা বলে, বাঘের বাচ্চা তুই।

সব কথা বুঝতে পারে না টুনু। তবু চুপ করে থাকে।

রান্নাঘর থেকে মা এ ঘরে এল।

টুনু টুইন্যারে, তর দুধ আনছি। এ বলে মা তার শিয়রের কাছে বসে। মা—র চুলগুলি ছাড়া। আবছা আলো—আঁধারিতে মা—র মুখটা দেখতে পায় সে। আর দেখতে পায় মা—র বাঁ কানের লতিটা আর শূন্য নেই। সেখানে ঝকঝক করে জ্বলছে দুলটা। মা—র মুখটা হাসছে। যেন ভাঙাচোরা হাড়—উঁচু মুখটা বদলে গেছে হঠাৎ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে। মা—র মুখটা অনেক উঁচুতে। দুল দুটো যেন মুক্তো— যে মুক্তো সমুদ্রের অনেক নীচে থেকে কুড়িয়ে আনে ডুবুরিরা।

টুনু নড়ে।

না, তুই উঠিছ না। বাবা বলে।

মা তার কপালের ওপর ঈষৎ তপ্ত একটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলে, উঠিছ না তুই, আমি তরে ঝিনুক দিয়া খাওয়াইয়া দিতাছি।

টুনু তাকায়। ওপাশের মাচাইয়ে বুলকি আর পানু ঘুমোচ্ছে।

টুনু হাঁ করল। দুটো ঠোঁটের কোণে ঝিনুকটা আর মা—র কয়েকটা আঙুল। অল্প গরম দুধটা তার জিভ বেয়ে গলার কাছে নেমে এল। হাসি পেল টুনুর। যেন সে অনেক অনেক ছোটো হয়ে গেছে। যেন সে মা—র কেলে, আর মা তাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে।

শেষবার তার ঠোঁটের পাশ থেকে ঝিনুকটা সরিয়ে নিতে নিতে মা বলে, এই ঝিনুকটা দিয়া ছোটোবেলার তরে দুধ খাওয়াইতাম। তর কি আর মনে আছে?

মার গলাটা কাঁপছে অল্প অল্প। মা—র চোখে বোধ হয় জল।

'হ অর কি মনে থাকনের কথা!' বাবা বলে।

বাবা যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে কথা বলছে। গলার স্বরটা ক্ষীণ। বাবা যেন দুর্বল, কথা বলতে পারছে না। বাবা কাঁদছে? না, বাবা কাঁদছে না। বাবা কোনোদিকে তাকিয়ে নেই। গায়ের চাদরটা দিয়ে দেহটা ঢাকা। চোখ দুটো বন্ধ। ভেজা—ভেজা। অল্প অল্প দুলছে বাবা। ছবিতে দেখা যিশুখ্রিস্টের মতো মুখ বাবার।

হঠাৎ টুনুর মনে হল, খুব সুন্দর তার বাবা। খুব সুন্দর। বহু পরিচিত পুরোনো বাবাকে যেন চিনতে পারছে না সে। এখনই এই আধো—অন্ধকার ঘরে শিয়রের কাছে মা, আর পাশে খুব কাছেই বাবা। খুব কাছাকাছি দুজন। মা আর বাবা।

দুজনেই তাকে ছুঁয়ে আছে।

খুব ক্ষীণ স্বরে, যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে বাবা বলে, মধ্যে—মধ্যে মনে লই যে মরি। অখন মরণ হইলেই ভালো। কিন্তু মাইজ্যা বউ, এত সহজে আমরা মরুম না। আমরা—

আর শুনতে পায় না টুনু। ঘুমে জুড়ে আসে চোখ। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, মা—বাবা আর পরান মাঝি যেন একই রকম দুঃখী, অসহায় দুর্বল। তারা কেউ নিষ্ঠুর নয়।

তারপর সুখী টুনু, তার দুঃখী মা—বাবার মাঝখানে থেকে তাদের শরীরের ওম—এর ভিতরে ডুবুরি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে, আর দুঃখী মা—বাবা তার ছোটো রোগা নরম শরীরে তাদের নিজেদের দেহের

তাপ সঞ্চার করে দিতে দিতে একটা বৃহত্তর কূল—কিনারাহীন অথৈ অন্ধকারের সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে একই দুঃখ—বেদনায় জ্বলতে জ্বলতে খুব ছোট্ট সোনার টুকরোর মতো সুখস্বপ্নের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল।

বানভাসি

পরশুদিন দুপুরে ভাত জুটেছিল। আর আজ এই রাতে। হিসেবে দু—দিন দাঁড়ায়। তবে খিদেটিদে উবে গিয়েছিল জলের তোড়ে তল্লাট ভেসে যেতে দেখে। পরশু থেকে আজ অবধি কাশীনাথ তার নৌকায় কতবার যে কত জায়গায় খেপ মেরে লোক তুলে এনেছে তার লেখাজোখা নেই। রায়চক উঁচু ডাঙা জমি, এইরকম দু—একটা জায়গা ডোবেনি। এখন সেইসব জায়গায় রাসমেলার ভিড়। খেলা মাঠেই বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে মানুষ। কেউ কেউ মাথার উপর কাপড়—টাপড় টাঙিয়ে মাথা বাঁচানোর একটা মিথ্যে চেষ্টা করছে। কেউ বাচ্চাটাচ্চার মাথায় ছাতা ধরে আছে সারাক্ষণ। তাতে লাভ হচ্ছে না। ভিজছে, সব ভিজে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরপর মরবে।

রিলিফ এলে অন্য কথা। কিন্তু তাই বা আসবে কোন পথে। রেল বন্ধ, সড়ক বন্ধ, চারদিকে অথৈ জল।

কুলতলি থেকে একটা পরিবারকে তুলে এনে রায়চকে নামিয়ে ভাঙড়ে যাচ্ছিল আরও কিছু লোককে তুলে আনতে। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, হাত চলতে চাইছে না, কেমন যেন আবছা দেখছে সে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। কাশীনাথ বুঝতে পারছিল আর বেশিক্ষণ নয়। দু—দিন পেটে দানাপানি নেই। জুটবেই বা কোথা থেকে। কাল দুপুরে এক বুড়ি তাকে দু—গাল চালভাজা খাইয়েছিল। আর রায়চকের বাজারে টিউবওয়েল থেকে পেট পুরে জল। সেই কয়লাটুকুতেই শরীরে ইঞ্জিন চলছিল এতক্ষণ। আর নয়। কিন্তু নেতিয়ে পড়লেও চলবে না। বড়ো ড্যামের জল ছেড়েছে, তার স্রোতে নৌকো না সামলালে উলটে যাবে। নয়তো কোন আঘাটায় গিয়ে পাথরে বা গাছে ধাক্কা মেরে নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই নৌকো এখন মানুষের জীবনতরি। ডুবলে চলে?

ঘুমও আসছিল তার। আর বারবার কচুলে পড়ছিল। বইঠা বা লগির উপর হাত থেমে থাকছে বারবার। ফের চমকে জেগে উঠছে। নয়াবাঁধের কাছে নৌকোটা একটু ভিড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুঝে ঘুমের আলস্যিটা ছাড়াতে গিয়েছিল সে। যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়ে গেছে। গোলাগুলির মতো বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে আসছে আকাশ থেকে। ঝলসাচ্ছে মারুনে বিদ্যুৎ।

জামাটা খুলে নিংড়ে নিল কাশীনাথ। ভাঙড়ে এই দুর্যোগে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। নৌকো ডুববে। সে কোমরজলে নেমে নৌকোর বাঁধনটা অন্ধকারেই একটু দেখে নিল। বটগাছের শেকড় শক্ত জিনিস। পাটের মোটা কাছিও মজবুত। নৌকো আর যাবে না। তবে নৌকোর খোলে জল উঠেছে অনেক। ফের নৌকা ভাসাতে হলে জল ছেঁচতে হবে। আপাতত জলেই ডুবে থাক। ভাসন্ত বানে নৌকোর ওপর মানুষের খুব লোভ। জলে ডুবে থাকলে— আর যাই হোক চুরি যাবে না।

বৃষ্টিকে ভয় খেয়ে লাভ নেই। জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে সাদা হয়ে গেছে। সে নেমে পাড়ে উঠল। নয়াবাঁধ চেনা জায়গা। দু—পা এগোলেই হাটের অন্ধকার কয়েকটা চালাঘর। সেখানে এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে বানভাসি মানুষের ভিড়। তারপর বসতি, চেনাজানা কেউ নেই এখানে। তার দরকারও নেই। সে বটতলা থেকে আর এগোল না। একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসে পড়ল। ঘুম নয়, একটু ঝিমুনি কাটানো দরকার।

ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মুখের উপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল, কে রে? কে ওখানে?

চমকে সোজা হল কাশীনাথ। সামনে ছাতা মাথায় কয়েকজন লোক। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হল না, তবু আন্দাজে বুঝল, এলেবেলে লোক নয়।

কাশীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। সে কাশীনাথ, কিন্তু এর বেশি তো আর কিছু নয়!

তা সেটা তো আর দেওয়ার মতো কোনো পরিচয়ও নয় তার।

কাশীনাথ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আজ্ঞে। চোর চ্যাঁচড় নই, নৌকো বাই।
মাছ ধরো?
আগে ধরতুম। এখন হাটেবাজারে মাল নিয়ে যাই।
কে একজন চাপা গলায় বলল, ওলাইচণ্ডীর কাশীনাথ।
সামনের লোকটা বলল, ও, এই কাশীনাথ!
কাশীনাথ খুব অবাক হল। এরা তাকে চেনে! কী করে চেনে? তাকে চেনার কথাই তো নয়।
তোমার নৌকো কোথায়?
বটগাছে বেঁধে রেখেছি। শরীরে আর দিচ্ছিল না বলে একটু ডাঙায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বাবু। দোষ হয়ে থাকলে মাপ করে দেবেন। না হয় চলেই যাচ্ছি।
আরে না না, দোষের হবে কেন? তবে এটা কি আর জিরোনোর জায়গা? তুমি তো মেলা লোকের প্রাণ রক্ষে করেছ হে বাপু।
করেছে নাকি কাশীনাথ? প্রাণরক্ষে করা কি সোজা কথা? প্রাণ বাঁচানোর মালিক ভগবান। সে কিছু লোককে বানভাসি এলাকা থেকে তুলে এনে ডাঙা জমিতে পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। তারা যে কীভাবে বেঁচে থাকবে তা সে জানে না। কাশীনাথ টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল, ভাঙড়ের দিকে যাচ্ছিলাম বাবু, তা শরীরে বড্ড মাতলা ভাব। তাই—
বুঝেছি। বলি দানাপানি কিছু পেটে পড়েছে?
ওসব তো ভুলেই গেছি। কারই বা দানাপানি জুটছে বলুন। সব দাঁতে কুটো চেপে শুধু ডাঙা খুঁজছে।
লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বটে হে। লোকের দুর্দশা দেখলে আঁত শুকিয়ে যায়। নয়াবাঁধে তবু আমরা কিছু চিঁড়ে—গুড় আর খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছি। দিন দুই হয়তো পারা যাবে। রিলিফ না এলে তারপর কী যে হবে কে জানে।
কাশীনাথের পায়ে অন্তত গোটা সাতেক জোঁক লেগেছে। সে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেগুলিকে উপড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, সে আর ভেবে কী হবে! কিছু তো মরবেই।
তা বাপু, বলি কি, তোমার পরিবার—পরিজন সব কোথায়?
কেউ নেই বাবু। আমি একাবোকা মানুষ।
ঘরদোর?
ওলাইচণ্ডীতে আছে একখানা কুঁড়ে। তা সেটাও বন্যার তোড়ে ফি—বছর ভেসে যায়। এবারেও গেছে। এখন নৌকোই ঘরবাড়ি বাবু।
লোকটা একটু হাসল। বলল, আমাকে চেন? আমি হলাম নয়াবাঁধের সাধুচরণ মণ্ডল।
কাশীনাথ তটস্থ হয়ে বলল, বাপ রে! আপনি তো মস্ত মানুষ বাবু।
হেঁ হেঁ। নামটা শোনা আছে তা হলে।
খুব খুব। তল্লাটের কে না চেনে বলুন।
আমি একটু মুশকিলে পড়েছি যে কাশীনাথ। তোমাকে যে পেলুম তা যেন ভগবানের আশীর্বাদে। বলছিলুম কী, মংলাবাজার চেন?
খুব চিনি। নিত্যি যাতায়াত।
সেইখানে কয়েকজনকে পৌঁছে দিতে হবে। নয়াবাঁধে এসে আটকে পড়েছে।
এই সাংঘাতিক স্রোতে নৌকো ছাড়তে রাজি হচ্ছে না মাল্লারা।
তা স্রোত আছে বটে! তোমার মতো একজন ডাকাবুকো লোকই খুঁজছিলাম আমি। যদি পৌঁছে দিতে পার তবে ভালো বকশিশ পাবে।

বকশিশের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, এ তো ভগবানের কাজ বাবু। বকশিশ কীসের? ওসব লাগবে না।

বলো কী? পয়সা হল লক্ষ্মী। তাকে ফেরাতে আছে?

অতশত জানি না বাবু। তবে এ সময়টায় পয়সার ধান্ধা করতে মন সরছে না।

মানুষের যা দুর্দশা দেখছি। আমি পৌঁছে দেব খন।

তাহলে এসো, আমার বাড়িতে চাট্টি ডালভাত খেয়ে নাও। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, না খেলে পেরে উঠবে না।

ঠিক আছে, চলুন।

সাধুচরণের বাড়িখানা বিশাল। প্রকাণ্ড উঠোনের তিনদিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। পাঁচ—সাতখানা হ্যাজাক জ্বলছে। উঠোনে ত্রিপলের নীচে বড়ো বড়ো কাঠের উনুনে মস্ত লোহার কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। চারদিকে মেলা লোকলস্কর, মেলাই চেঁচামেচি। বৃষ্টির মধ্যেই বাঁশে ঝুলিয়ে খিচুড়ির বালতি নিয়ে লোক যাচ্ছে পিছনের উঠোনে বানভাসিদের খাওয়াতে।

সাধুচরণ তাকে নিয়ে ঘরে বসাল। বলল, গা মুছে নাও। বড্ড ধকল গেছে তোমার হে। শুকনো কাপড় পরবে একখানা?

কাশীনাথ হাসল, তাতে লাভ কী? আমাকে তো ঝড়ে—জলে বেরোতেই হবে।

তাই তো।

দশ—পনেরো মিনিটের মধ্যেই শালপাতা আর গরম ভাতের হাঁড়ি চলে এল।

সাধুচরণ বলল, তোমাকে ওই লঙ্গরের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি না বাপু।

কাশীনাথ তার খাতির দেখে একটু অবাকই হচ্ছে।

পেটে রাক্ষুসে খিদে ছিল, কিন্তু ভাতের গ্রাস মুখ পর্যন্ত পৌঁছোতেই কেমন গা গুলিয়ে উঠল তার। মনে হল, এই খাওয়ানোটার ভিতরে একটা অহংকার আছে।

খাও খাও, পেট পুরে খাও হে।

ডাল ভাত ঘ্যাঁট এবং পুঁটি মাছের ছোল— আয়োজন খারাপ নয়। কিন্তু কাশীনাথ পেট পুরে খেতে পারল কই? কত মানুষের উপোসি মুখ মনে পড়ল। কত বাচ্চার খিদের চেঁচানি। ঘটির জলটা খেয়ে সে উঠে পড়ল। পাতে অর্ধভুক্ত ভাত—মাছ পড়ে রইল। পাতাটা মুড়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এসে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘটির জলে আঁচিয়ে নিল।

সাধুচরণ কোথায় গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, এই অন্ধকারে তো আর মংলাবাজার যেতে পারে না। বারান্দার কোণে চট পেতে দিতে বলেছি। শুয়ে ঘুমোও। কাল সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়ো।

এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হয় না। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তারপর চটের বিছানায় হাতে মাথা রেখে মড়ার মতো ঘুম।

কাকভোরে ঘুম ভাঙল। বাড়ি নিঝুম। এখনো আলো ফোটেনি। সে বসে আড়মোড়া ভাঙল। গা—গতরে ব্যথা হয়ে আছে। তবে কালকের চেয়ে অনেক তাজা লাগছে। অনেক জ্যান্ত। সে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কিশোরী মেয়ে,পরনে একখানা হাঁটুঝুল ফ্রক। আবছা আলোয় যতদূর দেখা গেল, মেয়েটি রোগাটে।

তুমিই আমাকে মংলাবাজারে নিয়ে যাবে?

তা তো জানি না। সাধুচরণবাবু বললেন, কাদের যেন পৌঁছে দিতে হবে।

আমাকে আর পিসিকে।

তা হবে।

পিসি পৌঁছোবে। কিন্তু আমি জলে ঝাঁপ দেব। আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কাশীনাথ হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, জলে ঝাঁপ দেবে! কেন?
মরব বলে।
মরারই বা এত তাড়াহুড়ো কীসের?
সব কথা বলার সময় নেই। তবে এটুকু জেনো, আমি জ্যান্ত অবস্থায় মংলাবাজারে যাব না। সারারাত জেগে বসে ওই জানালা দিয়ে তোমাকে লক্ষ করেছি, কখন ঘুম ভাঙে।
তুমি কি সাধুচরণবাবুর কেউ হও?
আমি ওঁর ছোটো মেয়ে বিলাসী।
বটে! তাহলে তোমার দুঃখ কীসের? মরতে চাইছ কেন?
সে অনেক কথা। কাল রাতে নয়নের সঙ্গে আমার পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যা হয়ে সব ভেস্তে গেল। বাবা টের পেয়ে আমাকে মংলাবাজারে মামাবাড়িতে পাচার করতে চাইছে। বিয়েও ঠিক করে ফেলেছে।
এ তো সাংঘাতিক ঘটনা।
তাই বলে রাখছি তোমাকে, আমি কিন্তু মরব। তুমি কিন্তু দায়ী হবে।
আমাকে কী করতে বলছ?
বললে শুনবে?
বলেই দেখো না।
গোবিন্দপুর চেন?
কেন চিনব না?
আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও।
সেখানে কী আছে?
ওটাই নয়নের গাঁ। কাছেই। বন্যা না হলে আধঘণ্টা হাঁটলেই পৌঁছানো যেত।
কাশীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গোবিন্দপুরের অবস্থা কী তা জানি না।
যদি ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে তোমার নয়ন কি আর সেখানে বসে আছে?
তবু আমাকে যেতে হবে। এ বাড়ি থেকে না পালালে আমি বাঁচব না।
তারপর আমার কী হবে জান? সাধুচরণবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন কি? মস্ত সার্জেন, চারদিকে নামডাক। লোকলস্কর থানা—পুলিশ সব তাঁর হাতে।
আমার হাতে এই সোনার বালাটা দেখছ। তিন ভরি। আমার দিদিমা দিয়েছিল। এটা তোমাকে দিচ্ছি।
পাগল! ও সব আমার দরকার নেই।
মা শীতলার দিব্যি আমায় যদি না নিয়ে যাও।
উঃ, কী মুশকিল!
শুনেছি তুমি নাকি খুব সাহসী লোক। অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। আমাকে বাঁচাতে পারবে না? এমনকী শক্ত কাজ?
তুমি নয়নের কথা ভেবে দুনিয়া ভুলে বসে আছ। আমার তো তা নয়। আমাকে যে আগুপিছু ভাবতে হয় গো!
হঠাৎ মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করল।
কী মুশকিল!
পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চলো। আমার যে বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।
দেখ বিলাসী, যদি ধরো তোমাকে গোবিন্দপুর নিয়েই যাই, তা না হয় গেলুম।
কিন্তু যদি নয়নকে খুঁজে পাওয়া না যায় তখন তোমাকে ঘাড়ে করে আমি কোথায় কোথায় ঘুরবো?

ঘুরতে হবে না। যেকোনো ঘাটে নামিয়ে দিয়ো। আমি ভিক্ষে করে হোক, দাসীগিরি করে হোক, চালিয়ে নেব। বন্যার জল নামলে ঠিক নয়ন এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

আর ইদিকে আমাকে হাতে হাতকড়া?

তোমার কিছু হবে না, দেখো। মা শীতলা তোমার ভালো করবেন।

ভগবান তখনই ভালো করেন যখন আমরা ভালো করি। বুঝলে!

তোমার পায়ে পড়ি।

বড্ড মুশকিলে ফেললে।

নইলে যে আমি মরব।

কাশীনাথ মৃদু স্বরে বলে, সে তোমার কপালে লেখাই আছে।

চলো না। লোকজন উঠে পড়লে যে আর হবে না।

ঠিক আছে। চলো। রাবণে মারলেও মারবে, রামে মারলেও মারবে।

ভোর—ভোর নৌকো ছাড়ল কাশীনাথ।

মেয়েটা উলটো দিকে বসা। তাকে বইঠা ধরিয়ে লগি দিয়ে অগভীর জলে নৌকো ঠেলে নিচ্ছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হচ্ছে। লোকজন টের পেলে তাড়া করবে। কাশীনাথের ঘাম হচ্ছে খুব।

ডাঙাপথে গোবিন্দপুর যতটা দূর, জলপথে তত নয়। সাঁ করেই চলে এল তারা। সুপারি, নারকেল গাছ, কয়েকটা দালানের উপর দিকটা ছাড়া গোবিন্দপুর গাঁ নিশ্চিহ্ন।

দেখলে তো, কী বলেছিলাম!

মেয়েটা তার পুঁটুলি কোলে নিয়ে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে। দু—চোখে জলের ধারা।

এবার কী করবে বলো!

মেয়েটা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

কিশোরী মুখখানি এখন ভোরের আলোয় পদ্মফুলের মতো সুন্দর দেখাল।

কান্নায় ভরাট গলায় বলল, কোথাও নামিয়ে দাও আমায়, যেখানে খুশি।

কাশীনাথ একটু ভেবে বলল, শোনো মেয়ে, নামিয়ে দিলে তোমার বিপদ হবে।

তার চেয়ে চলো, আমি ভাঙড়ে যাচ্ছি কিছু লোককে তুলে আনতে। তাদের পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা মরে যাবে। তারপর তোমাকে সাঁঝের পর বরং নয়াবাঁধেই নামিয়ে দেব। বাড়ি চলে যেয়ো।

বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দু—চার ঘা মারবে হয়তো। কিন্তু আবার ভালোও বাসবে। বাড়ি হল আশ্রয়। আমাকে দেখ না, আমি এক লক্ষ্মীছাড়া। ভাববার কেউ নেই।

মেয়েটা গুম হয়ে বসে রইল।

কাশীনাথ ভাঙড়ে গেল। বানভাসি লোক তুলল। তাদের পৌঁছে দিল ডাঙা—জমিতে। রায়চকে আজ রিলিফের খিচুড়ি দিচ্ছিল। বিলাসীকে নিয়ে নেমে পড়ল কাশীনাথ। বলল, চাট্টি খেয়ে নাও। আর জুটবে কিনা কে জানে!

মেয়েটা আপত্তি করল না। খিচুড়িও খেল পেট ভরে। তারপর বলল, জান, আমি এভাবে লঙ্গরখানায় বসে খাইনি কখনো। আমার বেশ লাগছে। মানুষের কী কষ্ট, তাই না?

খুব কষ্ট?

কাছেপিঠে থেকে আরও দুটো খেপ মেরে কিছু লোক এনে ফেলতে হল কাশীনাথকে। সঙ্গে সারাক্ষণ বিলাসী।

কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে, কষ্টও হচ্ছে। একটা কথা বলব?

কী?
আমি নয়নের দেখা পেয়েছি।
অ্যাঁ। কোথায় দেখা পেলে? বলোনি তো!
রায়চকে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।
বলে না কেন? ধরে আনতাম।
মাথা নেড়ে বিলাসী বলে, তাকে আমার আর দরকার নেই যে!
সে কী। তার জন্যই না বিপদ ঘাড়ে করে বেরিয়ে এলে!
সে এসেছিলুম। এখন এত মানুষ আর তাদের কষ্ট দেখে মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে নয়নও আমাকে চায় না।
বাঁচালে। তাহলে চলো নয়াবাঁধে তোমাকে রেখে আসি।
বিলাসী ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।
নৌকো বাইতে বাইতে কাশীনাথ বলল, বাবার মারের আর ভয় পাচ্ছ না?
বিলাসী আনমনে দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বাবা আর কতটুকু মারবে?
ভগবান যে তার চেয়েও বেশি মেরেছে এত মানুষকে!
কাশীনাথ একটু হাসল।

হাতুড়ি

রতন নাকি?

আজ্ঞে।

খবর কীরে!

খবর নাই।

তার মানে? চিঠিটা দিসনি?

কারে দেব? তিনি বাড়িতে থাকলে তো!

কোথায় গেছেন?

কোন চুলোয় গেছেন তা কে জানে! কিম্ভূত জায়গায় পাঠিয়েছিলেন বাপ, এই মারে কি সেই মারে। যেন চোর। তিনটে বাঘাকুত্তার সে কী চিল্লামিল্লি, শেকল ছিঁড়ে ঘাড়ে এসে পড়ে আর কি। বুকের ভিতর তখন থেকে ধড়াস ধড়াস।

দরজা খুলল কে?

কে জানে কে। চাকরবাকরই হবে বোধহয়। তার সে কী পুলিশের মতো জেরা। কোথা থেকে আসা হচ্ছে, নাম কী, নিবাস কোথায়, কী প্রয়োজন। কথা শেষ করার আগেই প্রশ্ন করে। আর সে কী তাড়াং তাড়াং চোখ রে বাবা!

তারপর?

সে কিছু কবুল করল না। "দাঁড়াও" বলে দরজা দিয়ে ভিতরে গেল। পাঁচ—সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খুলে এক মহিলা দাঁড়ালেন এসে।

সে কেমন?

দেখতে—শুনতে খারাপ নয়। ফরসা, লম্বা, মুখখানাও ঢলঢলে। হলে কী হয়, ওই চেহারাখানাই যা দেখনসই। মেজাজে একেবারে দুর্বাসা।

সর্বনাশ! চিঠিটা কি ওর হাতেই দিলি নাকি?

পাগল! আপনার বলা ছিল দুলাল ছাড়া কারও হাতে চিঠি দেওয়া চলবে না।

সে আমার খুব মনে ছিল। তবে মেয়েটা এমন চেঁচিয়ে সব কথা বলছিল যে আমার ধাত ছাড়ার উপক্রম। বরাবরই জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে আসছি, আর কে পাঠিয়েছে।

কিছু বললি?

না। শুধু একটা কথাই ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে বলা, হাটখোলা থেকে আসছি, দুলালবাবুর সঙ্গেই দরকার। সেই কথাই হাজার বার ধরে বলাল। চোখে ফুটিল সন্দেহ।

তারপর কী হল?

ভদ্রমহিলা বলল, আপনাকে আমার সন্দেহ হয়েছে, দাঁড়ান, পুলিশে খবর দেব।

ও বাবা। তুই কী বললি?

ভয় খেয়ে বললাম, আমার দোষটা কোথায় হল বলবেন? এসেছি দুলালবাবুর কাছে একটা দরকারে, তা এমন করছেন কেন? পুলিশে খবরই বা দেবেন কেন? চুরি—ডাকাতি তো করিনি। বারবারই জিজ্ঞেস করে দুলালবাবুর সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক।

তুই কী বললি?

বললাম, চেনাজানা আছে। বিষয়কর্মেই আসা। আচ্ছা দাদা, এ মহিলাটি কে?
ওর নাম পলা।
ওর নাম দিয়ে কী হবে? মহিলা আসলে কে?
ও দুলালের বউদি।
অ, তাই বলুন। দু—ভায়ে ঝগড়া বুঝি!
না, কোনো ঝগড়া নেই। দুলালের দাদা রামলালকে পলা বছর খানেক আগেই নিজের হাতে মেরে ফেলেছে।
উরেব্বাস! বলেন কী?
রামলাল আর পলার বনিবনা ছিল না।
দশ বছর বিবাহিত জীবনে ওদের এক ঝগড়ার মধ্যে রামলাল কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়ে— সেদিন তার বিস্তর খাটুনি গেছে— চোখ বুঁজে বিছানায় পড়ে ছিল। সেই সময়ে পলা একটা হাতুড়ি দিয়ে তার কপালে মারে।
উরেব্বাস!
খুন করার ইচ্ছে হয় তো ছিল না। কিন্তু রামলাল ক্ষীণজীবী মানুষ ছিল। ওই এক ঘায়েই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।
থানাপুলিশ হয়নি?
না। তার কারণ ওদের হাতে একজন ডাক্তার ছিল। সে প্রথমে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে চায় নি। তাকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কাকুতি—মিনতি করে রাজি করানো হয়। মাথার ক্ষতটা খুব একটা চোখে পড়ার মতোও ছিল না। ডেথ সার্টিফিকেটের জোরে রামলালকে সৎকারও করা গিয়েছিল।
এ যে পতিঘাতিনী সতী!
বলেছি তো, রামলালকে খুন করার ইচ্ছে পলার হয়তো ছিল না। খুনটা অ্যাক্সিডেন্টাল।
আপনি কিছু করলেন না?
কী করব?
উকিল মানুষ, কত কী করতে পারতেন।
পারতাম বটে, কিন্তু তাতে ওদের কচি ছেলেটা ভেসে যেত। সবদিক বিবেচনা করে কেসটা আর করিনি। তবে সন্দেহ হওয়ায় নিজেই খানিকটা তদন্ত করেছিলাম। ডাক্তার পাল আমার কাছে কবুলও করে ফেলেছিল যে, মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না।
আপনাকে আমি ভালো করে বুঝতেই পারি না। কেমন মানুষ আপনি বলুন তো!
কেমন মানুষ বলে তোর মনে হয়?
সময় সময় বেশ ভালো, সময় সময় কেমন যেন।
ঠিক ধরেছিস।
এখন দুলালবাবুকে লেখা চিঠিটা কী করব?
রেখে দে। দুলাল ফিরলে গিয়ে দিয়ে আসবি।
ও বাবা, ও বাড়িতে আবার? হাতুড়িবাজ মহিলার খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে জেনেই যে ভয় লাগছে।
যে চাকরটা প্রথম দরজা খোলে সে কেমন?
বড়োসড়ো চেহারা, মাঝবয়সি।
ও হচ্ছে গেনু।
আপনি চেনেন?
হ্যাঁ।
লোক কিন্তু সুবিধের নয়।

জানি। তবে গেনু পলাকে কোলে করে মানুষ করেছে। পলাকে ও বুক দিয়ে আগলে রাখে। বাবার মতোই।

দুলালবাবুর সঙ্গে আপনার জরুরি দরকারটা কীসের?

দুলালের এখন ও বাড়ি ছাড়া উচিত। ও বোকা বলে বুঝতে পারছে না, ও বাড়িতে ও আর নিরাপদ নয়।

কেন বলুন তো!

গেনুর জন্য।

বুঝলাম না।

গেনু দুলালকে ঘেন্না করে।

বাড়িটা পলা গাপ করতে চায় বুঝি?

না। পলা আর দুলাল দুজনে দুজনকে চায়।

বলেন কী দাদা! এ তো রোমাঞ্চকর নাটক!

জীবনটাই নাটক।

এইটুকু বলেই থামলেন কেন? বাকিটা বলুন।

আঁশটে গন্ধ পাচ্ছ বুঝি? মানুষ আঁশটে গন্ধ খুব ভালোবাসে। অবৈধ সম্পর্ক, কেচ্ছা—কেলেঙ্কারি, বউ ভাগানো মানুষের কাছে খুব রুচিকর।

লজ্জা দেন কেন দাদা! লোক শুঁটকি মাছ খায়, হিং খায়, পেঁয়াজ—রসুন খায়, বিট লবণ খায়— তা এসবের গন্ধ তো আসলে নিঘিন্নে নানা দুর্গন্ধেরই এপিঠ— ওপিঠ। তবু কি ভালোবেসে খায় না?

তা বটে।

মনে হচ্ছে রামলালের খুনের পিছনেও এইটেই কারণ, তাই না?

না হে, রামলাল বেঁচে থাকতে দুলাল পিকচারে আসেনি। সে তখন পাহাড়—পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরাবরই ডাকাবুকো, বরাবরই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। লম্বা সাঁতারে খুব নাম ছিল। ভালো অ্যাথলিট। তারপর কয়েক বছর ধরে তার পেশা হয়েছে পাহাড়ে চড়ার। চড়েছেও অনেক পাহাড়ে। বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে ভালোবাসে। সে ঘরেই থাকেনি কখনো। পলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার মতো সুযোগ ছিল না।

তা হলে?

রামলাল মারা যাওয়ার পর খবর পেয়ে দুলাল ফিরে এল। সে খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দাদার মৃত্যু যে হার্ট অ্যাটাকে হয়নি তা অনুমান করতে দেরি হল না তার। পলার ভাবগতিক দেখেও সন্দেহটা হয়ে থাকবে। পলা তখন নিজের কৃতকর্মের জ্বালায় পাগলের মতো আচরণ করছিল। শোকের ওই বাড়াবাড়িটাও স্বাভাবিক ছিল না। কারণ পলা এবং রামলালের মধ্যে সম্পর্কটা যে মধুর ছিল না তা সবাই— যারা ওদের চিনত— জানে। দুলাল বউদিকে নানাভাবে লক্ষ করে বুঝতে পারল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তখন সে একদিন আমার কাছে আসে।

পাহাড়ে কি সে আপনার সঙ্গেও চড়ত?

তা ঠিক। দুজনে আমরা হিমালয়ে অনেক পাহাড়ে চড়েছি। পরে সে অবশ্য অন্য দলের সঙ্গে জুটে যায়। আমিও ওকালতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দুলালের চেয়ে আমি প্রায় দশ বছরের বড়ো।

সে আপনাকে এসে কী বলে?

সে বলে যে, পলার আচরণ তাকে সন্দিহান করে তুলেছে। সে অবশ্য গেনুকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমি কিছু ভাবনাচিন্তার পর বুঝতে পারি, কাজটা গেনুর নয়।

কী করে? চাকরটাও তো বেশ গুন্ডা গোছের।

গেনুকে আমি চিনি।

গেনু কী ভালো লোক? এই যে বললেন সে দুলালকেও খুনও করতে পারে!

ঠিক কথা। গেনু খেপে গেলে ভয়ংকর। কিন্তু একটা কথা কী জানিস? গেনু কিন্তু রামলালকে খুব ভালোবাসত। খুব। রামলাল এমনিতে পলার সঙ্গে ঝগড়া করত বটে, কিন্তু মানুষটা খুব খাঁটি ছিল। আরও একটা কথা, সে প্রাণ থাকতে পলাকে বিধবা করবে না।

আপনি তো জন্মেও ও বাড়িতে যান না, তবে এতসব জানলেন কী করে বলুন তো!

শুনে শুনে জানি।

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিশ্বাস না হওয়ার কী?

এই যে বললেন গেনুকে আপনি চেনেন। কীভাবে চেনেন?

গেনু আগে আমার কাছে আসত।

কেন আসত?

এমনি। রামলাল পাঠাত কোনো খবর—টবর দিয়ে। তখন গেনু এসে অনেক কথাটথা বলত।

আর পলা?

বন্ধুর বউ হিসেবে ওই একটু যা পরিচয়। দু—একপ্রকার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

সে কী বরাবরই এমন খান্ডারনি ছিল?

একটু রোখাচোখা ছিল বই কী।

লোককে মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে দিত।

কী করে জানলেন?

ওই নানাভাবে জানা।

রামলাল মরার পর ও বাড়িতেই আপনি যাননি?

না। আমি তখন আমেরিকায় ছিলাম। ঘটনার মাসখানেক বাদে ফিরে জানতে পারি।

তখন যাননি।

না। গিয়ে কি লাভ হত বল!

যেতে তো পারতেন। শত হলেও রামলাল আপনার বন্ধু ছিল।

এমনি যাইনি। গেলে মনটা খারাপ হত।

পলা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?

না।

এবার দুলালের কথাটা শেষ করুন।

হ্যাঁ, দুলাল। দুলাল যখন আমাকে সব কথা বলল তখন আমার সন্দেহ হল পলাকে। দুলালের সন্দেহ গেনুকে। আমি আমার সন্দেহের কথা দুলালকে বলিনি। দুলাল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গেনুর ওপর চড়াও হয়েছিল। থানা—পুলিশ করারও চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমাণ তার হাতে ছিল না। আমি ডাক্তার পালকে ডাকিয়ে অভয় দিয়ে তার পেট থেকে কথা বের করি। তবে ডাক্তার পালও জানে না খুনটা কে করেছে। তার সন্দেহও গেনুর দিকেই। ব্যাপারটা এরকম জায়গাতেই ঝুলে আছে।

সত্যটা কেবল আপনি জানেন?

তা বলছি না। সত্য জানা সহজ নয়। তবে জোরালো অনুমান।

তবে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

পাগল! বলেছি তো, পলার জেল হলে ওর ছেলেটা ভেসে যাবে। তা ছাড়া প্রমাণও তো কিছু নেই।

দুলালের সঙ্গে পলার ভাব হল কী করে?

দুলাল যখন এল তখন পলার মানসিক অবস্থা ভয়ংকর। সেই অবস্থায় দুলাল তার বউদিকে খুব আগলে রেখেছিল। সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করানো, বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মন ভালো রাখার জন্য নানা

ব্যবস্থা করা— সব করেছিল। আর পলাও ওর মধ্যে একটা খুব নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পায়।

তারপর?

ঘি আর আগুন। বুঝলি?

বুঝেছি।

ও দু—জন দু—জনকে বেশ আঁকড়ে ধরেছে।

বিয়ে করবে?

এখনো ততটা এগোয়নি। তবে আমার অনুমান, ওরা সেদিকেই এগোচ্ছে।

সেটা গেনুর পছন্দ নয়।

তাও বোঝা যাচ্ছে। গেনুর দুলালকে পছন্দ হওয়ার কথাও নয়।

ঠিক। গেনু চায় না যে, পলা ফের বিয়ে করুক।

আচ্ছা, গেনু কি জানে যে, রামলালকে পলা খুন করেছে?

বোধহয় জানে। সেই সময়ে গেনু বাড়িতে ছিল। হাতুড়িটাও সে—ই সরিয়ে ফেলে।

হাতুড়ি দিয়েই যে খুন করা হয়েছিল তা আপনি জানলেন কী করে?

অনুমান।

আপনার দেখছি সবই অনুমান।

অনুমানও একটা দামি জিনিস। ঠিকমতো লজিক্যালভাবে অনুমান করতে করতে সত্যে পৌঁছানো যায়।

খুনের সময় আপনি এ দেশে ছিলেন না, এক মাস বাদে ফিরে এসে শুধু কানে শুনেই অনুমান করতে লেগে গেলেন, এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

তোর দেখি খুব সন্দেহই হয়েছে।

আপনার সঙ্গে থেকে—থেকেই হয়েছে। চামচাগিরি তো সেই কত বছর ধরে করছি।

বাজে কথা। আগে তো তুই নানা ধান্ধায় ঘুরতি, আমাকে এসে মাঝে—মাঝে একটু সেলাম বাজিয়ে গেছিস। গত ছয় মাস ধরে দেখছি একটু কাজে মন হয়েছে।

ওকালতি আমার ভালো লাগে না দাদা, এ কর্ম আমার হওয়ার নয়। অত আর্টিকেল আর সাব ল মনে রাখতে গেলে প্রাণটা শুকিয়ে যাবে।

আমারও কি তাই হয়েছে বলে তোর ধারণা?

সত্যি কথা বলব?

বলেই ফেল।

আপনি তো পা থেকে মাথা অবধি রসকষহীন লোক। বিয়েটা অবধি করলেন না। দিন—রাত আইনের বই, মক্কেল আর মামলা নিয়ে পড়ে আছেন। আপনার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও না তাই হয়।

ওরে, আইনের মধ্যে যে—রস আছে তার সন্ধান তো পাসনি। পেলে দেখতি বাইরে চেহারা খেজুর গাছের মতো হলে কী হয়, ভিতরটা টইটম্বুর।

সে রস আপনার থাক, আমার দরকার নেই। যা বলছিলেন বলুন।

ওই তো। বলা তো হয়ে গেছে।

না, হাতুড়ি কথাটা শেষ করেননি।

হ্যাঁ, হাতুড়ি। হাতুড়িটা তো আমার অনুমান। শিলনোড়ার নোড়াটাও হতে পারে, আধলা ইটও হতে পারে। মোটা কাঠের রুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

কথা ঘোরাচ্ছেন কিন্তু।

মানুষ মারতে যেকোনো অস্ত্রই যথেষ্ট। তবে আবার বলছি, রামলালের মৃত্যুটা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয়নি।

সে তো কয়েকবারই বললেন।
তুই প্রসঙ্গটা থেকে সরছিস না কেন?
সরতে বলছেন কেন?
খুন জখম কী ভালো প্রসঙ্গ?
আপনি নিজেই তো ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার, খুনজখম নিয়েই তো আপনার কারবার। সেইজন্যই তো মাঝে—মাঝে হাঁফ ছাড়তে ইচ্ছে যায়।
তবু হাতুড়িটার কথা আমি জানতে পাই। মারণাস্ত্রটা যে একটা হাতুড়িই সেটা আপনি খুব ভালো করেই জানেন। কী করে জানলেন?
না শুনেই ছাড়বি না?
কেউ ছাড়ে এই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট?
গেনুই বলেছে।
গেনু পলাকে অত ভালোবসে, সে কেন বলে দেবে আপনাকে?
না বললে যে তার ঘাড়ে দায় বর্তায়।
তার মানে আপনি তাকে জেরা করে করে জেনেছেন।
তাই বটে।
লোকটা কী বোকা?
না তা নয়। আসলে পলাকে সে মেয়ের মতোই ভালোবাসে। সে একটু প্রাচীনপন্থী লোক। একটা মেয়ে তার স্বামীকে খুন করেছে— এটাই তার কাছে একটা ভয়ংকর ব্যাপার। পলাকে পাপমুক্ত করার কথাই সে ভেবেছিল। আমার কাছে যখন এসেছিল তখন কথাবার্তায় কিছু অসংগতি পেয়ে আমি তাকে ধীরে ধীরে কবুল করতে বাধ্য করি। সে সবই স্বীকার করে। এমনকী পরদিন হাতুড়িটা অবধি আমাকে এনে দেয়।
বলেন কী? সেটা কোথায়?
আমার কাছেই আছে। হাতুড়িতে পলার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, রামলালের রক্তের চিহ্নও। আমি সব ফরেনসিকে পরীক্ষা করিয়ে ডকুমেন্টসহ রেখে দিয়েছি।
তবু কিছু করলেন না?
না। এগুলি দিয়েও খুনটা প্রমাণ হওয়ার নয়। রামলাল মারা গেছে এবং প্রসঙ্গটা খুঁচিয়ে তোলা অর্থহীন।
আপনি অত উদার লোক নন দাদা। আমার মনে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।
হ্যায় তো হ্যায়, ছেড়ে দে।
এবার প্রেমের ব্যাপারটা খুলে বলুন।
বলেছি তো। গত কয়েক মাস ধরে পলা আর দুলাল দু—জনে দু—জনকে খুব আঁকড়ে ধরেছে। ওদের প্রেমটা প্রয়োজনভিত্তিক। পলার একজন শক্তসমর্থ অবলম্বন দরকার ছিল এ সময়ে। আর দুলালের ছন্নছাড়া জীবনেরও একটা নোঙরে বাঁধা পড়বার সময় হয়েছে।
আপনি এই দেওর—বউদির সম্পর্ককে পছন্দ করছেন?
করেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে গেনু সেটা হতে দেবে না। তাই দুলালকে সাবধান করা দরকার।
ওরা আমার সঙ্গে এরকম করল কেন বলুন তো!
মানসিক চাপ থাকলে মানুষ অদ্ভুত আচরণ করে।
মানসিক চাপ কেন?
বাঃ, এই তোর বুদ্ধি! বাড়িতে সাড়ে তিনজন মানুষ। বাচ্চা ছেলেটাকে বাদ দিলে তিনজন অ্যাডাল্টই তো মানসিক চাপে ভুগছে।
কীরকম?

পলার কথাই ধর। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তার হাতে, সেই পাপবোধ, তার ওপর দেওরকে ভালোবেসে ফেলার অপরাধবোধ ছিঁড়ে খাচ্ছে ওকে। গেনু চোখের সামনে রামলালকে পলার হাতে খুন হতে দেখে অস্থিরতায় ভুগছে, তার ওপর পলা ঢলাচ্ছে দুলালের সঙ্গে— সেই রাগ। দুয়ে মিলে মাথার ঠিক নেই। দুলালের অবস্থাও ভালো নয়। মুক্ত জীবন ছেড়ে বদ্ধ জীবনের দিকে এগোচ্ছে, বউদির সঙ্গে প্রেম— সেও স্বাভাবিক নেই। ওদের সকলেরই আচরণে তাই ওই অস্বাভাবিকতা। সবাইকে সন্দেহ করে। অচেনা লোক এলেই ভয় পায়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব দাদা?

বল।

হাতুড়িটা আপনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন কেন?

এমনিই। কোনো কারণ নেই।

একেবারেই নেই?

না।

আপনি একজন মস্ত ক্রিমিন্যাল উকিল। অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কেও কম জানেন না। আপনি অযৌক্তিক কোনো কাজ করবেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

হাসছেন যে!

তোকেও যে সন্দেহবাতিকে পেল।

আর একটা কথা। পলাকে আপনি কতদিন চেনেন?

রামলালের বিয়ের পর থেকে।

রামলালের বিয়ে কবে হয়েছিল মনে আছে?

বছর দশেক। ন—বছর কয়েক মাস।

বিয়েতে খুব ঘটা হয়েছিল বোধহয়?

তা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রামলালের বিয়ে নিয়ে পড়লি কেন?

রামলালের বিয়ে নিয়ে নয়, আমি আপনাকে অ্যাসেস করার চেষ্টা করছি।

আমাকে! আমাকে অ্যাসেস করার কী আছে?

আপনি বিয়ে করেননি কেন দাদা?

ওরে বাবা! এ উলটোপালটা জেরা করে সাক্ষীর মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছে।

ধরুন তাই। জবাবটা দিন।

এমনি করিনি। ইচ্ছে হয়নি।

হাতুড়িটা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন কেন?

এমনি।

পলাকে আপনি কতদিন চেনেন?

বছর দশেক।

দুলালকে পলার কাছে থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন কেন?

দুলালকে গেনু খুনও করতে পারে।

আর কোনো কারণ নেই?

আর কী কারণ থাকবে?

বলব?

কী বলবি?

আপনি পাকে—প্রকারে আমাকে সবই বলে দিয়েছেন। অন্তত হিন্ট করেছেন।

আমি তা থেকে থিয়োরিটা দাঁড় করাতে পারব।
সত্যি?
হ্যাঁ। বলব?
গো অ্যাহেড।
কিছু মনে করবেন না তো!
ঠিক বলতে পারলে মনে করব কেন?
তাহলে বলি! পলাকে আপনি বিয়ের অনেক আগে থেকেই চিনতেন। খুব সম্ভব, আপনাদের গভীর প্রেম ছিল। কোনো কারণে পলার সঙ্গে রামলালের বিয়ে হয়। আমার অনুমান, পলাকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই কারণে বেচারা রামলালের সঙ্গে তার নিত্য খিটিমিটি। খুনটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সেই রাগেরই পরিণতি। ঠিক আছে দাদা?
বলে যা।
কিন্তু পলার ওপর আপনার পরোক্ষ প্রভুত্ব বরাবরই ছিল।
তার মানে কি ব্যাভিচার?
না। আমি যতদূর জানি আপনার ইগো ভীষণ প্রবল। আপনি অপরের এঁটো জিনিস ভোগ করার মানুষ নন। সেইজন্য পরকীয়া আপনার কাপ অফ টি নয়।
কিন্তু প্রভুত্ব অন্য ব্যাপার।
প্রভুত্ব করেছি কী করে বুঝলি?
আপনি প্রভুত্ব ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক মানেন না। ঠিক বলেছি?
বলে যা।
কাজেই পলার লাগাম বরাবরই আপনার হাতে ছিল। তার বিবাহিত জীবনেও পরোক্ষে আপনার হুকুমেই পলা চলত। তাই ওদের সংসারে শান্তি ছিল না। শান্তি থাক তা আপনিও চাননি। পলাকে বিয়ে করতে না পারলেও বরাবর সে আপনরাই সম্পত্তি হয়ে থেকেছে। শারীরিকভাবে ভোগ করার চেয়ে এইটেই অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল আপনার। ঠিক আছে?
চালিয়ে যা।
খুনের দায় থেকে পলাকে বাঁচিয়েছেন আপনিই। কিন্তু পুরোপুরি বাঁচাননি।
মারাত্মক প্রমাণাদি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। পলার ওপর আপনার আয়রন হ্যান্ড।
মুশকিল হল, দুলাল এসে পড়ায়। দুলাল রামলালের মতো ভেড়ুয়া নয়। সে ঝকঝকে পুরুষ। সে এবং পলা প্রেমে পড়ায় আপনার বিপদ দেখা দিয়েছে।
দুলাল পলাকে বিয়ে করলে তাকে পুরোপুরি দখল করবে। আপনার জারিজুরি খাটবে না। ঠিক আছে?
বলে যা না?
আর সেইজন্যই আপনি গেনুকে খাড়া করেছেন। বলাই বাহুল্য গেনুও আপনার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। দুলালকে সরিয়ে না দিলে পলা নামক আপনার প্রিয় ক্রীতদাসীটিকে আপনি চিরকালের জন্য হারাবেন। তাই না?
আর কিছু?
হাতুড়িটা দিন দাদা।
কী করবি?
প্রমাণ নষ্ট করে দেব। কারণ পলা যদি একান্তই দুলালকে বিয়ে করে, তা হলেও তাকে আপনি শান্তিতে থাকতে দেবেন না। হাতুড়িটা তাকে ব্ল্যাকমেল করার কাজে লাগাবেন।
পাগল নাকি?

হাতুড়িটা দিন দাদা।
দিচ্ছি। তোকে একটা কথা বলব?
বলুন।
ওকালতিতে মন দে। খুব ভালো ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার হতে পারবি। আমার চেয়ে অনেক বড়ো।

সংলাপ

পেটে গ্যাস হয়, বুঝলেন! খুব গ্যাস হয়।

সেটা খুব টের পাচ্ছি। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ দেড়েক ঢেকুর তুললেন।

দেড়শো! না মশাই দুশোর বেশি। কী থেকে যে গ্যাস শালা জন্মায় সেটাই ধরতে পারছি না। সেই দুপুরে পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েছি সেটাও গিয়ে পেটের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার হয়ে পড়ে বসে আছে।

আজ পাবদা কিনেছিলেন বুঝি? ভালো পাবদার কাছে কিছু লাগে না।

যা বলেছেন। আমাদের বাজারে সুকুমার বলে যে মাছওয়ালাটি আছে সেই একটু ভালো জিনিস রাখে। আর সবাই তো কাটা পোনা চিতিয়ে বসে আছে। নয়তো আড়—বোয়াল—তেলাপিয়া।

কত করে নিল?

সেটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। দামের কথা মুখে আনাই পাপ। অবিশ্বাস্য মশাই,অবিশ্বাস্য। তবে বাবার বয়সে হয়েছে, ক—দিন ধরেই জিজ্ঞেস করছিলেন, হ্যাঁ, রে, বাজারে পাবদা ওঠে না? তাই আনা।

আপনার বাবা তো পুলিশে ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, অ্যাডিশ্যনাল ডিএসপি।

বড়ো পোস্ট।

হ্যাঁ, তা বড়োই।

বাড়িটা তো আপনার বাবারই করা, তাই না? দিব্যি বাড়ি।

হ্যাঁ, তা মন্দ নয়।

এ বাজারে কলকাতায় ও বাড়ি হেসেখেলে বিশ—পঁচিশ লাখ দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, পঁচিশ লাখ অফার পেয়েছি।

অফার মানে? বাড়িটা বেচবেন নাকি?

আরে না মশাই, বাড়ি বেচে যাব কোথায়? তবে অনেকে আছে না, ভালো বাড়ি দেখলেই একটা দর হেঁকে বসে, সেরকমই ব্যাপার।

তবু ভালো। আমি ভাবলাম বেচার তোড়জোর চলছে বুঝি। আজকাল প্রোমোটারদের যা দৌরাত্ম্য!

সে তো বটেই। তবে ভাবছি বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তো আর বাড়ি প্রোমোটারদের দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু বাবা মারা গেলেই সেই সাবেক সমস্যা। তিন ভাইয়ের ভাগাভাগি। আর বাড়িটাও এমন প্ল্যানে তৈরি যে ঠিক ভাগজোখ হয় না। তখন প্রোমোটারকে না দিয়ে বোধহয় উপায় থাকবে না।

সে তখন ভাবলেন। আপনার এক ভাই পলিটিক্স করত না?

আমার বড়দা। ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছিল।

আর মেজো জন?

ছোড়দা তো? তিনি ইনকাম ট্যাক্সের উকিল।

মেলা পয়সা, না?

দেদার পয়সা। সব মাড়োয়ারি ক্লায়েন্ট।

সব একসঙ্গেই আছেন তো!

পাগল নাকি? বড়দা গড়িয়ায় বাড়ি হাঁকিয়েছে সেই কবে। ছোড়দা ফ্ল্যাট কিনেছে ভবানীপুরে। আমিই পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছি।

আপনি তো ব্যাচেলার, আলাদা বাড়িতে থাকার দরকারটাই বা কী?

দরকার নেই ঠিকই। কিন্তু দায়দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে কিনা। এই ধরুন, দাদারা সটকে পড়ল, কেউ বাবা—মায়ের দায়িত্ব নিল না। কিন্তু আমি ব্যাচেলার বলেই সটকাতে পারলুম না।

বয়স কত হল?

প্রায় চল্লিশ।

এমন কিছু বয়স নয় কিন্তু।

বলেন কী? আমার তো সবসময়ে মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি।

বিয়েটা হল না কেন?

কপালে নেই বলে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি অগামার্কা। ছাত্র ভালো ছিলুম না।

চাকরিও ভালো জোটেনি।

এক সিদ্ধি কোম্পানিতে আছেন না আপনি?

আছি বটে, তবে না থাকার মতোই। অপমানজনক বেতন, হাড়ভাঙা খাটনি। কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায় আর কী!

তাহলে সংসারটা কী বাবার টাকায় চলে?

চললে তো হতোই। কিন্তু ওটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি। বেতনের টাকা সবটাই খরচ হয়ে যায়। তা যাক। আমার আগেই বা কে, খাবেই বা কে।

দাদারা কিছু দেয় না?

নাঃ। আমিও চাই না, তারাও দেয় না।

আপনি তো তাহলে স্কেপগোট, বলির পাঁঠা।

তা বলতে পারেন। তবে অত হিসেব—টিসেব করে কীইবা হবে? চলে তো যাচ্ছে। অসুখ—বিসুখ বা মোটা খরচের পাল্লায় পড়লে অবশ্য বিপদ ঘটবে।

বাবা কিছু দিতে পারেন তো। আফটার অল পুলিশের চাকরি করেছেন, হাতে ভালো থাকার কথা।

আছেও কিন্তু দেন না। তাঁর সাফ কথা, এতদিন তোমাদের প্রতিপালন করেছি, এখন তোমাদের কর্তব্য মা—বাবার প্রতিপালন করা। এই নিয়েই দাদাদের সঙ্গে খিটিমিটি।

তারা পালিয়ে বাঁচলেন তো!

পালানোরই কথা। আজকাল তো পালানোই রেওয়াজ।

আপনিই পারলেন না তাহলে!

পালানোর কী আছে? ওরা বউ—বচ্চার ভবিষ্যৎ ভেবে পালিয়েছে, আমার তো সেই বালাই নেই।

বিয়েটা করলেন না কেন মশাই? লাভ অ্যাফেয়ার—ট্যাফেয়ার ছিল নাকি?

সত্যি কথা শুনতে চান?

আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

লাভ অ্যাফেয়ার বললে বাড়াবাড়ি হবে।

একটা মেয়ের প্রতি একটু সফটনেস ছিল। কিন্তু কথাটা তাকে মুখ ফুটে জানাতে পারিনি।

ওঃ, তাহলে আর লাভ অ্যাফেয়ার কী হল?

দুঃখের কথা হল, পরে আমার এক খুড়তুতো বোনের কাছে জানতে পারি যে, সেই মেয়েটারও নকি আমার প্রতি সফটনেস ছিল। সেও কখনো বলতে পারেনি।

এঃ হেঃ, এ যে খুবই দুঃখের ব্যাপার। মেয়েটার কি বিয়ে হয়ে গেছে?

তা হবে না? সে এখন ছেলেপুলের মা, ঘোর সংসারী।
তার তো হিল্লে হয়ে গেল, আপনার তো হল না।
হিল্লে আর কী? জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার তো? সে কেটে যাবে।
মা বিয়ে দিতে চান না?
আগে চাইতেন। তবে দুই বউমরা কাছ থেকে যা ব্যবহার পেয়েছেন তাতে বোধহয় আগ্রহ কমে গেছে। আর আমারও তো বয়স হল।
বয়সের চেয়েও বড়ো কথা হল, আপনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা ভালো কথা নয়। ঠিক কত বয়স হল বলুন তো!
আটত্রিশ পূর্ণ হয়ে উনচল্লিশ চলছে।
সাহেবরা তো এই বয়সেই বিয়ে করে।
চল্লিশে তাদের জীবন শুরু।
সাহেবরা সব ব্যাপারেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে, তাদের সঙ্গে কী আমাদের তুলনা হয়।
আহা, তারাও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাদেরও জরা—ব্যাধি আছে।
তা আছে। তবু তুলনা হয় না। জীবনকে ওরা ভোগ করতে জানে। আর আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিই মাত্র।
বেড়াতে—টেড়াতে যান না?
না, বেড়ানোর যা খরচ। শখ—আহ্লাদ বলতে কিছুই নেই। আগে ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে যেতুম। এখন আর ইচ্ছে হয় না। সময় পেলে একটু—আধটু টিভি দেখি। ব্যাস। পাড়ার একটা ক্লাবে একটু যাতায়াত আছে। সামান্য সোশ্যাল ওয়ার্ক করি।
সোশ্যাল ওয়ার্ক করা তো খুব ভালো।
মন দিয়ে করলে তো ভালোই। আমি করি সময় কাটানোর জন্য।
কীরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক? বন্যাত্রাণ, খরাত্রাণ এসব নাকি?
সেসবও আছে। তা ছাড়া সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, অ্যান্টিসোশ্যালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা—এসব আর কী।
ভালো ভালো। তবে অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগাটা আবার বিপজ্জনক। এটা তো ওদেরই যুগ কিনা। পুলিশ—প্রশাসন সবই ওদের হাতে।
যা বলেছেন। ভালো করে না বুঝেসুঝে আমিও বড্ড বিপদে পড়ে গেছি।
তাই নাকি? কী ব্যাপার?
টাপু বলে একটা ছেলে আছে আমাদের পাড়ায়। ভালো ছেলে। সে একজন অ্যান্টিসোশ্যালের পাল্লায় পড়ে বখে যাচ্ছিল। তার বাবা এসে ক্লাবে কেঁদে পড়ে। আমরাও ভালো করে না ভেবেচিন্তে অ্যাকশনে নেমে পড়ি। কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় মারাত্মক। সেই অ্যান্টিসোশ্যালটা— তার নাম টিপু— দলবল নিয়ে এসে ক্লাবে বোমাবাজি করে গেল এই তো মাত্র দিন পনেরো আগে এক সন্ধে বেলা।
সর্বনাশ! কেউ মার্ডার হয়নি তো!
না। তবে দুজনের সপ্লিন্টার ইনজুরি হয়েছে।
বেঁচে গেছেন তাহলে।
না মশাই, বাঁচা অত সোজা নয়। শাসিয়ে গেছে সবাইকে দেখে নেবে।
ও বাবা, তাহলে তো আপনি বিপদের মধ্যেই আছেন।
তা আছি।
পুলিশ অ্যাকশন নেয়নি?

রুটিন মাফিক নিয়েছে। ওদের কেউ ভয় পায় না আজকাল।
সেই টাপু ছেলেটার কী অবস্থা?
পালিয়েছে।
তাকে ফেরাতে পারবেন মনে হয়?
বলতে পারি না। সবাইকে তো ফেরানো যায় না। সৎপথে থাকার আকর্ষণ আজকাল কমে যাচ্ছে। ইয়ং জেনারেশন আজকাল একটু গা—গরম করতে চায় বোধহয়।
এ ব্যাপারে আপনাদের নেক্সট লাইন অফ অ্যাকশন কী?
সবাই ভয় পেয়ে গেছে। অ্যাকশনে কেউ যেতে চাইছে না।
তাহলে আপনারা রণে ভঙ্গ দিলেন বলুন।
একরকম তাই। বোমা—পিস্তলের সঙ্গে লড়াই করব কী করে?
তাই তো বলছিলুম মশাই, অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগা বিপজ্জনক।
খুবই বিপজ্জনক। সেই ঘটনার পর থেকে টেনশনে আমার গ্যাস আর অম্বল বেড়ে গেছে।
শুনেছি টেনশনে গ্যাস—অম্বল বাড়ে।
আমারও বেড়েছে। রাতে শুয়ে দুশো—আড়াইশো ঢেকুর ওঠে।
আর ওসবের মধ্যে যাবেন না।
ইচ্ছে করে কী যাই? একটা ঘটনা থেকে নানা ঘটনার ফ্যাঁকড়া বেরোয় যে!
কীরকম?
টাপুর মা এসে আমাকে ধরে পড়েছিল সেদিন। বলল, দ্যাখ বাবা, ওই টিপু আর ওর দলবল আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে। তুই একটা কিছু কর। মহিলাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, আমার মতো ভিতুকে দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। অগত্যা বললাম, আচ্ছা চেষ্টা করব।
চেষ্টা করেননি তো?
ঠিক চেষ্টা করেছি বলা যায় না। তবে টিপুর হদিশ করতে শুরু করি।
ও বাবা! আপনি তো সাংঘাতিক লোক!
কী করব বলুন! ভদ্রমহিলা এমন কান্নাকাটি করলেন যে, কিছু না করেও থাকা যায় না।
হদিশ পেলেন নাকি?
পেলুম। পাশেই পালপাড়ার একটা ছেলে খবর দিল, ওদের বাড়ির কাছে একটা রং ঝালাইয়ের দোকানের পিছনে থাকে। হাইড আউট।
মশাই, শুনে যে আমারই বুক ধড়ফড় করছে।
আমারও করছিল।
যাননি তো?
না যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘাড়ে ভূত চাপলে যা হয়।
গেলেন?
একটু রাতের দিকে গেলুম।
বলেন কী?
সেই তো বলছি। গ্রহের ফের। তবে কপাল ভালো যে টিপুকে বেশি খুঁজতে হয়নি। রাত এগারোটা হবে তখন, টিপু মাল খেয়ে ফেরায় পথে পান—সিগারেটের দোকানে সিগারেট ধরাচ্ছিল।
কী করলেন?
গিয়ে বললুম, কাজটা ঠিক করছ না হে টিপু। এসব করা ভালো নয়।
এভাবে বললে কি কাজ হয়?

হল না তো! টিপু একটা খিস্তি করে কোমর থেকে একটা ছোরা বের করল।
দোধার ছোরা। প্রকাণ্ড ফলাটা একেবারে ঝকঝক করছিল।
সর্বনাশ! পালালেন তো?
না। পালিয়ে যাব কোথায়? যাওয়ার কী জায়গা আছে?
তাহলে কী করলেন?
সে আর বলবেন না। আপনি কি দৈব মানেন?
খুব মানি মশাই, খুব মানি। এই যুগে বেঁচে থাকারই যা সমস্যা, দৈব না মেনে উপায় আছে?
ঠিক তাই, দৈব ছাড়া আর কী বলি বলুন। নিতান্তই টিপুর মায়ের চোখের জল সইতে না পেরে আহাম্মকের মতো টিপুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৎপথে ফেরাতে গিয়েছিলুম। কাজটা যে কত বড়ো ভুল হয়েছিল তা আগে বুঝতে পারিনি।
অতি খাঁটি কথা মশাই। কাজটা করা আপনার মোটেই ঠিক হয়নি। তারপর হলটা কী সেইটে বলুন।
আজ্ঞে কী হল তা কি আমিই জানি। ছোরা দেখে আর টিপুর রক্ত—জলকরা চাউনিতে আমার তখন শরীরে স্তম্ভন। এত ভয় খেয়ে গেছি যে হাত—পা যেন কাঠ। ভগবানকে জীবনে ডাকিনি কখনো। আসলে ডাকার কথা মনেই থাকে না। সেই অবস্থাতেও মনে পড়ল না। টিপু ব্যাধের মতোই এগিয়ে এল। কিন্তু তারপর কী যে হয়ে গেল, কিছু মাথায় ঢুকল না।
কী হল?
সেইটেই তো বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্ণনা দেওয়ার ভাষাটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। টিপু এগিয়ে এসে ছোরাটা বাগিয়ে ধরে পেটে বা বুকে ঢুকিয়ে দেয় আর কী। ওদের তো মায়া—দয়া নেই। কিন্তু কী যে হল, হঠাৎ টিপু যেন পায়ে পা জড়িয়ে, যেন নিজেকেই নিজে ল্যাং মেরে একটা পুঁটুলির মতো দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। একেবারে আমার পায়ের গোড়ায়।
বলেন কী?
দৈব ছাড়া আর কী বলি বলুন।
অবিশ্বাস্যেরও কিছু নেই। নিজের চোখে দেখা।
তারপর?
পড়ে গিয়ে টিপু কেমন যেন ছটফট করতে লাগল, গলায় গোঙানির আওয়াজ।
মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে আমি যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। নড়তেও পারছি না। পানের দোকানিটা নেমে এসে টিপুর মুখে—চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলছিল, এর শরীরে কী কিছু আছে? দিনরাত চুল্লু টানছে, পাতা খাচ্ছে। শালা এবার মরবে।
জোর বেঁচে গেছেন তাহলে! দৈব ছাড়া এ আর কিছু নয়।
ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা ব্যাপারটা চাউর হল অন্যরকম।
সেটা আবার কী?
আর বলবেন না মশাই। লোকের মুখে মুখে রটে গেল আমিই নাকি টিপুকে মেরে পাট করে দিয়েছি। বুঝুন কাণ্ড। আমরা গায়ে না আছে জোর, না আছে মনে সেই সাহস। কিন্তু লোকে তা বুঝলে তো! সে এমন কাণ্ড যে, টিপুর দলের একটা ছেলেও সাহস করে আমার কাছে এগিয়ে এল না। আমিও আর দাঁড়াইনি। তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আমাকে নিয়ে পাড়ায় হইচই। এমনকী থানার দারোগা পর্যন্ত এসে আমাকে হিরো বানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার জন্যই টিপুকে ধরা গেল।
তারপর কী হল মশাই?
টাপু বাড়ি ফিরে এল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, আপনার জন্যই টিপুর খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়েছি, নইলে ওরা আমাকে শেষ করে দিত।

তাহলে আপনি এখন হিরো?

কাকতালীয় ঘটনা আর কাকে বলে!

যেভাবে আমাকে হিরো বানানো শুরু হয়েছিল তাকে আমার ভয় হল, এবার টিপুর দলের ছেলেরা না আমার ওপর চড়াও হয়। মানুষের প্রাণের স্থায়িত্ব কী বলুন। একটা গুলি বা ছুরি ছোরা, নিদেন একটা আধলা ইটেও কাজ হয়ে যায়।

তা তো ঠিকই। তা সেরকম কিছু হয়েছিল নাকি?

না মশাই। বরং টিপুর এক সাকরেদ এসে দেখা করে মাপটাপ চেয়ে গেলে।

বলল, টিপুটা ইদানীং বড়ো বাড়াবাড়ি করছিল। আমরা তো তাকত দেখাতে লাইনে নামিনি দাদা, এসেছি রুজি—রোজগার করতে। আর টিপু হতে চায় রবিন হুড।

বাঃ, তাহলে তো আপনার আর কোনো সমস্যাই রইল না।

সমস্যা! সমস্যার কী শেষ আছে?

একটা যায় তো আর একটা আসে।

সেটা আবার কীরকম?

আছে মশাই, আছে। হিরো হওয়ার হ্যাপাও বড়ো কম নয়। মিনি মাগনা হিরো বনে গেছি বটে, কিন্তু ফ্যাঁকড়াও আছে।

ঝেড়ে কাশুন না মশাই।

এই ধরুন, আগে কেউ পাড়ায় আমার দিকে ফিরেও চাইত না, আজকাল সবাই তাকায়, পথে বেরোলে জানালায়, বারান্দায় উঁকিঝুকি শুরু হয়, নাগরিক কমিটি থেকে আমাকে চেয়ারম্যান করার কথা উঠেছে। এই সব নানা উদ্ভট কাণ্ড। তারপরও গোদের উপর বিষফোঁড়া আছে।

সেটা কী?

টাপুর মা এসে আমার মাকে ধরেছে, টাপুর দিদি— এই ধরুন বাইশ—তেইশ বছর বয়স হবে— তাকে ছোটো বউমা করে নিতে। বর্ণ—গোত্র সব নাকি ঠিকঠাক আছে।

বলেন কী মশাই। একথা বলতে হয়। এ তো দারুণ খবর!

না মশাই, না। মোটেই ভালো খবর নয়। বয়সের তফাতটা লক্ষ করেছেন? তার ওপর আমি তো একরকম বুড়োই। একাবোকা থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কী আর ঝুটঝামেলা ভালো লাগে?

রিফিউজ করলেন নাকি?

হ্যাঁ, খুব কঠোরভাবেই রিফিউজ করলাম। টাপুর মাকে বললাম, আপনারা মোহের বশে এক প্রস্তাব করেছেন। ভালো করে ভেবে দেখবেন কাজটা ঠিক হবে না।

আপনার চরিত্রটি বেশ দৃঢ়।

না মশাই, একেবারেই না। বরং আমি অতিশয় দুর্বলচিত্ত। ভেবে দেখলাম দুর্বলচিত্ত লোকদের দাম্পত্য জীবনে না যাওয়াই ভালো। তা ছাড়া ওরা আমড়াকে আম ভেবে বসে আছে কি না। আমি তো আসলে হিরো নই, জিরো।

তাহলে ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল নাকি?

মিটলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত।

মেটেনি তাহলে?

না, বললাম না সব ঘটনা থেকেই ফ্যাঁকড়াটা বেরোয়।

তা এখানে আবার ফ্যাঁকড়া কী বেরোল?

টাপুর দিদি নন্দনাই হল ফ্যাঁকড়া। একদিন সে সোজা আমার ঘরে এসে হাজির। দুই চোখ জলে ভরা, ঠোঁট কাঁপছে।

বাস রে! এ যে উত্তম—সুচিত্রা।

বাইরে থেকে এরকম মনে হয়। আমার যে তখন কী অবস্থা তা বোঝাতে পারব না।

মেয়েটা দেখতে কেমন মশাই?

ভালোই। রং তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু মুখে—চোখে শ্রী আছে। পাড়ায় ভালো মেয়ে বলে নামও আছে।

তাহলে পিছোচ্ছেন কেন?

ওই যে বললাম, বুড়ো হয়ে গেছি। এখন কি আর কেঁচে গণ্ডূষ করা যায়?

তা মেয়েটা বলল কী?

তেমন যে কিছু বলল তা নয়। গলা কাঁপছিল। শুধু বলল, আমি কি খারাপ?

তবে কেন আপনি— ব্যাস ওই পর্যন্তই। বাক্যটা শেষ অবধি করতে পারেনি।

তা আপনি কী করলেন?

মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বিশেষ বলিনি কখনো। ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

কিছুই বললেন না?

তেমন কিছু বলতে পেরেছি বলে মনে হয় না। একটু আমতা করে বললুম, তুমি তো ভালো মেয়ে। তবে কেন আমাকে— ব্যাস, বাক্যটা আমিও শেষ করতে পারিনি।

ওঃ, আপনার পেটে পেটে এত? এরকম মাখো—মাখো ব্যাপারখানা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন? আপনি তো খুনি লোক মশাই।

কী যে বলেন। মাখো—মাখো ব্যাপার মোটেই নয়। নন্দনা এসে ও কথা বলে যাওয়ার পর থেকে আমার ঘুম গেছে, খাওয়া গেছে, দুশ্চিন্তায় আধমরা অবস্থা। আর পেটে যে কী গ্যাস হচ্ছে মশাই,আর বলবেন না। ঢেকুরের পর ঢেকুর, পেটে সবসময়ে যেন ফাঁপা ভাব। কী যে অসোয়াস্তি।

গ্যাসের মেলা ওষুধ আছে মশাই। ওর জন্য চিন্তা নেই। আগে বলুন, সিদ্ধান্তটা কী নিলেন?

ওই যে বললুম, গ্যাসে এমন কাহিল হয়ে পড়েছি যে আর ওসব নিয়ে এগোতে ভরসা হচ্ছে না। তবে মা ইদানীং দেখছি আদাজল খেয়ে লেগেছে। বড্ড বিপদ যাচ্ছে মশাই।

কীসের বিপদ?

একটা মিথ্যে জিনিসকে সবাই মিলে সত্যি করে তুলছে, এটা ভালো হচ্ছে না।

মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে কেন?

মিথ্যে নয়? গুন্ডাটা নিজেই কেতরে পড়ল আর হিরো বনলাম আমি!

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনাটা তত মিথ্যে নয়। আপনি চেপে যাচ্ছেন।

বলেন কী। আমার কী গুন্ডার সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা আছে?

কিছু বলা যায় না। কখনো কখনো কাপুরুষও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আর আপনি সত্যিকারের কাপুরুষ হলে মাঝরাত্তিরে গিয়ে টিপুর ডেরায় হানা দিতেন না।

ওই যে বললুম কাজটা আহাম্মকি হয়েছিল।

আপনাকে তত আহাম্মক বলে মনে হচ্ছে না। ঘটনাটা বলেই ফেলুন না। আমি তো আর পুলিশের লোক নই।

কী যে বলেন!

বলুন না মশাই, লজ্জা পাচ্ছেন কেন?

আসলে কী জানেন ঘটনাটার সময়ে আমি এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলাম যে সত্যিকারের কী ঘটেছিল তা আমি নিজেও জানি না।

এই তো এবার মাল বেরোচ্ছে। টিপুর মতো গুন্ডা আপনাকে ছোরা মারতে এসে হঠাৎ কনভালশন হয়ে ঢলে পড়বে এমন ঘটনা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ওইটেই মুশকিল। আমার যেটুকু মনে পড়ছে তাই বলেছি। বাকিটা আমার স্মৃতিতে নেই।
তাহলে মশাই, বলতেই হবে, আপনি টিপুর চেয়েও অনেক বেশি ডেনজারাস লোক।
ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন। জীবনে আমি মারপিট করিনি।
প্রয়োজন পড়েনি বলে করেননি। কিন্তু এলিমেন্টটা আপনার ভেতরে ছিলই।
আপনি কী বলতে চান আমার ভিতরে একজন অচেনা আমি আছে?
সকলের ভিতরেই থাকে।
কী জানি মশাই। লোকে বলছেও বটে যে, আমার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকেই নাকি দেখেছে আমি টিপুকে পেটাচ্ছি। আর হাসপাতালের ডাক্তাররাও টিপুর ইনজুরির রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো চিন্তার কথা।
কীসের চিন্তা?
এই যে আমার ভেতরে একজন হিংস্র, নিষ্ঠুর, অ্যাগ্রেসিভ লোক লুকিয়ে রয়েছে এ কী চিন্তার কথা নয়। বেশ ভয়েরই ব্যাপার।
তা ভয় পেলে একজন পাহারাদার বসালেই তো হয়।
পাহারাদার? সে আবার কী?
সবচেয়ে ভালো পাহারাদার তো নন্দনাই হতে পারে।
যাঃ, কী যে বলেন। আপনি কী মনে করেন বিয়ে মানুষের কোনো উপকার করে? আমার তো ও কথা ভাবলে পেটে গ্যাস বেড়ে যায়। দেখলেন না কতকগুলি ঢেকুর তুললাম! আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে।
আচ্ছা, টিপুর অবস্থা এখন কীরকম?
যতদূর জানি, পুলিশ—পাহারায় হাসপাতালে রাখা হয়েছে তাকে। খুব সিরিয়াস কিছু নয়।
আচ্ছা মশাই টিপুর কি নন্দনার ওপরেও একটা নজর ছিল?
কী করে বুঝলেন মশাই, জানি না। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। ছিল।
বুঝতে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি। টিপুকে হাত করার পিছনে হয়তো ওটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।
তাই হবে। নন্দনার মা—ও ঠারেঠোরে কথাটা আমাকে জানিয়েছেন। নন্দনা নাকি টিপুর ভয়ে কিছুদিন মামার বাড়িতে গিয়ে পালিয়েছিল।
তাহলে আপনার কি এখন উচিত নয়, নন্দনাকে এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া?
আমার কী গরজ?
গরজ আছে বইকী। অসহায় অবলা নারীকে রক্ষা করাই তো পুরুষের ধর্ম, টিপু সেরে উঠলে যে নন্দনার আবার বিপদ!
তা নন্দনা আর কাউকে বিয়ে করলেই তো পারে।
সেটা দ্বিচারণা হবে না। তার যে আপনাকে পছন্দ।
দূর! আমি বুড়ো গ্যাসের রুগি, কম বেতনের অপদার্থ একটা লোক। আমার মধ্যে কী দেখল বলুন তো?
সেটা নন্দনাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?
করে কী লাভ? যা বলবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রেম তো একটা ইমোশনাল একসেস। ওর কোনো জোরালো ভিত নেই।
আপনার কপালে কী আছে জানেন?
কী?
বয়স হলে বিড়বিড় করে কথাকওয়া, উদ্ভট উদ্ভট সব কাণ্ড করা, বাতিক আর বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়া— যা ব্যাচেলারদের হয় আর কি। তা ছাড়া দাদারা ভুজুংভাজুং দিয়ে বাড়ি দখল করবে, হাতের—পাতের যা কিছু

হাতিয়ে নেবে। আরও বুড়ো হলে আপনাকে গিয়ে উঠতে হবে বৃদ্ধাশ্রমে। বউ যেমন হোক, ঝগড়াঝাঁটি করুক, মুখনাড়া দিক, কিন্তু তবু সে পুরুষকে ঠিক সামলে রাখে।

হুম।

কথাটা ঠিক বলেছি?

খুব বেঠিকও বলেননি। ব্যাচেলারদের ওরকমই হয়ে থাকে।

তাহলে?

একটু ভাবি।

ভাবুন কিন্তু বেশি নয়। ভাবতে সময় নিলে হাউসফুল হয়ে যাবে। নন্দনাই কি পড়ে থাকবে ভেবেছেন। আগেরটির বেলায় যা হয়েছিল এর বেলায়ও তাই হবে।

আপনি বড্ড ভয় দেখান তো!

ভয় দেখাচ্ছি না, সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। আজকের দিনটা ভাবুন। ভেবে কাল সকালেই নন্দনাকে জানিয়ে দিন যে আপনি তাকেই বিয়ে করবেন।

কাল সকালেই?

কাল সকালেই। কিংবা আজ রাতেই। কিংবা এক্ষুনি গিয়ে চোখ বুজে বলে ফেলুন গে। যান।

আচ্ছা, তাহলে চলি মশাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু পা চালিয়েই যান।

কৈখালির হাটে

নামখানা জম্পেশ। বজ্রবাহু মণ্ডল। এই নাম শুনে প্রাইমারির মাস্টারমশাই হরিপদ গড়াই বলেছিল, তোর নামখানাই তো ভূমিকম্প রে! কিন্তু নাম ধুয়ে তো জল খাবি না বাবা, একটু লেখাপড়ায় মন দে।

তা দিয়েছিল বেজা। বজ্রবাহু বলে আর কে ডাকছে তাকে। বেজা নামই সকলের মুখে। তা বেজা লেখাপড়ায় তেমন বোবাকালাও ছিল না। প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাই, তারপর হাইও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। সেকেন্ড ডিভিশন। তা তা—ই বা কম কী? কিন্তু এইখানে তার লেখাপড়ার গাড়ি সেই যে থেমে গেল, আর নড়ল না। বাপ অজাগর মণ্ডল সাপকাটিতে মারা যাওয়ার পর বজ্রবাহুর মাথায় বজ্রাঘাত। সংসারের হাল না ধরলে শুকিয়ে মরতে হবে। বিধবা মা, আরও তিনটে ভাইবোন, বাপের ধারদেনা— সব মিলিয়ে বিশ বছরের বেজা হিমসিম। অজা মণ্ডলের তিন বিঘে জমি ছিল পার্টির দয়ায়। তার পাট্টা ছিল না বটে। অজা মণ্ডল মরার পর জমি নিয়ে বখেরা লেগে গেল। জয়েশ পুততুণ্ড লিডার মানুষ। সে বলল, ও জমি তো আমার, অজা ভাগে চাষ করত। জয়েশের ওপর কথা কইবে কে? সুতরাং জমি একরকম ভোগে চলে গেল।

বেজার যখন পাগল হওয়ার জোগাড় সেই সময়ে স্বর্গ থেকে দেবদূতের মতো নেমে এল নব হালদার। সেও লিডার মানুষ। জমিজমা, গোরুবাছুর, পাকা বাড়ি নিয়ে ফলাও অবস্থা। তাকে ডেকে বলল, শোনো বাপু, তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, বুদ্ধি—বিবেচনাও আছে মনে হয়। যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বেজা তখন সবাইকেই খুশি করতে মুখিয়ে রয়েছে, এতগুলি উপোসি মানুষকে রক্ষা না করলেই নয়। বলল, যে আজ্ঞে?

আমার মেয়ে মালতীকে তো দেখেছ বাপু। তাকে যদি বিয়ে কর তাহলে তোমার পাশে আমি আছি।

বেজা পক করে খানিক হাওয়া গিলে ফেলল। হাওয়ার ডেলাটা পেটে নামল না, গলাতেই বেলুনের মতো আটকে রইল। যাকে ঘাঁটাপড়া মেয়েছেলে বলে, মালতী হল তাই। বয়সে না হোক বেজার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ো। একবার বিয়েও হয়েছিল বিষ্টুপুরের নগেনের সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই ফেরত এসেছে। তারপর থেকে মালতী আর বিয়েতে বসেনি বটে, কিন্তু পুরুষ—সঙ্গে তার খামতি নেই। সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে ঢিঢি। নব হালদার মেয়েকে সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না। মালতী তার বাপকে কুকুর বেড়াল বলে মনে করে।

সেই মালতী হালদারকে বেজা বিয়ে করবে কি? সে গলার বাতাসের বেলুনটা গিলে ফেলার চেষ্টা করল অনেকবার। হল না।

নব হালদার বলল, জমি ফেরত পাবে। তিন বিঘের জায়গায় পাঁচ বিঘে। আর একখানা তিন চাকার ম্যাটাডোরও দেব। ভালো করে ভেবে দেখ।

পেটের দায় বড়ো দায়। তবু রাজি হতে সময় নিচ্ছিল বেজা। কারণ ইদানীং শোনা যাচ্ছে মালতী নরেশ লস্করের সঙ্গে নটখট করে বেড়াচ্ছে। আর নরেশ হল হলদিঘাটের খুনে গুন্ডা। ডাকাতির মামলাতেও তার নাম আছে।

নব হালদারের মুখের দিকে চেয়ে বেজার মনে হল, লোকটা বড়ো নাচার। মালতীকে কারও ঘাড়ে না গছালে তার চলছে না।

বেজা বলল, যে আজ্ঞে।

নব একটু হাসল। বলল, তবে বাপু, বুঝতেই পারছ, মালতী আদরে মানুষ, তোমাদের ওই ভাঙা ঘরে তো আর থাকতে পারবে না। তুমিই দিব্যি এসে থাকবে আমার বাড়িতে। আলাদা ঘরটর আছে। খরচাপাতিও ধর আমারই।

বেজা মাথা নীচু করে রইল। ঘর—জামাই হতে তার আর আপত্তি কীসের?

এই ঘটনার দু—দিন বাদে কৈখালির হাটে যাচ্ছিল বেজা। কুমোরপাড়ার মোড়ে মালতীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

খুব রসের হাসি হেসে মালতী বিষবিছুটি মাখা গলায় বলল, এই যে নাগর, শুনলুম নাকি আমার সঙ্গে মালাবদল করার জন্য হাঁ করে আছ!

বেজা তটস্থ হয়ে বলল, ইয়ে—মানে আপনার আপত্তি থাকলে—

আহা, আমার আবার আপত্তি কী গো! আমি তো বরণডালা সাজিয়ে বসেই আছি। বলি ভালোমানুষের পো, মধু আর হুল দুটোই সইবে তো!

তারপর সে কী গা—জ্বালানো হাসি!

ভাবী বউয়ের রকমসকম দেখে বড্ড দমে গিয়েছিল বজ্রবাহু। তার নামটাই যা শক্তসমর্থ, সে অতি দুর্বল মানুষ।

তা মালতী যে চোখেই দেখুক তাকে, বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল। ঘটাপটা তেমন কিছু নয়, তবে হ্যাজাক জ্বেলে, মন্ত্রপাঠ করে, দু—পাঁচজনকে ভোজ খাইয়ে একরকম হল ব্যাপারটা। কিন্তু যখন একা ঘরে মালতীর মুখোমুখি হতে হল তাকে তখন যে বুকের ধুকপুকুনিটা শুরু হল তার সেটা অদ্যাবধি থামেনি।

বিয়ের রাতে মালাটালা পরে ঘরে ঢুকতেই প্রেতিনীর মতো সে কী খলখল করে হাসি মালতীর! যেন সং দেখছে। বলল, বাঃ, বর তো দিব্যি সেজেছে দেখছি! তা এবার কী হবে গো! রসের খেলা নাকি। এস এস নাগর, দেখি তুমি কেমন পুরুষ!

নিজেকে এমন নপুংসক কখনো মনে হয়নি বেজার। তখন তার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। মালতী সম্বন্ধে শোনা ছিল তার। লোকে তাকে খারাপই বলে। কিন্তু বিয়ের রাতে যে অবস্থা করে তাকে ছাড়ল মালতী তাতে বেজার চোখ ভরে জল এসেছিল। মালতী শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। আর শরীর দিয়ে তাকে খুশি করার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তার সেদিন। অপমানে, লজ্জায়, নিজেকে হীন ভেবে ভেবে ছোটো হয়ে গিয়ে সেদিন সে একটা জরদগব। মালতী শেষমেষ একখানা লাথিও মেরেছিল তাকে। সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল।

সেই রাতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়েছিল তার।

কেন যে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল নব হালদার তা সে খুব ভেবে দেখেছে। বেশি ভাবতে হয়নি অবশ্য। পরদিনই মালতীর বউদি মঙ্গলা তাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মেয়ের বদনাম ঘোচাতে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে আমার শ্বশুর। তুমি হলে শিখণ্ডী। সেইরকমই থাক। নইলে কপালে কষ্ট আছে।

মালতীর সঙ্গে এক ঘরে ওই একটা রাতই কেটেছে বজ্রবাহুর। পরদিন থেকেই সে পাশের খুপরিতে চালান হয়ে গেল।

বিয়ে যা—ই হোক, নব হালদার তাকে কথামতো জমি আর তিন চাকার ম্যাটাডোরখানা দিয়েছিল বটে। সেই ম্যাটাডোরখানা চালিয়েই আজ কৈখালির হাটে এসেছে বেজা। গঙ্গারামের মাল বয়ে এনেছে গঞ্জ থেকে। হাট ভাঙলে ফের ফেরত নিয়ে যাবে। এই করে তার রোজগার কিছু কম হয় না। ছোটো ভাই বিশালবাহু চাষবাষ দেখে। পরিবারটা বেঁচে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় মালতী এখনো তার বউ। ঠিক বটে মালতীর সঙ্গে আজকাল তার একরকম দেখাই হয় না। তবু বিয়েটা টিকে আছে। মালতী বিয়ের দু—বছর বাদে এখন নতুন পুরুষ ধরেছে। খয়রাপোতার

মহাজন বীরেশ মহান্তকে। বীরেশ ফূর্তিবাজ লোক, টাকা ওড়াতে ভালোবাসে। মালতীকে তার পছন্দও খুব। বেজা এসব দেখেও দেখে না। পাশের ঘরে যা হওয়ার হয়। বেজা তার খুপরিতে শুয়ে ঘুমোয়।

বেজা জানে, তাকে আজকাল কেউ মানুষ বলে মনে করে না। পুরুষ হয়েও বউকে সামলাতে পারেনি বলে তার বিস্তর বদনাম। কিন্তু বেজা ভাবে, লোকে যাই বলুক তার কর্তব্য সে করেছে। পরিবারটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কৈখালির হাট মানে এক বিচিত্র জায়গা। দোকান—পসার, বিকিকিনির এমন রমরমা হাট এ তল্লাটে নেই। অনন্ত দশ—বারোখানা গাঁয়ের লোক এসে হাটে ভিড় করে।

বজ্রবাহু ম্যাটাডোর এক চেনা দোকানির হেপাজতে রেখে হাট দেখতে বেরল। কেনাকাটাও কিছু আছে। ছোটো বোন সিতির জন্য একটা হাত—আয়না, মায়ের জন্য মালিশের ওষুধ, একখানা ভালো কাটারি এইসব টুকিটাকি।

দুই

জিপগাড়িটা থামিয়ে পেচ্ছাব করতে নেমেছিল বীরেশ মহান্ত। বাঁশবনের ধারে নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক মর্মটা সারতে সারতে তার মনে হচ্ছিল, পেচ্ছাবের সেই তেজটা যেন আর নেই। আগে যেমন মাটি খুঁড়ে ফেলত, সেরকমটা আর হয় না আজকাল। শরীরের সেই তেজবীর্য ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে হয়তো। কমারই কথা।

প্যান্টের জিপারটা টেনে জিপগাড়ির দিকে ফিরে আসছিল সে। জিপে মালতী বসা। ছেনাল মেয়েছেলেটা এই দুপরে কেমন সেজেছে দেখ। জরির কাজ করা ঝলমলে লাল টকটকে শাড়ি, হাতায় কাজ করা ব্লাউজ, মুখে গুচ্ছের স্নো—পাউডার, কপালে মস্ত টিপ, ঠোঁটে রাঙা লিপস্টিক। একেবারে সং। তার ওপর মুখে একখানা ন্যাকা ন্যাকা খুকি—খুকি ভাব। আজকাল আর কেন যেন মেয়েছেলেটাকে পছন্দ হচ্ছে না তার।

জিপগাড়িটার দিকে যেতে যেতেও ধমকে দাঁড়ায় বীরেশ, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়, একটু ভাবে।

কী গো! তোমার হল?

বীরেশ জবাব দিল না।

দেরি হচ্ছে কেন? হাটে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে যে!

বীরেশ সিগারেট খেতে খেতে ধীরে ধীরে একটা সিদ্ধান্তে আসতে লাগল। নাঃ, এবার এই মেয়েছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নয়। এর একটা নামকোবাস্তে স্বামী আছে। মেনিমুখোটা পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমোয়।

মেনিমুখো হলেও লোকটাকে কখনো খারাপ লাগেনি বীরেশের। সরল,সোজা ছেলে। নাটকে একটা পার্ট করতে হবে বলে করে যাচ্ছে। পেটের দায় বলেও তো কথা আছে।

কই গো! জবাব দিচ্ছ না কেন?

মালতী জিপগাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

বীরেশ হাসল, বলল আসছি।

দেরি করছ কেন বল তো!

এই একটু হাত—পায়ের আড় ভাঙছি।

একা সিগারেট খাচ্ছো? আমাকেও একটা দাও। বড্ড ঘুম—ঘুম পাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে বীরেশ ওকে সিগারেট দিল। মেয়েছেলের সিগারেট খাওয়া কেন যেন পছন্দ হয় না বীরেশের।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল বীরেশ।
তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো! কেমন যেন আলগা আলগাভাব! কী হয়েছে বলবে তো!
কিছু নয়, রোজ কী আর একরকম থাকা যায়?
বলি, আমি পুরোনো হয়ে যাইনি তো!
তা একা তুমি কেন? আমিও তো পুরোনো হচ্ছি।
জিপের পিছনে কয়েক পেটি মাল আছে। বীরেশের দিশি মদের ব্যাবসা।
কৈখালির হাটে মদের ব্যাপারিরা তীর্থের কাকের মতো চেয়ে বসে আছে। গিয়ে পড়লে পেটি নামাতেও হবে না, লহমায় বিক্রি হয়ে যাবে জিপগাড়ি থেকেই।
বীরেশ গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষল।
মালতী বলল, কী হল থামলে কেন?
মদের গন্ধ পাচ্ছি যেন! বোতল ভাঙল নাকি?
মালতী হাসল, না গো, তোমার ফ্লাস্ক থেকে আমি একটু হুইস্কি ঢেলে খেয়েছি।
কখন?
যখন তুমি নেমে গিয়েছিলে তখন।
কেমন যেন এ ব্যাপারটাও পছন্দ হল না বীরেশের। যখন মানুষটার প্রতি অপছন্দের ভাব হয় তখন সেটা ধীরে ধীরে বাড়ে। তখন তার সবকিছুই অপছন্দ হতে থাকে। বীরেশের সিটের ধারের খাঁজে বেঁটে মোটা বড়োসড়ো স্টিলের ফ্লাস্কটা রাখা। তাতে বরফ মেশানো দামি হুইস্কি। বীরেশ দিনের বেলা খায় না। সূর্য ডুবলে তবে ওইসব।
গম্ভীর হয়ে আছো কেন বলো তো!
না, গম্ভীর হব কেন? ঠিকই আছি।
না, তুমি ঠিক নেই। বলো না গো কী হয়েছে?
এই শুরু হল ন্যাকামি। এটাই সবচেয়ে অসহ্য।
হঠাৎ বীরেশ বলল, আচ্ছা, গায়ে অমন বিটকেল গন্ধ মাখো কেন বলো তো!
মাথা ধরে যায়।
ও মাগো, বিটকেল গন্ধ কী? এই সেন্ট যে নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনেছিলে তুমি।
আমি?
ও মা, মনে নেই?
তা হবে। গন্ধটা ভালো লাগছে না তো!
ঠিক আছে এটা না হয় মাখব না।
কৈখালির রাস্তা জঘন্য। মাঝে—মাঝেই রাস্তার ছাল—চামড়া উঠে গিয়ে কোপানো খেতের মতো অবস্থা, বড়ো বড়ো গর্ত, তার উপর ধুলো তো আছেই। ঝপাং ঝপাং করে জিপ লাফাচ্ছে। তিন—চারখানা গো—গাড়ি সামনে রাস্তা আটকে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। জিপ এগোতে পারছে না। ভারি বিরক্তিকর অবস্থা। ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে বটে, কিন্তু সরু রাস্তায় গো—গাড়িই বা সাইড দেবে কী করে?
দুটো হাঁচি দিল মালতী। তারপর রুমালে নাক—মুখ চাপা দিয়ে বলল, এই রে! আমার আবার নাকে ধুলো গেলেই সর্দি হয়।
বীরেশ গো—গাড়িগুলিকে পাশ কাটানোর ফিকির খুঁজছে, সুবিধেমতো জায়গা পেলে রাস্তা থেকে ওভারটেক করে ফের রাস্তায় উঠবে। কিন্তু সেরকম সুবিধে পাচ্ছে না। ডানধারে ঝোপঝাড়, বাঁশ বন, গভীর নাবাল কিংবা পুকুর বা খেত। ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে বীরেশ।
ওঃ, অত হর্ন দিয়ো না তো! মাথা ধরে গেল।

হর্ন না দিলে হবে কেন? দেখছো না সাইড দিচ্ছে না।
তবু হর্ন বন্ধ করো।
বীরেশ অবশ্য কথাটাকে পাত্তা দিল না। হর্ন বাজাতে লাগল।
মালতী ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে বলল, একটু খাচ্ছি।
বীরেশ বিরক্ত হল, কিছু বলল না।
মালতী ফ্লাস্কের ঢাকনায় হুইস্কি ঢেলে খেতে লাগল।
জিপটার বাঁহাতি স্টিয়ারিং বলে রাস্তাটা ভালো দেখতে পাচ্ছে না বীরেশ। সামনে একটা তুমুল ধুলোর পাহাড় উঠেছে দেখে বুঝে নিল, উলটো দিক থেকে গাড়ি আসছে। গো—গাড়িগুলি জড়োসড়ো হয়ে থেমে পড়েছে। সুতরাং তাকেও থামতে হল।
নেচে নেচে, কেতরে, বহু কসরত করে খানিক রাস্তায় চাকা নামিয়ে একটা ট্রেকার উলটো দিক থেকে এসে পার হয়ে গেল তাদের। ঝান্ডা লাগানো পার্টির গাড়ি।
ওই তো, ওই তো সাইড পেয়ে গেল।
উলটো দিকের গাড়ি যে সুবিধেটা পায় সেটা যে সে পাবে না তা আর মালতীকে বোঝাবার চেষ্টা করল না বীরেশ। তবে সে একটা হিসেব—নিকেশ করে নিয়ে জিপটা ছাড়ল। ডানদিকে চাকা রাস্তার বাইরে খানিকটা নামানো যাবে। ছোটো ছোটো ঝোপ আছে বটে, তাতে আটকাবে না।
অ্যাকসেলেটর চেপে হর্ন দিতে দিতে জিপটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত হাতেই ধরে ডান বাঁয়ে মোচড় দিচ্ছিল বীরেশ।
কিন্তু কপাল খারাপ। বাঁয়ের সামনের চাকাটা বোধহয় একটা পাথরে লেগে গাড়িটা টাল খেয়ে ডান ধাবে একটা লাফ মেরে উঠে ডান কাতে পড়ে গেল।
প্রথম ধাক্কাতেই গাড়ি থেকে ছিটকে গিয়েছিল বীরেশ। পড়ে চোখে অন্ধকার দেখল। আর কিছু মনে নেই।
গো—গাড়ির গাড়োয়ানরাই নেমে এসে ধরে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল তাকে। বাকিরা গিয়ে জিপের তলায় চাপা পড়া মালতীকে যখন বের করে আনল তখন তার শরীর নিথর হয়ে গেছে। হয়তো বেঁচেও যেত মালতী, যদি না মদের বোতলের ভারী পেটিগুলি তার বুক আর মুখের উপর আছড়ে পড়ত।

তিন

রাহুটা যে বড্ড প্রবল হে তোমার মেয়ের!
তাতে কী হয়!
ওঃ সে অনেক ফেরে পড়তে হয়।
বেঁচেবর্তে থাকবে তো!
তা থাকবে, শনিটাও যেন কামড়ে আছে।
তাতেই বা কী হয়; ভেঙে বলবে তো!
দাঁড়াও, ভালো করে দেখি। এ মেয়ে তো ভালো করে দেখতেই দিচ্ছে না হাত, বারবার টেনে নিচ্ছে।
শক্তিপদ একটা ধমক দিল মেয়েকে, অমন করছিস কেন?
বকুল খিলখিল করে হেসে বলে, সুড়সুড়ি লাগছে যে!
শক্তিপদ বিরক্ত হয়ে বলে, এ মেয়েকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, বড্ড অশৈরণ। ক্ষণে ক্ষণে হাসি পায়। ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা লাগে, সুড়সুড়ি লাগে, ভয় লাগে।
জ্যোতিষী হরুঠাকুর গম্ভীরভাবে শক্তিপদর দিকে চেয়ে বলে, একটাই নাকি!

মেয়ে এই একটা। ছেলে আছে তিনটে, তা তাদের নিয়ে ভাবি না। এইটে হয়ে অবধি আমিও যেন বাঁধা পড়ে গেছি। মেয়ের বড্ড মায়া তো!

বয়স কত হল মেয়ের!

এই তো ষোলো পোরে আর কি। বিয়ের যোগটা একটু দেখ তো হরুঠাকুর।

দেখছি বাপু, দেখছি। দেখি মা হাতটা বেশ চ্যাটালো করে মেলে ধরো তো।

বকুল হেসেই অস্থির।

তা লেগে যাবেখন বিয়ে।

কবে লাগবে?

শিগগিরই।

তোমাদের জ্যোতিষীদের মুশকিল কী জানো। সব আন্দাজে ঢিল। লেগে যাবে সে তো আমিও জানি। কিন্তু কবে লাগবে, পাত্তর কেমন হবে, সুখে ঘরসংসার করবে কিনা সব বিস্তারিত না বললে হয়?

কেতুটা একটু ভেতরে যাচ্ছে বটে, তবে—

বকুল হাতটা এবার সুট করে টেনে নিয়ে বলে, ও বাবা, আমার হাত ব্যথা করে না বুঝি!

শক্তিপদ গলে গেল। মেয়ে হল তার প্রাণ। পাঁচসিকে পয়সা ফেলে বলল, ওতেই হবে। কপালে যা আছে খণ্ডাবে কে?

হরুঠাকুর বলে, আরে বাপু, গ্রহবৈগুণ্য যাই থাক মা মঙ্গলচণ্ডীর কবচটা নিয়ে গিয়ে ধারণ করাও। দামও বেশি নয়। কাজ হয়ে যাবে।

আচ্ছা, সে হবেখন। মেয়ে এখন নেপাল ঘোষের চপ খাওয়ার জন্য অস্থির।

আসি হে ঠাকুর।

কৈখালির হাটে এসে যে নেপাল ঘোষের চপ না খেয়েছে সে আহাম্মক। তিন রকমের চপ করে নেপাল। আলুর চপ, মোচারচপ, আর ভেজিটেবল চপ।

তিনটেই ঝুড়ি ঝুড়ি উড়ে যায়। দোকানের সামনে লম্বা লাইন।

জ্যোতিষীর কাছ থেকে উঠে এসে বকুল বলল, উঃ হাতটা একেবারে ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি যেন কী বাবা!

শক্তিপদ কাচুমাচু হয়ে বলে, তোর নাকি শনির দৃষ্টি আছে। সেইজন্যই আসা।

তবে হরুঠাকুর শনির কথাটা কিছু বলল না তো!

আমি তো ভালোই আছি। তুমি অত ভাবো কেন?

মেয়ের বড়ো মায়া। শক্তিপদ ঘরবাঁধা লোক ছিল না তেমন। কাজ—কারবার নিয়ে ব্যস্ত মানুষ। চৌপর দিন তার মাথায় নানা বিকিকিনির চিন্তা। তিনটে ছেলে হয়েও তার স্বভাব ঘরমুখো হয়নি কখনো। কিন্তু তিন ছেলের পর মেয়েটা হতেই সে কাত। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার বুকখানা যেন জলে ভরে উঠল। মা লক্ষ্মীরই কেউ হবে। মেয়ে হয়ে ইস্তক তার কাজ কারবারও ফেঁপে ফুলে উঠল। তিনটের জায়গায় সাতখানা ট্রাক হল, দু—খানা বাস, তিনটে ট্রেকার, টাকায় টাকায় ভাসাভাসি কাণ্ড।

চুড়ি কিনি বাবা? ওই তো পিন্টুর দোকান।

একগাল হেসে শক্তিপদ বলে, কিনবি? তা কেন।

কাচের চুড়ি কম্মের জিনিস নয়। কয়েকদিন বেশ ঝলমল করে তারপর পটপট করে ভাঙে। আগে কাচের চুড়ি দু—চোখে দেখতে পারত না শক্তিপদ। কিন্তু মেয়ে চাইলে ব্রহ্মাণ্ড দিতেও রাজি।

দু—হাত ভরে চুড়ি পরে বাপকে দেখায় বকুল, কেমন দেখাচ্ছে বাপ?

খুব ভালো মা। তবে তুই তো দস্যি মেয়ে, চুড়ি ভেঙে যেন হাত রক্তারক্তি করিস না।

পাঁচটা টাকা পিন্টুর কোলে ফেলে মেয়ে আগলে এগোয় শক্তিপদ। তা এগোয় সাধ্যি কী!

দু—পা এগিয়েই মেয়ের বায়না, পুঁতির মালাগুলি কী সুন্দর না বাবা?
হ্যাঁ, তা ভালোই।
না তেমন দামি জিনিস—টিনিস নয়, এইসব ছোটোখাটো জিনিসেরই বায়না বটে মেয়ের।
ও বাবা, ওই দেখ নেপালের দোকানে লাইন।
লাইন দেখে শক্তিপদর চোখ কপালে।
ও বাবা, এ যে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে!
আমার যে খিদে পেয়েছে বাবা!
তাহলে চল বিশ্বনাথের দোকানে একটু মিষ্টি খেয়ে নে।
এ বাবা, মিষ্টি আমি খাই নাকি? চপই খাব।
দাঁড়া দেখি, লাইনে চেনা মানুষ পাই কি না।
কৈখালির হাটে চেনা মানুষের অভাব নেই তার। সে তালেবর লোক। সবাই চেনে।
লাইনের পাশ দিয়ে এগোতেই একেবারে সামনের দিকে বজ্রবাহুর সঙ্গে দেখা।
বেজা নাকি রে?
শক্তিদা যে! কী খবর?
তা চপ নিচ্ছিস বুঝি?
হ্যাঁ।
আমার জন্যও নিস তো কয়েকখানা। তিন রকমেরই নিবি, এই পয়সা।
দুর। পয়সার রাখো। ক পয়সাই বা দাম!
বাঁচালি বাপ। মেয়েটা তখন থেকে খিদেয় কাতর।
পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেজা গরম গরম চপ নিয়ে এল শালপাতার ঠোঙায়।
এনেছেও মেলা।
মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে বজ্রবাহুকে দেখছিল।
এই তোমার মেয়ে বুঝি?
হ্যাঁ।
তোমার তো মেয়েঅন্ত প্রাণ!
শক্তিপদ একটু লজ্জার হাসি হাসল। সবাই তাই বলে বটে। মেয়ে নাকি শক্তিপদকে একেবারে বশ করে রেখেছে। তাতে একটু অহংকারই হয় তার। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।
ঘাসের উপর তিনজন বসেছে ত্রিভুজ হয়ে। চপ খেতে খেতে শক্তিপদ বলে,তা সেই ডাইনির খপ্পরেই এখনো পড়ে আছিস।
সবই কপাল শক্তি দাদা। পেটের দায়ে মেনে নিতে হয়েছে।
সবই জানি। তোর জন্য দুঃখও হয়। গেছো মেয়েছেলেটার তো গুণের শেষ নেই। তা এখন তোর সঙ্গে কেমন করে?
মাথা নেড়ে বেজা বলে, না দাদা, সম্পর্ক নেই। আমি হলুম গিয়ে শিখণ্ডী। নব হালদারের প্রেস্টিজ রাখতে আমাকে দরকার ছিল।
মেয়েটা চপ তেমন খাচ্ছে না। খুব হাঁ করে তাকে দেখছে। বজ্রবাহুর চেহারাটা খারাপ নয়। বহু মেয়েই তাকায়। কিন্তু সে নিজে আর মনের দুঃখে মেয়েদের দিকে তাকায় না। তার জীবনটাই অন্ধকার হয়ে গেছে।
তুমি তো খাচ্ছ না খুকি!
মেয়েটা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। ভারি লক্ষ্মীশ্রী আছে মুখখানায়।

বজ্রবাহু বলল, চপে বড্ড ঝাল দেয় নেপাল। তুমি বোধহয় ঝাল খেতে পারছ না! জিলিপি খাবে? শ্রীধরের জিলিপি ভারি ভালো। সাড়ে আট প্যাঁচের জিলিপি।

খাবে?

মেয়েটা চুপ করে আছে। মাথা নীচু। হাসছে।

দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

বজ্রবাহু গিয়ে গরম জিলিপি নিয়ে এল। মেয়েটা লজ্জায় হাত বাড়িয়ে নিল ঠোঙাটা। বাপকে দিল, বজ্রবাহুকে দিল। নিজে একখানা একটু একটু কামড়ে খেতে লাগল! কিন্তু যেন খাওয়ায় মন নেই।

শক্তিপদ জিজ্ঞেস করে, তা হ্যাঁ রে বেজা, তোর ভ্যান চলছে কেমন?

ভালোই। নব হালদার ও ব্যাপারে ঠকায়নি।

কেমন হচ্ছে—টচ্ছে?

খারাপ নয় দাদা। একখানা ছোটো ট্রাক বায়না করেছি। সামনের মাসেই পাব। তখন আমি চালাব। ছোটো ভাইটাকে একটা দেব।

ভালো খুব ভালো। ধীরে ধীরে রয়ে—সয়ে হোক। আমারও তো ওইরকম ভাবেই হয়েছে কিনা।

জানি। তুমি একটা দৃষ্টান্তই তো চোখের সামনে।

শক্তিপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো একটা ছেলে যদি পেতাম—

কথাটা শেষ করল না শক্তিপদ। শেষ করার দরকারও ছিল না। সবাই বোঝে।

আমার কথা ভেবো না দাদা। খারাপ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম। এভাবেই জীবন যাবে।

চার

শেফালীর চোখ টকটকে লাল। বিস্তর কেঁদেছে। দিদি মরায় তুমি তো খুশিই হয়েছে জামাইদা, তাই না?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না শেফালী, খুশি হব কেন? মালতী যেমনই হোক, একটা মানুষ তো। একজন মানুষ মরলে কি খুশি হওয়ার কথা!

আমরা জানি, দিদি কী রকম ছিল। তোমার ওপর অনেক অন্যায়—অত্যাচারও হল। তুমি ভালো লোক। এ বাড়ির সবাই কিন্তু তোমার সুখ্যাতি করে।

উদাস মুখে বেজা বলে, তা হবে হয়তো।

তোমাকে আমার একটা কথা বলার ছিল।

কী কথা শেফালী?

সে তোমাকে বাবা বলবে। যা বলবে ভেবে দেখো। দিদি খারাপ ছিল বলে ভেবো না যে আমরা সবাই খারাপ।

তা ভাবব কেন?

মালতী মারা গেছে এই দিনসাতেক হল। ধীরেশ সামন্ত বেঁচে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে সারা গাঁয়ে ফিসফাস গুজগুজ চলছে তো চলছেই।

বজ্রবাহু একটা মুক্তির স্বাদ টের পায় বটে, কিন্তু তার আনন্দ হয় না। বরং একটু দুঃখই হয় মালতীর জন্য। জীবনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিসমার করে দিয়ে গেল। নিজে মরল, খানিক মেরে রেখেছিল বজ্রবাহুকেও। মেয়েমানুষকে আজকাল একটু একটু ভয় পায় বজ্রবাহু।

নব হালদার সকালে তাকে ডেকে বলল, সব তো শেষ হয়ে গেল, দেখলে তো! মেয়েটাকে নিয়ে শান্তি ছিল না। এখন ভাবি, তোমাকেও কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলাম হে।

না না, কষ্ট কীসের?

কষ্ট নয়? খুব কষ্ট। সবই টের পেতাম। কিন্তু একটা কথা বলি।

কী কথা?
সম্পর্কটা ছাড়ান—কাটান হোক আমি তা চাই না।
বজ্রবাহু চুপ করে থাকে।
তোমার দিকটা আমি যেমন দেখছিলাম তেমনই দেখব।
বজ্রবাহু চুপ।
একটা প্রায়শ্চিত্তিরও হবে। বলছিলাম যদি শেফালীকে বিয়ে করো তবে সবদিক বজায় থাকে। সে ভারি ভালো মেয়ে। মালতীর একটা রক্তের দোষ ছিল হয়তো। কিন্তু শেফালী তেমন নয়।
শেফালী ভালো মেয়ে, আমি জানি। কিন্তু প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে হবে।
শোকাতাপা নব হালদার দুর্বল গলায় বলে, তুমি ঠকবে না বাবা, কথা দিচ্ছি।
বজ্রবাহু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছিল। শাশুড়ি আর শেফালী আড় হয়ে পড়েছিল।
শাশুড়ি বলেছিল, যাবে কেন বাবা? আমরা কি পর?
শেফালীর মালতীর মতো চটক নেই। কিন্তু সে ভালো মেয়ে, এটা বুঝতে পারা শক্ত নয়। কিন্তু ভালো মেয়ে বলেই যে ঘাড় পাততে হবে এমন কোনো কথা নেই। চার বছর বাদে একটা সম্পর্কের গারদ থেকে মুক্তি পেয়েছে বজ্রবাহু। ফের আবার একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে তার মন চায় না। তা ছাড়া এই বাড়ির অনুষঙ্গও তো আছে। শেফালীকে বিয়ে করলে এখানেই বাস করতে হবে। সেটা কী পারবে সে?
তবে নব হালদারকে চটাতেও চাইছে না বেজা, সবে তার ব্যাবসা জমে উঠছে।
নব চটলে কোন কলকাঠি নেড়ে তাকে পথে বসায় কে জানে। নবর পিছনে পার্টিও আছে।
সুধাপুর থেকে নবগঞ্জ পর্যন্ত টানা একটা ট্রিপ মারল বেজা, নবগঞ্জেই রাতের ঠেক। চেনা জায়গা। হরিরামের দোকানে মাল খালাস করে সে পয়সা বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জোর শীত পড়েছে এবার। সুফল মিত্রের পাইস হোটেলে খেয়ে সে তার ম্যাটাডোরে রাত কাটাবে বলে ফিরছিল। দূর থেকে দেখতে পেল, অন্ধকারে কে একজন তার ম্যাটাডোরের পাশে দাঁড়িয়ে।
বেজা নাকি রে?
শক্তিদাদা যে! এখানে?
একটা ট্রাক ফেঁসেছে। তাই আসা। কে যেন বলল, তুইও এখানে। তাই ভাবলুম দেখাটা হয়ে যাক।
ভালো করেছো।
আজ ফিরবি না?
খামোখা তেল পুড়িয়ে লাভ কী। রাত কাটালে সকালে হয়তো একটা ট্রিপ হয়ে যাবে। মুকুন্দ হালদারের মাল যাবে বলে মনে হচ্ছে।
তা ইয়ে বলছিলাম কী, খুব বরাতজোর তোর।
মালতীর কথা বলছো তো!
খুব বেঁচে গেলি।
বাঁচলুম তো, কিন্তু মনটা ভালো নেই।
কেন বল তো!
নব হালদার ফের বেঁধে ফেলতে চাইছে।
সে কী?
তার ছোটো মেয়ে শেফালীকে বিয়ে করার জন্য ধরে পড়েছে খুব। চটাতে ভরসা হয় না। ম্যাটাডোরখানাই তো ভরসা, যদি কেড়েকুড়ে নেয়। তার লোকবলও তো আছে।
একটু চেয়ে থেকে শক্তিপদ একটু হাসল, তা বটে। তবে অত ভয় খাস না। শক্তিপদ এখনো মরে যায়নি।

তুমি আর কী করবে দাদা! সবই আমার কপাল।
শোন রে বাপু, অত কপালের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকিসনি। এবার একটু পুরুষ হ। লেখাপড়া জানিস, বুদ্ধি আছে, শুধু সাহসটারই যা অভাব।
ঠিকই বলেছ। সাহসেরই অভাব। নইলে কী আর— যাকগে।
কথা দিয়ে ফেলিসনি তো?
না। সময় নিয়েছি।
ভালো করেছিস। কাল ফিরে একবার আমার বাড়ি যাস। কথা আছে।
ঠিক আছে দাদা। ব্যাপারটা কী!
বড়ো অশান্তি যাচ্ছে আমার। চিকিচ্ছের দরকার।
কার চিকিচ্ছে?
বলবখন।

পাঁচ

শক্তিপদর বউ পদ্ম রাগে ঝনঝন করছিল, আসকারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলেছে, এখন যা মনে চায় তাই করে। তিনদিন মেয়ে কুটোটি দাঁতে কাটছে না। বলি এরকম কতদিন চলবে রে হতভাগী?
বিছানায় দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বকুল। মুখখানা শুকনো। বলি রাগটা কার ওপর? কী চাস কী তুই?
বকুল কিছু বলছে না।
পদ্ম বলল, এরপর কী আমি গলায় দড়ি দেব? তাই চাস?
বকুল চুপ করে চেয়ে আছে। জানালার বাইরে আতাগাছের ডালে ফিঙে পাখি নেচে বেড়াচ্ছে। দুটো প্রজাপতি ঢুকল ঘরে। ফের বেরিয়ে গেল।
মা!
পদ্ম ফিরে চাইল, কী?
আমার শীত করছে। লেপটা টেনে দাও তো গায়ে।
লেপ টেনে পদ্ম তার কপালে হাত রাখল। গলা নেমে এল খাদে, না জ্বর তো নেই। এক গেলাস গরম দুধ দিই মা, খা।
তুমি কেন বললে আমি তিন দিন খাইনি! আমি তো রোজ খাই।
সে তো এতটুকু করে। মুখরক্ষা করার জন্য। ও কি খাওয়া? বলি, উপোস দিচ্ছিস কেন রে মুখপুড়ি?
মনটা ভালো নেই মা।
কেন, সেটা বলবি তো!
পরে বলব। সময় হয়নি। বাবা কোথায় বলো তো!
তার কি আর সময়—অসময় আছে! এ সময়ে লোকজন আসে, ব্যাবসাপত্তরের কথাই হচ্ছে হয়তো। ঘরসংসারে কি তার মন আছে? ওই তো আসছে বুঝি!
খুব হন্তদন্ত দেখছি যেন!
শক্তিপদই। ঘরে ঢুকেই বলল, ওগো, মেয়ের চিকিচ্ছের ব্যবস্থা হয়েছে।
চিকিচ্ছে! কীসের চিকিচ্ছে?
সে আছে, তুমি বুঝবে না। তবে বজ্রবাহু এক কথাতেই রাজি।
কীসের রাজি গো! এ তো বড়ো সাঁটের কথা কইছো দেখি।

তা সাঁটই ধরে নাও। মেয়ে পেটে ধরেছ, এখনো ওর মনের কথা বুঝতে পার না, কেমন মা তুমি? আমি চলি, মেলা লোক বসে আছে।

শশব্যস্তে চলে গেল শক্তিপদ।

ওমা! তুই মুখচাপা দিয়ে হাসছিস যে বড়ো! কী হল বল তো! এসব কী? আমি যে বুঝতেই পারলুম না।

দুধ দেবে বলেছিলে যে!

সে তো বলেছিলুম?

শিগগির নিয়ে এসো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

জন্ম

কানাইয়ের খুব বিশ্বাস ছিল যে ভবেন বিশ্বেসই তার বাপ। তা বলে আইন মোতাবেক নয়। ওই যেমন হয় আর কি! তার মা শেফালী ভবেন বিশ্বেসের বাড়িতে দাসী হয়ে আছে কম করেও পঁচিশ—ছাব্বিশ বছর। এখনো খাটে। ভবেনের বিশাল বাড়ি, ময়দানের মতো তিনটে উঠোন, লাগোয়া মস্ত আম আর লিচু বাগান, মেলা নারকোল গাছ, সবজির খেত, পনেরোটা গোরু নিয়ে বিরাট পাকা গোয়াল, সার সার মণ চালের গোলা, চালকল, আটাচাকি, তেলকল মিলিয়ে ডাইনে—বাঁকে মা লক্ষ্মী। আইন মোতাবেক ভবেনের চার ছেলে, তিন মেয়ে। না, কানাইকে তাদের মধ্যে ধরা হয় না। ধরতে নেই। তবে ভবেনের জনের দরকার, নইলে এতদিক সামাল দেবে কে? সুতরাং, কানাইও মাস মাইনে আর খোরাকি পায়, গতরে খাটে। বিশ বছর বয়সও হল তার। লেখাপড়াও শিখেছিল একটু। টেনেটুনে মাধ্যমিক পাশ করার পর সে ভবেনের খাজাঞ্চি হরিপদর লাগোয়া হল। ভবেনই তাকে ডেকে বলে দিল, হিসেবের কাজটা শিখে রাখ, পরে কাজে দেবে।

হিসেবের কাজ সব বিকেলবেলায় হয়, সারাদিনের আদায় উশুলের পর। আর দিনমানে ফাইফরমাশের অভাব নেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ভবেনের ছড়ানো ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হল, এসবের একটা হিস্যে তারও ছিল। না, আইন মোতাবেক নয়।

শেফালী সোজা—সরল মানুষ। তার পেটে কথা থাকে না। তার ওপর ভবেন বিশ্বেসের মতো তালেবর লোকের সঙ্গ করার একটা বড়াইও তো আছে। একদিন বর নয়ন দাসের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির পর ছেলেকে বলেই ফেলেছিল, তুই কী ওর মতো হেঁজিপেঁজির ছেলে? তোর আসল বাপ হল ভবেন বিশ্বেস।

কলঙ্কের ব্যাপার একটা আছে বটে, কিন্তু গৌরবও তো কম নেই। শুনে একরকম খুশিই হয়েছিল কানাই। আর তারপর থেকেই সে রোজ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে তার মিল কতটা। তা তার মা শেফালী দাসী মিছে বলেনি। কানাই হল লম্বাই চওড়ায় সা জোয়ান ছেলে, আর তার আইন মোতাবেক বাপ নয়ন দাস হল খেঁকুড়ে চেহারার একরত্তি মানুষ। মেলে না। কিন্তু ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে মেলাও। খাপে খাপে মিলে যায়। ভবেন বিশ্বেস লম্বাই চওড়ায় বিরাট মানুষ। রংটাও ফর্সার দিকেই। কানাইয়েরও অবিকল তাই। মিল খুঁজে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল কানাই। দুঃখের কথা, বাপকে জ্যাঠা ডাকতে হয়, এই যা। তবে মনে মনে সে ভবেন বিশ্বেসকে বাবা বলেই ডাকে।

মনে মনে বাপ আর মুখে জ্যাঠা বলে ডাকাটা হল দু নৌকায় পা রেখে চলার মতো। সামাল দেওয়া মুশকিল। বাপ আর জ্যাঠা এমন গুলিয়ে যায় যে মাঝেমধ্যে বিপত্তি দেখা দেয়।

মুনশির হাটের রজব আলি এসেছিল সেদিন পাখি নিয়ে। ভবেন বিশ্বেসের ছোটো মেয়ে বিনীর খুব পাখি পোষার শক। দরদালানে বিস্তর পাখির খাঁচা ঝোলানো। সারাদিন কিচিরমিচির, হেগেমুতে একশা করে। দুর্গন্ধে তেষ্টানো যায় না। তার মা শেফালীই সব পায়খানা পরিষ্কার করে। বাবুর মেয়ে পুষেই খালাস, ভোগান্তি অন্যের। তা বিনী একটা কথা—বলা ময়নার কথা বলে রেখেছিল। রজব আলি নিয়ে এসেছে সেদিন। কথায় কথায় রজব তাকে বলল, তুই তো শুনি সব কাজের কাজি। ইলেকট্রিকের কাজ জানিস, পাম্পসেট সারাতে পারিস, কাঠের কাজ জানিস, তা এত গুণ নিয়ে পড়ে আছিস কেন? মুনশির হাটের মহাজন মহাদেব পোড়েল লোক খুঁজছে। কাজের লোক পেলে হাজার দু—হাজার বেতন দেবে। যাবি?

কথাটা মিথ্যে নয়। লেখাপড়ায় তেমন দড় না হলেও কানাই হাতের কাজে খুব পাকা। পাম্পটেস, জেনারেটার থেকে শুরু করে এ বাড়ির যাবতীয় যন্ত্রপাতিই সে টুকটাক সারিয়ে দেয়। ভবেন বিশ্বেসের মেজো

ছেলে গোবিন্দ ছাদে মস্ত ডিশ অ্যান্টিনা লাগিয়ে, ঘরে ঘরে কেবল কানেকশন দিয়েছে সে কাজও কানাইকেই করতে হয়। এসবের জন্য বাড়তি পয়সাও পায় না সে। তার জন্য দুঃখও বিশেষ নেই তার। ভাবে, নিজের বাড়িরই তো কাজ।

রজব আলির প্রস্তাব শুনে সে উদাস মুখে বলে ফেলেছিল, বাপ—পিতেমোর ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব রজব ভাই!

শুনে রজব হাঁ, বলল, এ আবার কবে থেকে তোর বাপ—পিতেমোর ভিটে হল রে? তোর বাপ তো নয়াগঞ্জের লোক! বাপের ভিটে এখানে দেখলি কোথায়?

বেফাঁস কথা। বুঝতে পেরে কানাই কথা ঘোরাতে লাগল।

রজব বলল, ভালো করে ভেবে দেখিস। মহাদেব বুড়ো হয়েছে। ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও তার ভালো অবস্থা। দুগুণ—তিনগুণ হবে, ম্যানেজার গোছের লোক খুঁজছে। চাপাচাপি করলে দুই কেন, তিন হাজারেও রাজি হয়ে যাবে।

আর বেতন ছাড়াও রোজগার মেলা। সাত মেয়ের পর তার একটা মাত্র ছেলে। তা সে ছেলেও লায়েক হয়নি।

প্রস্তাব খুবই লোভনীয়। কিন্তু কানাইয়ের হল দু নৌকোয় পা। আইন মোতাবেক সে ভবেন বিশ্বেসের ওয়ারিশন নয় বটে, কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত এই যে বিরাট বাড়ি, চাষের জমি, নানা কারবার এসবের একটা অংশ তারও। এইটে ভেবে একটা সুখ আছে। সেই সুখ কী অন্য কোথাও পাওয়া যাবে?

কুমোরপাড়ার হিমি পিসির জাঁতির খিল খুলে গিয়েছিল। কানাইকে ধরে পড়ল, দে বাবা লাগিয়ে। ত্রিশ বছরের পুরোনো জিনিস। এমনটি আর পাওয়া যায় না। বখশিশ দেবোখন।

এ কথায় দেমাক একটু লাগল কানাইয়ের। বলল, বকশিশের কথা কেন বলেন পিসি? ওসব দিতে হবে না। গায়ে ভদ্রলোকের রক্তটা তো আছে।

জাঁতিটায় রিপিট এঁটে যখন পৌঁছে দিল কানাই তখন পিসি তাকে আদর করে বসিয়ে একথা—সেকথার পর হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই তো ভদ্রলোকের ছেলে। তা অমন চাকরবাকরের মতো খেটে মরিস কেন?

কথাটার প্যাঁচ ধরতে পারেনি কানাই। ভালোমানুষের মতো বলে ফেলল, নিজের বাড়ির কাজ, লজ্জার কী আছে বলুন!

পিসি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, তাও তো বটে। আমরাও তো বলাবলি করি, কানাইয়ের চেহারাখানা দেখে কে বলবে ভদ্রলোকের ছেলে নয়? তেমনই লম্বা—চওড়া,তেমনই ফর্সাটে রং, তেমনই হাত—পায়ের গড়ন।

কানাই তবু প্যাঁচ ধরতে না পেরে প্রশংসা মনে করেই মিটিমিটি হাসছিল। হিমি পিসি নাড়ু আর জল খাইয়ে হঠাৎ আলটপকা বলে ফেলল, বুড়ো টসকাবার আগে একটু বুঝেসুঝে নিস বাবা। তোর ন্যায্য দাবি আছে কিন্তু।

এ কথায় একটু থমকায় কানাই। তবে কি সবাই জানে নাকি? কথাটা তো সেদিকেই ইশারা করছে।

লজ্জারই কথা। কানাইয়ের লজ্জাও করছিল। কিন্তু একটু আনন্দও যে না হচ্ছিল তা নয়। জানাজানি হওয়ায় অন্তত ব্যাপারটা নির্যস সত্যি বলেই প্রমাণ হচ্ছে।

হিমি পিসি ভালোমানুষের মতো বলল, বুড়োকে ভাঙিয়ে কত লোক করেকর্মে খাচ্ছে, আর তুই আঁটি চুষছিস। আমরা তো বলি, অত ভালো ছেলে...

নাড়ু খেয়ে কানাই উঠে পড়ল।

দাবিদাওয়ার কথাটা অবশ্য সে ভাবে না। ওসব করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে মনে এটুকু জেনেই সে খুশি যে একটা তালেবর লোকের ছেলে। জানা বাপটা নয়, ছুপা বাপটাকেই তার পছন্দ।

গায়ে—গতরে আলিসান হয়ে ওঠার পর সে একদিন মেপে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও সে দু—ইঞ্চি লম্বা। মাপজোখ করার সহজ উপায় তো ছিল না। তবে ভবেন বিশ্বেস যখন বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়ে উঠোনে মুনিশদের ধান ঝাড়াই দেখে তখন মাথাটা থামের একটা চাপড়া—খসা জায়গায় পৌঁছায়। ওই মাপটা ধরে সে মেপে দেখেছে।

ইদানীং সন্ধের পর খাজাঞ্চির সঙ্গে তারও ডাক পড়ে ভবেনের ঘরে। মেঝের উপর বিভিন্ন খাতে আসা টাকাপয়সার স্তূপ। গোনাগাঁথা, খাতায় হিসেব তোলা এসব ভবেনের চোখের সামনেই হয়। বুড়ো হরিপদর চেয়ে সে অনেক বেশি চটপটে বলে ভবেনের যেন একটু পক্ষপাত দেখা দিচ্ছে তার প্রতি।

একদিন সন্ধেবেলা খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার পর ইশারায় তাকে বসতে বলেছিল ভবেন।

ভবেন গম্ভীর গলায় বলল, কত মাইনে পাস যেন?

তিনশো টাকা। আর খোরাকি।

কম নয় তো! নয়ন কত পায় জানিস?

আজ্ঞে, রোজ কুড়ি টাকা করে। খোরাকি আছে।

ও বাবা, সে তো পাঁচ—সাতশো টাকার ধাক্কা! আর তোর মা?

দেড়শো টাকা আর খোরাকি।

তাহলে একুনে কত হল?

হাজার খানে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন, বলে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে রে বাপ! তাই তো তেমন জমছে না আমার তবিলে।

কথাটা ঠিক নয়। তার ভবেন বাবা কত কামায় তার হিসেব কানাই ভালোই জানে। দিনে খরচখরচা বাদ দিয়ে আড়াই থেকে তিন হাজার। ফসলের সময়ে এর পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি।

ভবেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যা যায় যাক। তবু তো গরিবেরা খেয়েপরে বাঁচছে। কী বলিস?

যে আজ্ঞে।

আমার বাঁ হাঁটুতে আজকাল বড্ড ব্যথা হয়। বাতে ধরেছে। গনাকে একটু তামাক সাজতে বলে আয় তো। তারপর হাঁটুটা দাবিয়ে দে একটু।

পা দাবানোর হুকুমে খুশি হল কানাই। বাপ হলে কী হয়, চাকর আর মনিবের দূরত্ব তো আছেই। পা দাবানোর সুবাদে তবু একটু কাছাকাছি হওয়া গেল।

তামাকের সুন্দর গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ভবেনবাবু বলল, তোর মা এসেছিল কাল, তোর হয়ে দরবার করতে। অনেক ধানাইপানাই করল। তা তুই কিছু খারাপ আছিস বাপু? এর চেয়ে বেশি কেউ দেবে গ্রামদেশে?

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না, তবু কেমন যেন ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, একজন তিন হাজার টাকায় সাধছে আমাকে।

অ্যাঁ, বলে বড়ো করে চোখ মেলল ভবেন। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তিন হাজার! তা কাজটা কীসের?

ম্যানেজারি।

বলিস কী? কে সাধছে।

মুনশির হাটের মহাদেব মহাজন।

কে বটে লোকটা। কীসের কারবার?

তা জানি না। তবে মেলাই নাকি ব্যাবসাপত্তর। জমিজিরেত।

সে তোকে ম্যানেজারি দিতে চায় কেন?

তার একজন চৌকস লোক চাই।

তোকে চৌকস ঠাউরেছে বুঝি?

এখনো ঠাওরায়নি। বাজিয়ে নেবে।

তোর কী ইচ্ছে? যাবি?

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না। তবু কে যেন ভিতর থেকে জোর করে কথাগুলি ঠেলে বের করে দিল, আজ্ঞে বাপ—পিতেমোর ভিটে ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে হয় বলুন। তবে আতান্তরে পড়লে যেতে হবে।

কথাটা বলে ফেলে সে কর্তার দিক থেকে যেমনটা আশা করেছিল তেমনটা ঘটল না দেখে অবাক হল।

কথাটার মধ্যে যে প্যাঁচটা আছে সেটা হয় ধরতে পারল না। নয়তো এড়িয়ে গিয়ে ভবেন কিছুক্ষণ ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, তোর তো আর ভাইবোন নেই।

না, আমি একা।

হুঁ।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ভবেন নলটা সরিয়ে রেখে বলল, তুই তো গোবিন্দর সঙ্গে কাজ—টাজ করিস। সে তোকে কিছু দেয়—টেয়?

না, আমি চাইনি।

চাসনি কেন?

কাজটা শিখে রাখলাম। বড়দার তেমন হয়ও না কিছু। কিন্তু যত বাড়িতে লাইন দিয়েছি তাদের অর্ধেকও ঠিকমতো পয়সা দেয় না। গত মাসেও তিন বাড়ির লাইন কেটে দিতে হয়েছে।

অসন্তুষ্ট ভবে বলে, এককাঁড়ি টাকা জলে গেল। তখন বলেছিলুম গাঁ—গঞ্জে লোকের ভাতই জোটে না তো টিভি দেখবে!

ঠিকমতো করতে পারলে হয়। লোকে না খেয়েও ওসব দেখতে চায়।

কিছু হবে বলছিস?

ধীরে ধীরে হবে। কারেন্ট থাকে না বলে লোকে অর্ধেক দিনই দেখতে পায় না কিছু।

সেটাই তো বলছি। ওসব বিলাসিতা কি এখানে মানায়। দেখুক কিছুদিন। বেশির ভাগ ব্যাবসাই তো ধারবাকিতেই ডোবে কিনা।

আজ্ঞে।

তা গোবিন্দ যা হোক কিছু করছে। আর তিনজন তো বসে বসে হেদিয়ে গেল।

বটু কী পড়ছে যেন?

আজ্ঞে ক্লাস এইট হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন বলল, গতবার ফেল মেরেছে। অবিশ্যি পড়েই বা কী হবে? কাজ—কারবারে লাগলে কাজ হত। কিন্তু বাবুদের তো ইদিকে মনই নেই।

কথাটা জানে কানাই। দুঃখেরই কথা ভবেনের পক্ষে।

ভালো চোখে দেখেও না আমাকে।

বড়ো মানুষ হলেও ভবেন বিশ্বেসেরও দুঃখের দিক আছে। চার—চারটে ছেলের কেউই বাপকে যে বিশেষ গ্রাহ্য করে না এ সবাই জানে। তারা একটু বাবু গোছের, একটু আলগোছ। চাষবাস, মুনিশ খাটানো, চালকল, তেলকল এসব নিয়ে এই যৌবন বয়সে মাথা ঘামাতে তারা নারাজ। যতদিন মাথার ওপর বাপ বাবাজীবন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ততদিন ঘামাবেও না।

ভয় কি জানিস, অন্ধি—সন্ধি চিনল না তো, আমি মরলে সব না উড়িয়ে—পুড়িয়ে দেয়। আমার তো শত্তুরের অভাব নেই, আমি মরলে তারা এসে নানা শলাপরামর্শ দেবে, মাথায় হাত বুলিয়ে সব গাপ করে

ফেলবে।

সব বাবারই এক রা। কথা কিছু নতুন নয়। কানাই খুব যত্নের সঙ্গে তার ছুপা বাবা আর প্রকট জ্যাঠার বাঁ পায়ের হাঁটু দাবাতে দাবাতে দার্শনিকের মতো বলল, অত ভাবেন কেন? কপালে যা আছে তা তো হবেই।

এ কথায় ভবেনের হাঁটু চমকে উঠল। ভবেন চোখ কপালে তুলে বলল, বলিস কী? একটা জীবন কম কষ্ট করেছি! বাপ তো রেখে গিয়েছিল লবডঙ্কা। না—খেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই যে এতসব করলুম সে কি ভূতভুজ্যিতে যাবে নাকি?

এসব কথার জুতসই জবাব কানাইয়ের জানা নেই। সে বুঝল, ভবেন একটু সান্ত্বনা চাইছে, একটু বল—ভরসা। তোয়াজি কথা বললে কাজ হয় এ সময়ে। কিন্তু তার মাথায় আজ বোধহয় ভূতেই ভর করেছে। যা বলার কথা নয়, যেসব কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবে না, সেইসব কথাই যেন ভিতর থেকে অনিচ্ছেতেও ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সে নির্বিকারভাবে বলে, তা ছেলেপুলে তো আরও আছে আপনার। তাদের ওপরেই ভরসা করে দেখুন না।

বাপ—পিতেমোর ভিটে কথাটা ভবেন শুনেও শোনেনি। কিন্তু এ কথাটা জায়গামতোই লাগল বোধহয়। ভবেন সোজা হয়ে বসে বলে, কী বললি কথাটা? অ্যাঁ! কী বললি রে হনুমান?

তটস্থ হয়ে কানাই বলে, কিছু ভুল বল্লুম নাকি বাবা?

ওই! ফের ওই বাপ—জ্যাঠায় গণ্ডগোল! মুখ ফসকে 'বাবা' ডাক বেরিয়ে গেছে। ভবেন নীচু হয়ে নিজের একপাটি চটি তুলে নিয়ে কটাস করে কানাইয়ের পিঠে বসিয়ে চাপা গর্জন করে ওঠে, যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! বেরো হারামজাদা, বেরো! আজই তোকে বরখাস্ত করলুম। ফের এ বাড়ির ছায়া মাড়ালে কেটে ফেলব। দূর হ সুমুখ থেকে।

পেট আর মুখের কথার তফাত রাখতে না জানলে মানুষের দুর্গতি হবেই। পেটে বাপ, আর মুখে জ্যাঠা বরাবর বজায় রাখতে পারলে টিকে থাকতে পারত। তা আর হল না। তার ওপর জুতোপেটাও খেতে হল। মনিবের জুতো খেলেও আঁতে লাগে, বাপের জুতো খেলেও আঁতে লাগে। তবে ভরসা এই যে, মনিবের জুতোয় যতটা আঁতে লাগে, বাপের জুতোয় ততটা নয়। মনকে এইটুকু বুজিয়ে সে বেরিয়ে এল।

মা শেফালী দাসীকে কথাটা বলতে চায়নি সে। কিন্তু ভবেনের বাড়ি হচ্ছে খোলা হাট। ঘটনাটা দু—চারজনের চোখে পড়েই থাকবে। তাই রটে যেতে দেরি হয়নি।

রাতে শেফালী বলল, হ্যাঁ রে, কর্তা নাকি তোকে জুতোপেটা করেছে?

না, তেমন জোরে মারেনি। ওই একবারই—তা লাগেনি তেমন।

তা তুই করেছিলি কী। কর্তার টাকাপয়সা সরাসনি তো!

আরে না না, ওসব নয়। খামোখা ফস করে চটে গেল।

বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। সারাদিন জান চুঁইয়ে খাটছিস, ক পয়সা ঠেকায় তোকে? কাল গিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসবখন।

আরে না, ওসব করতে যেয়ো না।

তাহলে চটি দিয়ে মারবে?

আহা, বাপ বলেই ধরে নাও না কেন? তাহলে আর তত গায়ে লাগবে না।

বাপ তো সে বটেই, কিন্তু তা বলে অপমান করবে কোন মুখে?

কথাটা চাউর হল খুব। শুধু দেখা নয়, সেদিন বৈঠকখানায় যা কথাবার্তা হয়েছিল তা আড়ি পেতে শুনেছেও কেউ কেউ। কথাটা এমনভাবে রটল যে, কানাই ভবেনের কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছে ছেলে হিসেবে।

আড়ালে লোকে গা টেপাটেপি করে হাসছে আর ভবেনের বাড়িতে মেজাজ চড়ছে।

সন্ধেবেলা গিন্নিমা ডেকে পাঠাল।

কানাইয়ের তেমন ভয়ডর হচ্ছিল না। মাথা উঁচু করেই গিয়ে গিন্নিমার ঘরে ঢুকল। ভবেন বিশ্বেসের বউ রোগভোগা মানুষ। মুখ গম্ভীর, চোখে খর দৃষ্টি।

তার দিকে চেয়ে বলল, কী সব শুনছি?

কানাই [illegible] হয়ে বলল, খারাপ কিছু বলিনি। কথাটা ঘুরিয়ে ধরেছে লোকে।

গিন্নিমা উঠে ঘরের দোর দিয়ে এল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, কতটা কী জানিস বল তো।

আজ্ঞে, আমি আর কী জানব। কিছু জানি না।

ঢং করতে হবে না। কর্তার কীর্তি কিছু কম নেই। কিন্তু বলি, তোর এত সাহস হয় কী করে? দাবিদাওয়া তুলেছিলি?

আজ্ঞে না।

তোর মা তোকে বুদ্ধি—পরামর্শ দেয়নি তো! ও বোকা মেয়েছেলে, সব করতে পারে।

না, আমার মা এর মধ্যে নেই।

আগেকার দিনের বড়োলোকদের ওরকম কত মেয়েছেলে থাকত। তা বলে তাদের ছেলেপুলেরা দাবিদাওয়া তুলবার মতো বুকের পাটা দেখায়নি।

তোকে কে বুদ্ধি দিচ্ছে বল তো!

আজ্ঞে ওসব ব্যাপার নয়।

ব্যাপার নয় মানে? তুই কোন সুবাদে সেদিন কর্তাকে বাবা বলে ডেকেছিলি?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অন্নদাদাও তো বাপের সমান।

এসবও তোকে কেউ শেখাচ্ছে। এই আমি বলে দিচ্ছি, মুখ থেকে আর কোনো বেফাঁস কথা বেরোলে কিন্তু কালু হাঁসুয়াকে খবর দিয়ে খুন করাব, বুঝেছিস?

কালু হাঁসুয়া ভাড়াটে খুনি, সবাই জানে। অন্য সময় হলে নামটা শুনে ভয় পেত কানাই। আজ যেন তবু ভয় হল না। শুধু বলল, বুঝেছি।

বিষয়—সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে রক্ষে থাকবে না, এটা ভালো করে জেনে যা।

কানাই চুপচাপ চলে এল।

দু—দিন ধরে কাজকর্ম নেই। ঘরে বসে বসে মাজায় ব্যথা। তিনদিনের দিন সে একটু বেরোল। তালবাগানে কপিখেতের পাশে শীতের রোদে বসে বিড়ি ফুঁকছিল নিতাই। তাকে দেখে ডাকল, ওরে ইদিকে আয়। তোকে নিয়ে তো হুলুস্থুলুস কাণ্ড। বোস এখেনে।

তা বসল কানাই।

নিতাই বলল, নতুন কথা তো কিছু নয় রে। ওসব আমরা সেই কবে থেকেই জানি। বোকার মতো বলে ফেলে অমন চাকরিটা খোয়ালি। মুখ বুঝে থাকলে আখেরে লাভই হত। তেলকলের ম্যানেজার তপন, ট্র্যাক্টরের ড্রাইভার মদনা কেউ কী মুখ খুলেছে বল?

অবাক হয়ে কানাই বলে, তাদের আবার কী বৃত্তান্ত?

তোর যা ওদেরও তাই।

তার মানে?

তোর কী ধারণা তুই একা ভবেন বিশ্বেসের বে—আইনি ছেলে?

খুব হাসছিল নিতাই। কানাইয়ের তাতে গা জ্বলে গেল। বলল, প্রমাণ আছে?

সে কী তোরই আছে?

কানাই এই প্রথম ভবেন বিশ্বেসের ছেলে হিসেবে তেমন গৌরব আর বোধ করছিল না। বলল, না প্রমাণ নেই।

তবে? তপন আর মদনাও জানে তারা কোত্থেকে এসেছে। তবে রা কাড়ে না। তাতে সুবিধে একটাই। কর্তা তার এসব বে—আইনি ছেলেদের বিলিব্যবস্থা ঠিকই করে দেয়। তুই বাড়াবাড়ি করে ফেললি কিনা। চুপচাপ থাকলে দেখতিস পাকা বাড়ি হয়ে যেত, তলে তলে জমিজমাও করে দিত। কর্তা পাষণ্ড নয়। শত হলেও রক্তের সম্পর্ক তো!

কানাই একটু ভেবে দেখল, দুইয়ে দুইয়ে চারই বটে। তপন নামেমাত্র ম্যানেজার হলেও কুল্যে ছশো টাকা বেতন পায়। তা তারও পাকা বাড়ি হয়েছে গত বছর। মদনারও বাড়ি উঠছে গোয়ালপাড়ায়। ট্র্যাক্টর চালিয়ে সে হাজার টাকার বেশি পায় না। দুজনেই কানাইয়ের চেয়ে বড়ো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই উঠে পড়ল। মনটা বড্ড তেতো হয়ে গেল তার। সে ওদের মতো নয়। আদায় উশুলের পথে যায়নি কখনো। তার শুধু এই ভেবেই সুখ ছিল যে, আসলে সে ভবেন বিশ্বেসের ছেলে। সেই সুখটা হঠাৎ চড়াই পাখির মতো ফুরুত করে উড়ে গেছে কোথায় যেন।

তিনদিন বাদে মুনশির হাটে মহাদেবের কাজে লেগে পড়ল কানাই। মহাদেব সোজাসাপটা মানুষ। প্রথম হাজার টাকা মাইনে, কাজ পছন্দ হলে তিন মাস পর থেকে দু হাজার। আরও কাজ দেখাতে পারলে বেতন যে আরও বাড়ানো হবে সেটাও সাফ জানিয়ে দিল মহাদেব।

কাজের ধরন একই রকম। কানাইয়ের কাছে কাজ একটা নেশার মতো। খাটতে তার ভালোই লাগে। কাজ দেখে মহাদেবও খুশি। পাঁচটা কারবারে তার মেলা টাকা খাটছে। আর এ কথাও সত্যি যে মহাদেব ভবেনের চেয়েও বড়োলোক।

দিনরাত কোথা দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তা ভালো করে টেরও পেল না কানাই। বছরখানেক বাদে মহাদেব একদিন তাকে ডেকে বলল, তোমার কাজ দেখে খুশি হয়েছি বাবা। এখন থেকে তিন হাজার করেই পাবে। পুজোয় পার্বণী, জামাটা—কাপড়টা— এসব নিয়ে ভেব না।

কানাই ওসব নিয়ে ভাবে না। কাজে ডুবে থাকে। কালেভদ্রে গাঁয়ে গিয়ে চুপি চুপি মাকে দেখে আসে। তার বোকাসোকা মা পেটের দায়েই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক যে ভুলটা করেছিল তার জন্য আজকাল তার দুঃখই হয়। তার মনের মধ্যে এখন আর ভবেনকে নিয়ে বাপ—জ্যাঠার দ্বন্দ্ব নেই। সে ভবেনের কথা আর ভাবে না।

মহাদেবের ঠান্ডা লেগে জ্বর হওয়ায় একদিন সকালে তার গদি সামালাচ্ছিল কানাই। মহাদেবের কর্মচারীরা এখন তারই তদারকিতে থাকে। কাজও মেলা।

বেলা দশটা নাগাদ একন বুড়ো রোগা মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে এসে গদিতে ঢুকল।

কানাই প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। লোক তো মেলাই আসে।

লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

কাকে খুঁজছেন? মহাদেববাবুর জ্বর, আজ আসেননি।

তোমাকেই খুঁজছি বাবা। আমি ভবেন বিশ্বেস। তোমার বাবা।

কানাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

ভবেনকে চেনাই যায় না। বছরখানেকের মধ্যেই বুড়িয়ে খুনখুনে হয়ে গেছে। বসে একটু হাঁফ ছেড়ে বলল, নানা ব্যাধিতে শরীরটা শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর মনের কষ্ট। বড়ো ছেলে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে বউ নিয়ে। মেজো জন মায়ের গয়না চুরি করে বোম্বাই না কোথায় পালিয়ে গেছে। সেজো ব্যাবসা করতে গিয়ে পথে বসেছে। ছোটোটাও শুনছি মদটদ খায়। আমার অবস্থা বড়ো খারাপ।

খুব মন দিয়ে শুনল কানাই। তারপর বলল, তা এখন কী করবেন?

বিষয়সম্পত্তি যে যায় বাবা কানাই। চারদিকে ষড়যন্ত্র। চারদিক থেকে নানা ফন্দিফিকির নিয়ে লোক আসছে। শুনি, তুই মহাদেবের কাজকারবার নাকি ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলেছিস। সবাই তোর সুখ্যাতি করে। তা

বাবা, আমাকে রক্ষে কর। এসে বিষয়সম্পত্তি সামাল দে। যা চাস দেব। শত হলেও তুই তো আমারই সন্তান।
কানাই একটু হাসল। বলল, একসময়ে আমারও কথাটা ভেবে খুব অহংকার হত। কিন্তু আজ আর হচ্ছে না কর্তাবাবু।
ভুলভ্রান্তি যা হয়েছে, মাপ করে দে। সত্যিই বলছি তোকে, ওরা আর আমার কেউ নয়। ফিরেও তাকায় না। আজ ভাবি অবৈধ ছেলে হলেও তোর বরং একটু মায়াদয়া ছিল। বড্ড ভুল করে ফেলেছি বাবা।
কিন্তু আজ যে আর আপনাকে আমার বাবা বলে মনে হয় না কর্তাবাবু! একদিন এমন ছিল, আপনাকে বাবা বলে ডাকার জন্য প্রাণ আনচান করত। আজ যে সেই ইচ্ছেটা মরে গেছে।
না হয় না—ই ডাকবি? তবু ফিরে চল। মহাদেব যা দেয় তার চেয়ে আমি দু—চার হাজার বেশিই দেব।
বিষয় সম্পত্তির ভাগ দেবেন?
আইনে তো তা মানবে না, তবে পুষিয়ে দেব।
কানাই খুব হাসল, আপনার আইনের ছেলেরা যেমনই হোক, বাপকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, বিষয় তারাই পাবে। আর এই আমরা যারা আপনাদের মতো লোকের কামকামনার অবৈধ সন্তান, যত ভালোই হই আমাদের কপালে ঢুঢু। দুনিয়াটা ভারী মজার জায়গা মশাই।
দুটো কাঁচা গালাগালও যদি দিস তো দে। বড্ড আতান্তরে পড়ে এসেছি রে বাবা, রক্ষে কর।
আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন জানেন?
জানব না কেন? তোর সাহায্য চাইতেই আসা।
সে তো ঠিকই। পয়সা ছড়ালে ম্যানেজার আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু কানাই দাসের মতো এমন বশংবদ পাবেন না। আপনি ভালোই জানেন, কানাই আপনার অবৈধ সন্তান, সে আপনাকে বাবা বলে ভাবত, আপনার বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করতে দিনরাত বেগার খাটত, নামমাত্র মাইনে পেত, তবু অন্য কোথাও যেতে চাইত না। তাকে তাড়িয়ে ভুল করেছিলেন বটে। সেটা বুঝতে একটু দেরিও করে ফেলেছেন। আজ আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।
কেন জানেন?
কেন?
আপনার বিশ্বাস কানাই গিয়ে ফের বুক দিয়ে সব আগলাবে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করবে যতদিন না আপনার বৈধ সন্তানেরা এসে ভার নিচ্ছে। ঠিক বলছি তো কর্তাবাবু?
না, না, ওরকম ভাবিসনি।
কর্তাবাবু, একসময়ে কানাইয়ের আপনার মতো একজন বাবার দরকার ছিল।
আজ আর নেই।
ভবেন স্তূপাকার হয়ে বসে রইল।

—